চারবাক
চতুর্দশ বর্ষ। ৪৮তম সংখ্যা।২৫তম
ইন্টারনেট সংখ্যা

সূচিপত্র

জয়ঢাক ৪৮তম সংখ্যা, ২৫তম ইন্টারনেট সংখ্যাঃ (নির্দিষ্ট পাতায় যাবার জন্য আর্টিকলের নামের ওপর ক্লিক করুন।)

	বিষয়	লেখা		লেখক	ছবি/গ্রাফিক্স
১	জয়ঢাকের দলবল				ইন্দ্রশেখর
২	আমাদের কথা				ইন্দ্রশেখর
৩	সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল		ইন্দ্রশেখর	ইন্দ্রশেখর
৪	কমিক্স	নদী আর হাঁস		মঞ্জীর	মৌসুমী
৫	উপন্যাস	সোনার বিষ্ণুমূর্তি		জি সি ভট্টাচার্য	শিমূল সরকার
৬	গল্প 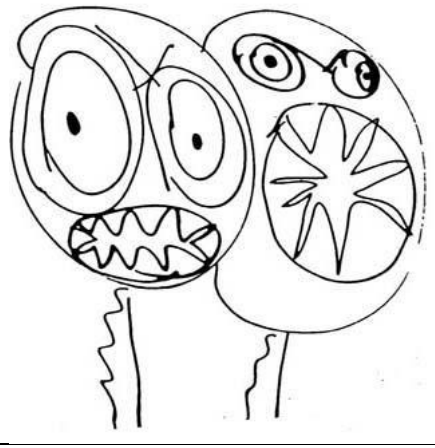	ক	ভূতায়ন	রতনতনু ঘাটী	ইন্দ্রশেখর
		খ)	সত্যবাবু ভালোমানুষ	তরুণকুমার সরখেল	শিবশংকর ভট্টাচার্য
		গ)	অলৌকিক	শিশির বিশ্বাস	শিবশংকর ভট্টাচার্য
		ঘ)	দা রেড রুম	এইচ জি ওয়েলস (অনুঃঅমিত দেবনাথ)	শিমূল সরকার
		ঙ)	রামছাগলের ছা	অচিন্ত্য সুরাল	ইন্দ্রশেখর
		চ)	বেণুমামা	সঞ্জীব চ্যাটার্জি	দীপংকর
		ছ)	হারানো হীরে	কিশোর ঘোষাল	সোমা চক্রবর্তী
		জ)	চন্দ্রকলা রহস্য	অনন্যা দাশ	সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
৭	ভ্রমণ	পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো		ইন্দ্রনাথ	ইন্দ্রশেখর
৮	ভূতের আড্ডা	ক	ভূতের গল্প- শলকেনের ছবি দ্বিতীয় পর্ব	মহাশ্বেতা	ইন্দ্রশেখর
		খ	ভূতুরে বাড়ি- রাজারহাটের ভূতের বাড়ি	পিকলু	সংগৃহীত
		গ	দেশবিদেশের ভূতেরা-	টুপুর	সংগৃহীত
৯	বিচিত্র দুনিয়া	জুতা আবিষ্কার		অরিন্দম দেবনাথ	লেখক

১০	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	(ক)	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(খ)	মাথে মে ট্রিকস-	সূর্যনাথ ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
		(গ)	প্রতিবেশী গাছ- শালুক	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত
		(ঘ)	পাখির জগত- এই পাখি নেই পাখি	সৈকত মুখোপাধ্যায়	সংগৃহীত
		(ঙ)	চেনা পাখির অচেনা পরিচয়	কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়	সংগৃহীত
		(চ)	টেকনো টুকটাক- স্ট্যাচু অব ইউনিটি	কিশোর ঘোষাল	সংগৃহীত
		(ছ)	বিচিত্র জীবজগত- পিনোশিও	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত
		(জ)	ভারতের বৈজ্ঞানিকঃ একদল নামহীন প্রযুক্তিবিদ	সংহিতা	সংগৃহীত
১১	বনের ডায়েরি 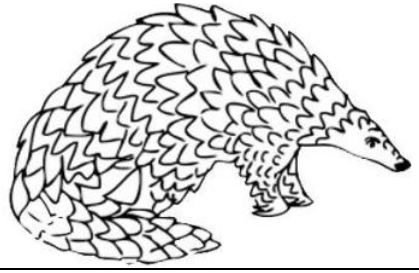	(ক)	প্যাঙ্গোলিনের সঙ্গে কটা দিন	স্বপ্না লাহিড়ি	সংগৃহীত
		(খ)	ভারতের বনাঞ্চল- ত্রিপুরারজীববৈচিত্র্য	সংহিতা	সংগৃহীত
১২		(ক)	রাক্ষসরাক্ষসী	রতনতনু ঘাটী	মৌসুমী
		(খ)	অন্যরকম	আবু হোসেন	সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
		(গ)	ষষ্ঠী	অমিতাভ প্রামাণিক	সৌভিক
		(ঘ)	চড়ুই	পবিত্র মন্ডল	ইন্দ্রশেখর
		(ঙ)	রূপকথার কন্যে	ইন্দ্রাণী সরকার	সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
		(চ)	চিলাপাতায় ফিস্টি	মধুমিতা ভট্টাচার্য্য	অন্তরা
		(ছ)	কুল্পিওয়ালা	প্রকল্প ভট্টাচার্য	অরিঘ্ন
		(জ)	বাবার মত	শংখ করভৌমিক	সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
		(ঝ)	মাছাল	তরুণ সরখেল	অরিঘ্ন
		(ঞ)	অনির্বাণ	তোফায়েল তফাজল	অন্তরা

১৩		(ক)	ধাঁধা	জয় মুস্তাফী	
		(খ)	শব্দখেলা	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত
		(গ)	ড্রুড্‌ল		
		(ঘ)	কুইজ		
		(ঙ)	জানো কি		
		(চ)	কীসের ফটো		
		(ছ)	অবিশ্বাস্য		
		(জ)	আশ্চর্য উলকি		
		(ঝ)	মজার ইন্টারনেট		
		(ঞ)	গত সংখ্যার উত্তর		
১৪	ধারাবাহিক উপন্যাস	(ক)	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস	মৌসুমী, ইন্দ্রশেখর
		(খ)	পঞ্চা নামে ভালুকটি	চিত্ত ঘোষাল	মৌসুমী
১৫	কাতুকুতু	(ক)	কর্ণাকর্ষণ বৃত্তান্ত	তাপস মৌলিক	সৌভিক
১৬	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে 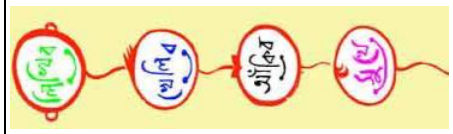	(ক)	প্রান্তিকের গল্প	প্রান্তিক লাহিড়ী	
			হাতির ছবি	দিশা লাকরা	
		(খ)	বাঁদরের গল্প	কৌশিক	
		(গ)	দিনের বেলার ভূত	আনমোল	
১৭	পুরাণ কথা	খান্ডব দহন		সংহিতা	শিমুল
		মঙ্গলগান (মনসামঙ্গল)		রেশমী চ্যাটার্জি	মৌসুমী
১৮	জাপানের গল্প	কাজুমার প্রতিশোধ (দ্বিতীয় পর্ব)		বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ড (অনুঃ সংহিতা)	সংগৃহীত
১৯	রাশিয়ান সাহিত্য	দাঁড়া দেখাচ্ছি(কমিকস্)		আ কুর্লিয়ানস্কি ও আ হাইত	আ কুর্লিয়ানস্কি ও আ হাইত
		রুপোলি খুর (গল্প)		পাভেল বাজভ	র স্তালিয়ারোভ
২০	পুরাতনী	নুতন বৎসর		--	ইন্দ্রশেখর

২১	স্মরণীয় যাঁরা	পঞ্চানন তর্করত্ন	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
২২	সুরঢাক	এসো গান শুনি	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	লেখক
২৩	টাইম মেশিন	ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ (অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়)	ইন্দ্রশেখর
		ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী	মৌসুমী
২৪		নতুন ভোরে হীরের কুচি	মহাশ্বেতা	মূল প্রচ্ছদ
২৫	লোককথা	ক্যাঙারু মেয়ের গল্প	মহাশ্বেতা	মৌসুমী
২৬	বিশ্বের জানালা	টুমরো আর ইয়েসটারডে দ্বীপের কাহিনী	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
২৭	সেই মেয়েরা	সন্তোষকুমারী গুপ্তা	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
২৮	আমার শহর	ফেলে আসা কলকাতা	সুজয় রায়	সংগৃহীত
২৯	জয়ঢাকের কিচেন	বিতানের প্যানকেক	ইন্দ্রশেখর	লেখক
৩০	দেশ ও মানুষ	তাঁতীয়া মামার কাহিনী	উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত
৩১	সিনেমা হল	আ সিরিজ অব আনফর্চুনেট ইভেন্টস	মহাশ্বেতা	সংগৃহীত
৩২	খেলার পাতা	এভারেস্ট	এরিক শিপটন। অনুঃ বাসব চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, ভারতের বনাঞ্চল, পুরাণ কথা, জাপানের গল্প

মহাশ্বেতা

বইপড়া, লোককথা, সিনেমা হল

তুলিতে, মাউসে, কি বোর্ডে, ক্যামেরায়

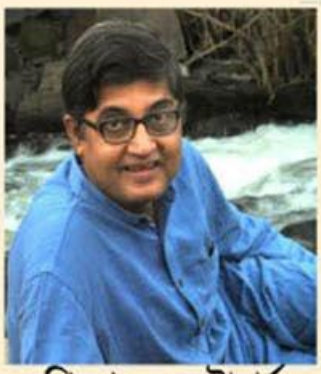

শিবশংকর ভট্টাচার্য

পিকলু

মৌসুমী

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে,তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

মহুল

অনুপম

অন্তরা

মুকুট

অরিঘ্ন

অর্ণব

দীপংকর

সুমিত্রা

সৌভিক

শিমুল

সোমা

আমাদের কথা

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন, আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

এ ছাড়াও ভবিষ্যতের সম্পাদক গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে নানা বয়সের সহসম্পাদকের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বড়ো আর মাঝারিদের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ছায়ায় বেড়ে উঠবে আগামিদিনের নবপ্রজন্মের পত্রিকা সম্পাদকের দল, এই আমাদের আশা।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:)

সহ-সম্পাদকমণ্ডলীঃ উমা, সংহিতা, মহাশ্বেতা, মহুল

অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়

আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুন্ডুস।

ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, c/o দেবজ্যোতি। BH-159(গ্রাউন্ড ফ্লোর), সেক্টর-২, সল্ট লেক কলকাতা-৯১

মেইল যোগাযোগ: joydhak@gmail.com

ভেম্বানাদের নাম শুনেছো? সে হল দক্ষিণ ভারতের এক অতিকায় হ্রদ। ছোট্ট একটা নৌকোতে তার বুকে ভেসেছিলাম এই শীতে। সে ভারী চমৎকার দৃশ্য। জলের ওপর ইতিউতি একটি দুটি পাখির আনাগোণা। তাই দেখে তাদের দিকে ক্যামেরা কষছি বারবার, আর বারবারই তারা ফুড়ুৎফারুৎ হারিয়ে যাচ্ছে ফ্রেমের থেকে। নৌকোর মাঝি চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে তাই দেখে আমায় বলেছিল, "বসন্তের শুরুতে এসো। সাধ মিটিয়ে পাখি দেখতে পাবে ভেম্বানাদের বুকে।"

বসন্ত তো এসে গেল। যাওয়া আর হল না আর। আমি যখন কম্পিউটারে মুখ গুঁজে বসে কাজ করি, তখন আমার হাতের আঙুলগুলো কি বোর্ডের ওপর এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, আমার চোখদুটো অদৃশ্য আঠায় আটকে থাকে সামনে চকচকে পর্দায়, আর আমার মনটা উড়ে যায় অনেক দূরের দেশের সেই আকাশপাতালজোড়া হ্রদের বুকে। সেখানে হরেক পাখির হরেক রঙের কিচিরমিচির।

এই বসন্তে, দিগন্তজোড়া হ্রদের বুকে পাখিদের সেই রামধনু রঙের ভিড়ে ভাসিয়ে দিলাম আমার মনপবনের নাও।

তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি তেমনই রঙিন আরেকটা নতুন জয়ঢাক। ভালো থেকো সবাই। আনন্দে থেকো, আর অন্যদের আনন্দ দিও।

তোমাদের
জয়ঢাকি দাদারা

নদী আর হাঁস

নদী বইছে আপনমনে। কুলকুল, ঝিরঝির, তিরতির-- পাড়ের গা ছুঁয়ে দিলেই ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শোনা যায়। নদীর একপাশে সবুজ ঘাসের মাঠ, আর এক পাশে কলকারখানা।

আরামে চোখ বোঁজে হাঁস। নদী তার ঢেউ দিয়ে হাঁসের মাথায় জল বুলিয়ে দেয়।

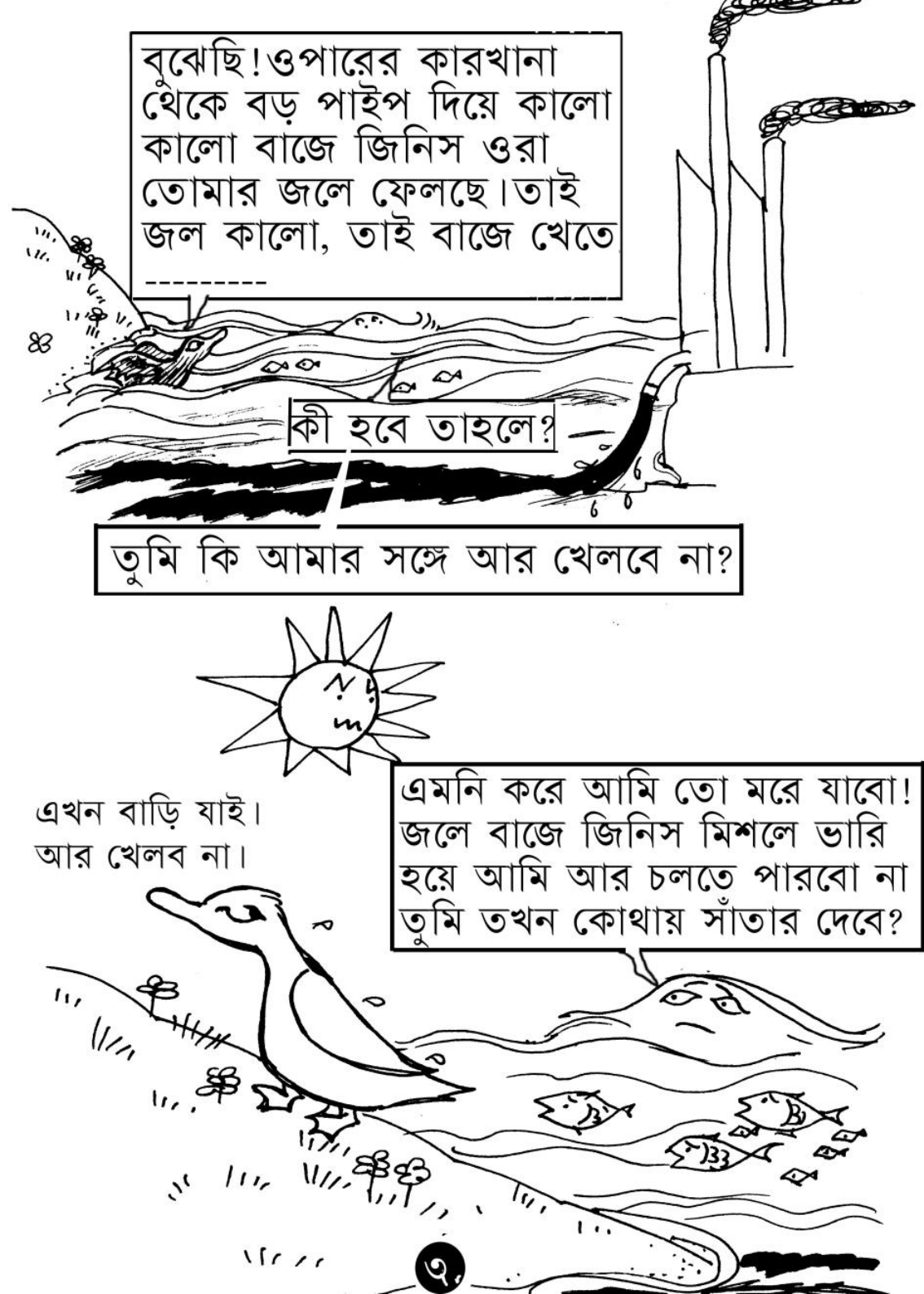
বুঝেছি! ওপারের কারখানা থেকে বড় পাইপ দিয়ে কালো কালো বাজে জিনিস ওরা তোমার জলে ফেলছে। তাই জল কালো, তাই বাজে খেতে

কী হবে তাহলে?
তুমি কি আমার সঙ্গে আর খেলবে না?
এখন বাড়ি যাই। আর খেলব না।
এমনি করে আমি তো মরে যাবো! জলে বাজে জিনিস মিশলে ভারি হয়ে আমি আর চলতে পারবো না তুমি তখন কোথায় সাঁতার দেবে?

ঠিকই বলেছো। তুমি না থাকলে আমিও থাকবো না।আমি তো জল ছাড়া বাঁচিনা! খাবারই বা কোথায় পাবো ?আর, এই সবুজ ঘাসও তো শুকনো হয়ে যাবে!

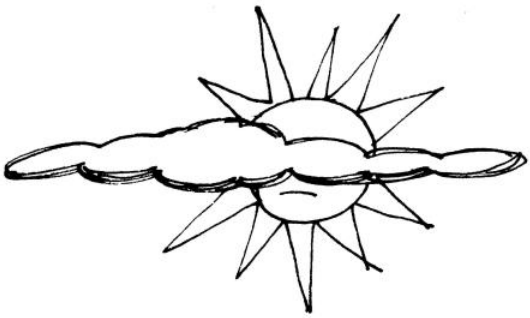

নদী চুপ করে যায়।

জল কালো হয়ে যেতে থাকে।
নদীর চলা থেমে যেতে থাকে।

লেখা মঞ্জির, রেখাঃ মৌসুমি

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

আমার নাম বাদল। আমার বয়স তেরো হতে চলেছে। দুপুরবেলা। আমার কাকুর জায়গায় আমিই কম্প্যুটারে একটা গল্প লেখবার চেষ্টা করছি ঘরে বসে। কাকু তো আমাকে আর চঞ্চলকে নিয়ে অনেক গল্প লিখেছে আজ অবধি।

কাকু নিজের ভাইপো ও আমার একমাত্র বন্ধু, আমি যাকে ভাই বলি, সেই চঞ্চলকে সাথে নিয়ে একটু বেরিয়েছিলো। কাল সন্ধ্যায় যে নাছোড়বান্দা মতন একজন লোক এসে কাকুকে নৌগড়ে অনুসন্ধানের জন্যে যেতে বার বার করে বলছিল সেই লোকটার বিষয়ে কাকু কিছু খোঁজখবর নিতেই বেরিয়েছিল বলে আমার মনে হয়। লোকটা কাকুকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু টাকাপয়সাও নাকি দেবে বলেছিল। কিন্তু কেসটা ঠিক বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করে বেড়ানোর মতন বলে কাকু রাজি হচ্ছিল না। তবে কাকু সেই সব তো এখন আমাকে কিছু বলেও যায় নি।

আজকাল এই এক কী যে মুশকিল হয়েছে সে আর বলবার নয়। কি করে যেন সব্বাই জেনে ফেলেছে যে কাকু একজন খুব বড় রহস্যানুসন্ধানী বা ডিটেকটিভ । কাকু যেন সবজান্তা আর সব কিছু করতে পারে! এটা বিপজ্জনক হতেই পারে উত্তরপ্রদেশের মতন অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে।

নৌগড়ে নাকি ইদানিং চুরিচামারি এমনকি ডাকাতিও বেজায় বেড়ে যাওয়ায় কাকুর সাহায্যের দরকার হয়ে পড়েছিল। লোকেদের বাড়ির দামি জিনিসপত্রের সাথে গত সপ্তাহে কয়েকটি মন্দির থেকে ঠাকুরের কষ্টিপাথরের ও অষ্টধাতুর মূর্তি, আর সেখানকার গড়ের বিখ্যাত মন্দির থেকে সোনার বিষ্ণুমূর্তি অবধি চোরের দল অনায়াসে গায়েব করে দেওয়ায় আশেপাশের সব গ্রামের লোকেরা ক্ষেপে উঠে

পুলিশের ওপরে ভরসা ছেড়ে দিয়ে শেষে নিজেরাই চোর ধরবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের পক্ষ থেকেই সেই লোকটা নাকি এসেছিলো।

নৌগড় যে ঠিক কোথায় সেটাই আমি বুঝতে পারিনি বটে তবে এটুকু বুঝে ছিলাম যে ঐতিহাসিক বিজয়গড় বা চুণারগড় আর নৌগড় সম্বন্ধে টিভিতে কি চন্দ্রকান্তা না কী যেন একটা ধারাবাহিক অনেকদিন ধরে চলেছিল, সেই সব গল্পের জায়গায় কোথাও হ'তে পারে।

চুণারগড় তো মির্জাপুর জেলায় গঙ্গার ধারে,তা আমি জানি এবং সে'খানে কয়েকবার কাকুর সাথে গিয়েছিও কিন্তু নৌগড় নাকি সেখান থেকে অনেকটা দূরে। সেখানে গঙ্গা নেই বটে কিন্তু নদী একটা ছিল, কি সরগো না কি যেন নাম ঠিক জানি না। শুনেছি সেই নদী ছিল চুণারের আগে প্রবাহিত জারগোর এক শাখা নদী। তবে জারগো নদীর অস্তিত্ব থাকলেও সেই শাখা নদীর নাকি এখন আর কোন চিহ্নও নেই। কবে মরে হেজে শুকিয়ে গিয়েছে।

সে না থাকুক গিয়ে চিহ্ন। আমি তখন সেই নদী নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লোকটা কী করে খবর পেল কাকুর বিষয়ে তাই ভাবছিলাম। তাই আমার গল্পটা তাড়াতাড়ি করে আর লেখা হচ্ছিলো না বিশেষ।

হঠাৎ বাধা পড়লো। দরজায় কলিং বেল বাজলো। আমার মনে হলো কাকুরা তাড়াতাড়িই হয়তো এসে পড়েছে। কিন্তু বাড়িতে তো একলা আমি আছি তখন, তাই কাকুর নির্দেশ মেনে একটু সাবধান হয়েই আমাকে যেতে হবে।

আমি আমার বিশেষ জুতোজোড়া ও গেঞ্জির ওপরে শার্টটা পরে নিয়ে তবে গেট খুলতে চললুম। ঘরের দরজাটা বেরিয়েই টেনে দিলুম আমি। দরজা অটোমেটিক ভাবে লক হয়ে গেল। এখন চাবি ছাড়া আর খোলা যাবে না। চাবি আমার কাছে নেইও। সে একটা আছে কাকুর কাছে আর অন্য একটা আছে বাড়িতেই, তবে একটা গোপন জায়গায়।

আমি গিয়ে সদর দরজাটা একটুখানি খুলে দেখি কাকু নয়। অন্য একজন বুড়ো মতন ভদ্রলোক এসেছেন কাকুর সাথে দেখা করতে কোন জরুরি কাজে। মাথার চুল যদি ও সব সাদা কিন্তু তিনি বেশ বলিষ্ঠ লোক। হাতে একটা লাঠিও আছে। ব্যাপারটা বেশ বেমানান মনে হল আমার।

একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে লোকটা চেয়ে আছেন দেখে মনে মনে ভাবলুম, আমি কি চঞ্চলের মতন সুন্দর ছেলে নাকি যে এতো করে আমাকে দেখছে! কাকু অবশ্য আদর করে বলে যে আমি বেশ স্মার্ট ছেলে। সে কাকু বলুক গিয়ে যা খুশি। কাকুর কথা আলাদা। কিন্তু এই লোকটা হয়তো আমাকে চিনে রাখছে।

আমি চেন লকটা না আটকেই দরজা আর একটু খুলে মুখ বার করে বললুম, "এখন তো আমার কাকু বাড়ি নেই আংকল, আপনি প্লিজ একঘন্টা পরে যদি আসেন তাহলে দেখা হতে পারে।"

তিনি উত্তরে কোন কথাই না বলে নিজের হাতের লাঠিটা আমার সামনে একটু উঁচু করে তুলে ধরলেন। আমি ভাবলুম এ বেশ মজা তো। কিন্তু আমি কিছু বুঝে উঠতে পারবার আগেই সুঁইইইই করে কেমন একটা যেন শব্দ হল আরআমার নাকে বেশ মিষ্টি মতন তীব্র একটা গন্ধ এসে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেল।

নিজের ভুলটা তখন আমি বেশ বুঝতে পারলুম কিন্তু লোকটা তৈরি হয়েই এসেছিল। আমি কাকুর ট্রেনিং মতন দম বন্ধ করে নিয়ে মাথা নিচু করতেই সে বলল, "কাম হো গিয়া রাম সিং, আব লে চলো ইস লৌন্ডে কো উঠা কর।"

কী কান্ড রে বাবা! দিনদুপুরে ছেলে ডাকাতি! কী করতে চায় আমার মতন একটা সাধারণ ছেলেকে নিয়ে এরা? দেখাই যাক।

একটা গুন্ডামতন লোক দৌড়ে এসে আমাকে ধরেই একটা পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলের মতন করে একটানে নিজের কোলে তুলে নিলো। লোকটার গায়ে বেশ জোর আছে। আমি তখন অগত্যা হাত পা ছেড়ে দিয়ে একদম অজ্ঞান হয়ে পড়বার ভান করলুম। কী আর করব?

সেই লোকটা নিচু স্বরে অন্য কাউকে বললো, "নাটে, দোপহর মে ভিড়ভাড় হ্যায় নহি, গেট কে পাস রিকশা লে আও অউর রাম সিং কো বিঠাও। সড়ক তক জলদিসে লে চলো। বঁহা মেরি গাড়ি মে ইস লৌন্ডে কো তুরন্ত লেটা দো। শালে জাসুস কো রোকনা হোগা হর হাল মে। নহি তো সব গড়বড় ....."

তারপর নিজের মনেই ফের বলল, 'শালে বঙ্গলিয়া জাসুস অগর ইস পর ভি না মানে, তো ফির ইস লৌন্ডেকো উঠাকর তটবন সে.... খিক ...খিক ...খিক..."

আমাকে রিকশায় তুলে সড়কে নিয়ে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা টাটা সুমোর মতন দেখতে গাড়ির পেছনের লম্বামতন সিটে ঠেলে শুইয়ে দিলো। রুমাল দিয়ে আমার মুখটা বেঁধে দিয়ে দরজা লক করে দেবার আগে আবার কী যেন ভেবে আমি অজ্ঞান হয়ে আছি দেখেও সে আমার হাত দুটোও বেঁধে দিলো। ঠক ঠক করে শব্দ শুনে মনে হল ততক্ষণে সেই লাঠি হাতে লোকটা এসে সামনের দিকের সিটে বসেছে। হয়ত রাম সিংই ড্রাইভার। নাটেও হয়তো আছে। মোটমাট তিনজনের গ্যাং।

কেউ কিছু বোঝবার আগেই কয়েক মিনিটের মধ্যে ছেলে ধরার পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল। মনে হল যে এই গাড়িটার গায়ে এ্যাম্বুলেন্স লেখা থাকলেই কোন লোকের আর কিছুই বলবার বা জিজ্ঞাসা করবার থাকবে না। বেশ ফন্দি । হয়তো ছিলও লেখা। অবশ্য তা আমি দেখতে পাইনি। গাড়ি এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তখন।

বেশ খানিকক্ষণ পরে আমার গায়ে জোলো বাতাস লাগতে বুঝলুম আমরা গঙ্গা পার হয়ে বেনারসের বাইরে চলেছি। গাড়ি সোজাই যাচ্ছে অর্থাৎ মোগলসরাই হয়ে চাকিয়া চন্দৌলির দিকে হয়তো যাবে । দেখা যাক কী হয়।

আমার সাইড সিটের নিচে একটা স্পেয়ার চাকা পড়ে ছিলো। আমার তখন কিচ্ছুটি তো করবার নেই। তাই নিজের পা দুটোকে খুব আস্তে আস্তে মুড়ে ডানপায়ের জুতোর গোড়ালিটা হাতের কাছে আনলুম। অনেক কষ্টে আঙুল দিয়ে টিপে ধরে হিলটা ঘুরিয়ে একটা মোটা সুতোর মতন জিনিস টেনে বের করে হাতের বাঁধনের ওপর দিয়ে টেনে দিতেই বাঁধন কেটে গেল।

জিনিসটা বিদেশি আয়রন কাটার। কাকু জোগাড় করে দিয়েছে আমাকে। লোহা হলেও কাটত। তারপরে জিনিসটাকে আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে পা সোজা করলুম তেমনি ধীরেই। মুখের বাঁধনটা খুললুম না। পুরো কাজটা করতে অনেকটা সময় নষ্ট হল। তারপরে আবার চুপচাপ। এবারে শুয়েশুয়েই হাত দিয়ে জামার পকেট থেকে একটা মোটামতন পিন বার করে ডান হাতটা নিচু করে চাকাটার হাওয়া ভরবার ভালভের মুখে আস্তে করে চাপ দিলুম। ফুস্‌স্‌স্‌স্‌ করে শব্দ হল। আমি একটু থেমে গেলুম। কেউ শুনতে যেন না পায়। তারপরে আবার চাপ দিলুম। এই করে করে সেটাকে ফ্ল্যাট টায়ার বানাতে বেশ মজা লাগছিলো আমার।

মোগলসরাই আসতে আসতে আমার সে কাজও শেষ। তখন আর কী করি ভাবছি। সেখানে গাড়ি থামলো। বিকেল পড়ে এসেছে মনে হল তখন। রাম সিং নেমে গেল হয়তো চা বা ঠান্ডা কিছু আনতে। গরমকাল। কিছু তো ওদের দরকার হবেই। আমি চোখ মেলে দেখলুম । বুড়োর লাঠিটা তার সিটের পিছনে ঝুলছে। যাক, ভাগ্য সদয়। গাড়ি চলুক। ওই লাঠিটাকে ঠিক বাগাতে হবে। আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। মিনিট দুই পরেই গাড়িও আবার হাইস্পিডে চলতে শুরু করলো আর রাস্তাও ভাঙাচোরা খারাপ পড়তে শুরু হল।

বেশ পুরনো গাড়ি বলে দারুণ ঝাঁকুনি দিচ্ছে তখন। কিন্তু ওরা তবুও অত স্পিডে চালাচ্ছে কেন তা বুঝলুম না। হঠাৎ পিছনে কোঁ ...কোঁ . . করে সাইরেন বেজে উঠলো। পুলিশের জিপ বা অ্যাম্বুলেন্স কিছু একটা হবে মনে হয়।

এইবার সাইড দিতে সচেষ্ট হল আমাদের গাড়ি। তবে তো ঠিক পুলিশেরই গাড়ি আগত ! কিন্তু তারা তো আর কিছু জানে না তাই থামবে ও না। রাস্তাটা সরু মনে হয় বেশ। কাকু আমাকে এই বয়সেই ভালোই ড্রাইভিং শিখিয়ে দিয়েছে। তাই মনে হল, এইরকম রাস্তায় সাইড দিতে হলে স্পিড কমাতেই হয়। নইলে.... ।

পাশ দিয়ে সাইরেন বাজানো গাড়িটা হুশ করে চলে গেল আর আমাদের গাড়িটা সমান স্পিডে চলবার ফলে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে বাঁ পাশে নিচু হয়ে যেতেই কোন গাছ বা অন্য কিছুতে দমাস করে প্রচন্ড এক ধাক্কা মেরেই খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল ।

সেই ধাক্কায় আমি নিচে গড়িয়ে পড়লুম আর সেই লাঠিটা এসে আমার গায়ের ওপরে পড়ল। বেশ লাগলো আমার পড়ে গিয়ে কিন্তু ব্যথা সামলে আগে লাঠিটাকে আমি সিটের নিচে একদম ভিতরে ঠেলে দিলুম। ততক্ষণে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে আর অন্ধকারও হয়ে এসেছে দিব্যি। আমি যেন পড়িই নি তাই দেখাতে নিঃশব্দে হাতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সিটে উঠে শুয়ে পড়লুম আবার। আমার দিকে তখন কারো বেশি নজর নেই মনে হল। কে একজন বেশ হতাশ গলায় বাইরে থেকে বলল , "হায় রাম, ই তো সত্যানাশ হো গিয়া। অগলা বাঁয়া চক্কওয়া নিকল গয়ল হও, ধক্কে সে। চার কে চারো নাট গায়ব। জবর বচ গইলি লেকিন অব কা হোই? স্পেয়ার নিকাল কে ফিট কর নাটে পহলে, আউর টর্চ লে অক্কর খোজ, উ পহিওয়া সরবা ছটককে গয়ল কঁহা।"

শুনে আমার তো খুব মজা লাগলো। ঠিক হেসেই ফেলতুম পরিস্থিতি একটু ভালো থাকলে। সেই একটা কবিতা আছে না- - গাড়ির চাকা ছিটকে পালায়, উল্টে বুঝি পড়বে নালায়.... , এই গাড়িরও সেই অবস্থা হয়েছে মনে হয়। সে বেশ মজা। এইবার তাদের বাধ্য হয়ে পেছনের দরজার লক খুলতে হল। আমি তেমনিভাবেই শুয়ে পড়ে আছি দেখে তারা বিশেষ নজরও দিল না আমার দিকে। তারা চাকাটাকে ধরে নিচে নামাবার জন্য টানাটানি শুরু করে দিলো। খানিক পরে সেটা দমাস করে নিচে পড়লো গিয়ে। দরজাটা ঠেলে দিয়ে চাকাটাকে গড়িয়ে নিয়ে চললো তারা। তখনই কে বললো, "আবে,

ই তো সরবা পাংচর হো গয়ল বা হো। আব পহলে খোজ উ পহিয়া গয়ল কিধর? ও হি কে ফিট করে কে পড়ি। চার ঠে নাট ভি চাহি।” মনে হয় সে রাম সিং।

আর একজন বললো, “আরে নিচে বঁহি পর ছটককে যাকে গিরল হোই পহিয়া। নাটে, তু জলদি সে যো, আউর উঠা উসে।”

সকলে চাকা তুলে আনতে ছুটলো আর আমি সেই লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে টুপ করে বেরিয়ে এলুম গাড়ি থেকে।

ওরে বাবা, দেখি যে বুড়োটা যায়নি মোটেই। পাহারায় আছে।আমাকে দেখতে পেয়েই সে তেড়ে এলো হাতে এই বড় এক ছুরি নিয়ে। আমি তখন কী করি? চট করে সেই লাঠিটা তুলে নিয়ে তার ডগাটা তার মুখের দিকে এগিয়ে দিলুম আর আগেই দেখে রাখা সুইচটা চেপে ধরে রইলুম।

সুঁইইইইইইইই....

ধপ করে পড়ে গেল লোকটা নিঃশব্দে ঠিক একটা আলুর বস্তার মতন। ছুরিটা ছিটকে গেল। সেটাকে তুলে দূরে গাছের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তখন সেই বস্তাটাকে টেনে এনে আমার সিটে তুলে শুইয়ে দেওয়া কি সহজ কাজ নাকি? আমাকে একলাই করতে হল তাও। চঞ্চল সঙ্গে থাকলে একটু সুবিধে হত। ততক্ষণে চাকা তুলে নিয়ে আসছে অন্য দু’জন। দেখেই আমি গাড়ির আড়ালে সরে গেলুম।

তারা আমি শুয়ে আছি কিনা দেখে নিয়েই চাকা ফিট করতে বসে গেল।আমি সরে এসে রাস্তার উল্টোদিকের কয়েকটা গাছের আড়ালে আড়ালে চলে গেলুম অনেকটা। শেষে গাছেতেই উঠবো কি না ভাবছি একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কেননা চাকা ফিট হলেই ধরা পড়ে যাবে যে আমি নেই, তখন হঠাৎ দেখি সামনে থেকে এক মোটর সাইকেল আরোহী আসছে। সে এসে থামলো আর নির্জন পথ দেখে ইঞ্জিনটা বন্ধ না করেই দ্রুত নেমে পড়ে ছুটলো বাথরুম সারতে। আমিও লাঠিটা নিয়ে গিয়ে উঠে পড়লুম তার মোটর সাইকেলের সিটে।

লোকটা কিন্তু বেজায় চালাক। ঠিক নজর রেখেছিল। গাড়ির হেডলাইট তো জ্বলছিল। দেখে ফেলেছে। তা আমি বসেই আছি লোকটা তেড়ে আসছে দেখেও। আসুক। ওকে আর বেশি চিৎকার করতে দেওয়া উচিৎ নয়। আমার কলার বা চুলের মুঠি টেনে ধরবার জন্য সে হাত বাড়িয়ে আরো কাছে আসতেই আমি লাঠিটা তার দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে বোতামটা টিপে দিলুম। লোকটা গড়িয়ে পড়ে যেতে লাঠিটাকে ঠিক করে বাইকের গায়ে আটকে বেঁধে নিয়ে সাইড স্ট্যান্ড সরিয়ে দিয়ে দু'হাতে

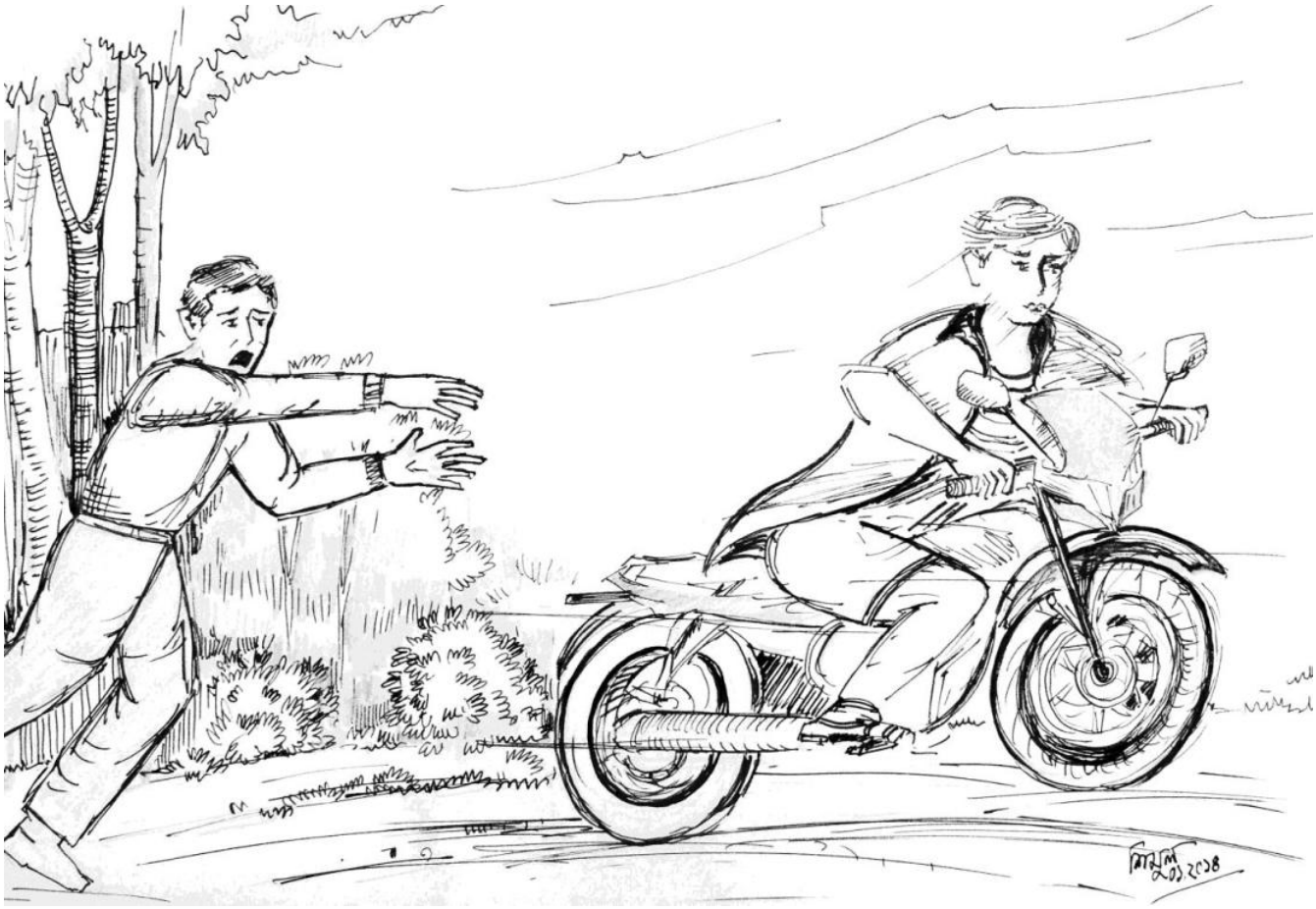

হ্যান্ডেল ধরে বসে ক্লাচ টিপে গিয়ার দিলুম। দেখতে দেখতে থার্ড গিয়ার। ডাকাতির বদলে ডাকাতিতে মনে হয় দোষ নেই। চুরি তো আর আমি করিনি। এখন বাড়ি পৌঁছুলে বাঁচি।

অবশ্য হ্যান্ডেলটা আমার পক্ষে বেশ বড়। দু'হাতে ধরে বসে থাকা সহজ নয়। কবে যে বড় হবো মা দুর্গাই জানেন।

আমি ঠিক করলুম যে চুরির মোটর সাইকেলটাকে বাড়ি পৌঁছানোর আগেই সড়কে কোথাও ফেলে রেখে দিয়ে যেতে হবে। আধ মাইলটাক আগে হলেই হবে। বাকি রাস্তা না হয় লাঠি হাতে নিয়ে হেঁটেই যাবো।

চঞ্চল আর কাকু কী করছে এতক্ষণ তা কে জানে? তবে আমি কিন্তু একটুও ভয় পাইনি, সত্যি বলছি। কিন্তু এই ঘটনার পরে যদি কাকুর সাথে আমাকে নৌগড় যেতে হয় তবে ছদ্মবেশ একটু নিতেই যে হবে, তা ঠিক। নইলে আমাকে দেখলেই তো চিনে ফেলবে!

বাড়ি পৌঁছে দেখি তখনও সেখানে হইহই কান্ড চলছে। কাকু বাড়িতে ফিরে এসে আমাকে কোথাও না দেখতে পেয়ে চঞ্চলের বাপীকে ফোনটোন করে চারদিকে আমার খোঁজে পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছে অনেক। সে যাক গিয়ে, তারা সকাল নাগাদ আমার ফেলে আসা মোটরবাইকটা হয়তো ঠিক খুঁজে বার করবে।

চঞ্চল ছুটে এসে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। চোখে জল টল টল করছে তখনও। কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, "বাদল, তুই কোথায় গিয়েছিলিস এইভাবে? সদর দরজা খুলে রেখে দিয়ে? আর তোর হাতে লাঠি কেন? তোর কি কোথাও চোট লেগেছে?"

আমি হেসে বললুম, "চঞ্চল, অনুমান কর দেখি কী হয়েছিলো? মাথা ঠান্ডা করে বল।"

চঞ্চল মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "আমি এখন কিচ্ছু বলতেই পারবো না। তুই বাড়িতে নেই দেখে আমাদের মাথা ঘুরে গিয়েছে। কাকু বলেছে তোকে কে বা কারা এসে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তুই কাউকে দরজা খুলেছিলিস হয়তো কাকু এসেছে ভেবে সিকিউরিটি চেন ছাড়াই, তখন.... . '

আমি শুনে বললুম, "কাকু একদম ঠিক বলেছে, চঞ্চল। খানিকটা হয়রানি গেল আমার একটু ভুলের জন্য আরকি, তবে গন্ডগোল দেখা গেল বেশ বেড়েছে। মনে হয় সেই নৌগড়ের কয়েকজনই এসেছিলো খবর পেয়ে যে কাকু এই কেসটা হাতে নিয়েছে। এর সাথে একটা বড় গ্যাং কিন্তু জড়িয়ে আছে। শুধু ছিঁচকে চোরের দল এরা নয়। কোন বিদেশি শক্তির সাহায্যও আছে। এই লাঠিটাই তার প্রমাণ। এটা এই দেশের তৈরি জিনিসই নয়, চঞ্চল। এই লাঠির অনেক গুণ আছে। দেখে আমিও বুঝতে পারিনি প্রথমে।"

"তবে আমাদের আজ আর এখুনি পালাতে হবে এখান থেকে দ্বিতীয় আক্রমণ হবার আগেই। ঘরে চল এখন। কাকু কোথায়? সব বলছি।"

কাকু প্রথমে আমার কথা সব শুনে নিয়ে তারপরে বললো, "বাদল, তুমি ঠিকই বলেছো। আজই রাতে পালাতে হবে আমাদের। ওদের জায়গাতেই গিয়ে হাজির হবো আমরা, তবে সুরক্ষা চাই। রাস্তায় আর সেখানে বিশেষ পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা আমি করছি। তবে এই যাত্রায় ছদ্মবেশও একটু চাই আমাদের। বিশেষ করে বাদল, তোমার জন্যে তো চাইই। দেখি, দাদাকে আবার ফোন করি। ভালো গাড়ি ও আমাদের চাই একটা। নৌগড়ের কাছে কোথাও থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রেনে আমরা যাব না। সুবিধাজনক ট্রেনও নেই আর সময়ও যাবে অনেক। সেই সাথে আমাদের বন্ধুদের নজরে পড়বার ভয়ও থাকবে। মনে তো হয় বেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। আর নৌগড়ের গোটা জঙ্গুলে জায়গাটা ও নাকি নকশাল প্রভাবিত। দাদা বলছিলো।

"তা চঞ্চল, বাদল তো নিজেই এসে গিয়েছে। ওকে উদ্ধার করে আনতে যেতে হয় নি আমাদের বলে অনেকটা সময় ও বেঁচে গিয়েছে। তাই ততক্ষণে তোমরা দু'জনে মিলে আমাদের সব কিছু দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নাও গিয়ে। আলো নিবিয়ে রেখে খানিকক্ষণ দেখতে হবে, তারা কেউ হয়তো আসতে পারে আবার রাতে। আর নাহলে বেরিয়ে পড়া যাবে তখন..."

চঞ্চল হেসে বললো, "চল বাদল, আমরা তৈরি হয়ে নিই গিয়ে। রাতের খাবার দাবার কাকু সব তৈরি করে নেবে ততক্ষণে ঠিক। খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লেই হবে।"

২

আমরা রাত একটার সময় একটা সাদা ইনোভা গাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে উঠে বসলুম। গাড়িটা পুলিশের। চালকও প্লেনড্রেস পুলিশ একজন। চঞ্চল চোখে রোদচশমা লাগিয়ে আর সেই লাঠিটা হাতে নিয়ে এক প্রতিবন্ধী ছেলে আর আমি মাথায় গামছা বেঁধে পুরনো পোশাক পরে ফাইফরমায়েস খাটা চাকর সেজেছি। চঞ্চলের চশমাটায় নাইটভিশন ব্যবস্থা আছে। রাতেও দেখতে অসুবিধা হবে না। লাঠিটাকে আমি সাদা রং করে নিয়েছি চট করে। কাকু সামনের সিটে আর আমি চঞ্চলকে নিয়ে পেছনের চওড়া নরম কভারওয়ালা সিটে বসেছি। ঘুমের দরকার হলে শুয়ে পড়তে পারব। অনেক জায়গা আছে ।তবে এই সব জামাকাপড় পরে শুয়ে ঘুম ভালো হবেই না ট্রেনের মতন তা ঠিক।

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিলো। আবার কাশীর গঙ্গা পার হ'তে হ'বে মালবীয় সেতু দিয়ে। ট্রেনে অন্তত বসে লুডো খেলাও যায়। এই গাড়িতে সে গুড়েও বালি। মহা মুশকিল আমার। কমিকস্ যে পড়ব বসে, তা আলো কই? যাচ্ছেতাই কান্ড। চঞ্চল অবশ্য শুয়ে পড়লো একটু পরেই। আমার ঘুম আসছে না। কাকুও ঠায় বসে আছে। কি ভাবছে কে জানে। আমি কাকুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলুম।

একঘন্টা কাটল। আমরা নকশাল প্রভাবিত এলাকায় এসে গেছি বলে মনে হয়। ড্রাইভার আংকল খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাই হয়তো। খানিক বাদে সামনে একটা কোন সেতু আসছে মনে হল। দু'পাশে সাদা রেলিং পড়তে শুরু করেছে। হঠাৎ দেখি রাস্তার মাঝখানে একটা লোক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দেহাতি লোক বলে মনে হয়। গামছায় তার মুখ ঢাকা। সে মনে হয় আমাদের গাড়ি থামাতে চাইছে। কিছু ব্যাপার হবে। হয়তো সাহায্য চাই নয়তো ডাকাতও হতে পারে। কাকু রিভালবার বার করছে। দেখাদেখি ড্রাইভার আংকল ও পকেটে বাঁ হাত ঢুকিয়ে ব্রেকে চাপ দিয়েছে। গাড়ি থেমে আসছে। আমি ঘুমন্ত চঞ্চলকে আড়াল করে বসে জানলার কাচ অল্প খুলে লাঠিটা হাতে নিয়ে তৈরি হলুম।

"কে? কী চাই?"

"ইধার কঁহা যানা হ্যায়? সাথ মে বাল বাচ্চে কো লেকর কঁহা যা রহে হো?"

"নৌগড়।"

"পিছে সে আউর এক রাস্তা হ্যায়। ঘুমকে চলা যাও। ইধারসে নহি।"

"কিঁউ?"

"তখনি পিছনে জাগল কোঁ কোঁ করে সাইরেন ধ্বনি। আর লোকটা তা শুনেই উত্তর না দিয়ে এক লাফ মেরে সেতু থেকে নেমে পড়ে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বেশ মজার কান্ড তো!"

"হয়তো পুলিশ জিপ আসছে একটা নির্ঘাৎ।"

তবে রাত পাহারার ব্যবস্থা সত্যিই করা হয়েছে দেখছি। কাকু ভুল বলেনি তখন। তা এখন কাকুই কিন্তু বললো, "দিবাকর, জলদিসে গাড়ি ব্যাক করো। কঁহি কুছ গড়বড় জরুর হ্যায়। যানে সে পহলে চেক করনা হোগা।"

আমাদের গাড়ি ব্যাক করে মুখ ঘুরিয়ে নিলো উল্টোদিকে আবার।

"আভি য়ঁহা সে দূর লে চলো গাড়ি কো। কম সে কম পাঁচশো মিটার। ফির উতরকে আনা হোগা পয়দল চল কর.... "

কাকুর নির্দেশে গাড়ি এগিয়ে চললো। সেতুর সাদা রেলিং শেষ হ'তে আমাদের গাড়ি গিয়ে পথের বাঁপাশ ঘেঁসে থামল। আমাদের পাশ দিয়ে তখনি একটা গাঢ় নীল রঙের পুলিশ জিপ ছুটে চলে গেল আমাদের দিকে ফিরেও না তাকিয়ে।

দরজা খুলে কাকু নেমে পড়ে বললো, "জিপটা তো সেতুতে উঠবে। আমাদের বারণ করলো কেন তা কে জানে। আরে দিবাকর। তুমি আবার নামলে কেন নিচে? আমি একলাই যেতে পারব। তুমি দরজা খোলা রাখবে না একদম। বন্ধ করো। গাড়িতে এসি চলছে না?"

বলেই কাকু রিভালবারটা পকেটে ফেলে রুমাল বার করে দু'কানে জড়িয়ে বাঁধতে শুরু করে আমার দিকে চেয়ে বলল, "তুমি কাচ বন্ধ করো, বাদল। আরে....কি সর্বনাশ...ও কিসের আলো?"

ভয়ে আমি কাচ বন্ধ করছি হঠাৎ শুনি দারুণ জোরে এক বিস্ফোরণের শব্দ।.... গুড়ুম ...হুড়ুম ...দড়াম... ধাঁই....করে বিষম এক শব্দঝঞ্ঝনা। কাকু ততক্ষণে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। দিবাকর আংকল

ছিটকে পড়েছে, আর দূরে যেন কেউ তুবড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে একসাথে এক ডজন। আলোয় আলো চারদিক। সেই আলোর লাল বৃত্তের মাঝে দেখলুম যে শূন্যে একটা পাখি যেন উড়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। মনে হল কয়েকজন লোক আর্তনাদও করছে যেন। কাচ বন্ধ তাই ঠিক শোনা গেল না। গাড়ির ভেতরেও জোর ঝটকা লাগলো আমাদের। চঞ্চল জেগে উঠে বললো, "বাদল, কী হয়েছে? গাড়ি দুর্ঘটনা? কাকু কোথায়?"

আমি বললুম, "সেতু দুর্ঘটনা। মাইন বিস্ফোরণও হতে পারে। ও মাই গড, পাখিটা তবে সেই পু..."

"কোন পাখি?"

"বলব। দাঁড়া।"

গাড়ির বাঁ পাশের দরজা খুলে বললুম, "ও কাকু, আমি আসছি। ড্রাইভার আংকল কি চোট পেয়েছে?"

বাইরে থেকে কাকু বললো, "পড়ে গিয়েছে। বিস্ফোরণের আগে সময়মতো মাটিতে শুয়ে না পড়লে এই হয়। এখন চোখেমুখে জল দিয়ে হাওয়া করে তুলে শোয়াতে হবে ব্যাক সিটে। তোমরা নেমে এসে সামনে বোসো। আমাকেই এখন ড্রাইভও করতে হবে। রাস্তাও তো চিনিনা ছাই। আগে ব্যাক করি তো খানিকটা।"

আমি নেমে চঞ্চলকে সামনের সিটে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করলুম সামনের তারপর পিছনের সিট থেকে ওয়াটার বটল নিয়ে এসে কাজ শুরু করলুম কাকুর কথামতন।

গাড়ি চললো মিনিটদশেক পরে। পেছনে পড়ে রইলো আধভাঙা সেতু আর অনেক নিচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বা নদীর জলের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুলিশ জিপ। নকশালপন্থিদের ধ্বংসের চিহ্ন। নিচে নদী না রাস্তা না রেল লাইন কি যে আছে কে জানে? আমরা একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছি ।

ড্রাইভার আংকল সুস্থ হয়ে উঠলো আধঘন্টা পরে। তবুও তার নির্দেশ অনুযায়ী কাকুই চালাতে রইলো গাড়ি। আমি বললুম, "কাকু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে?"

কাকু ড্রাইভিং করতে করতেই বলল, "বলো, বাদল।"

আমি ও ড্রাইভার আংকল বা চঞ্চল কেউ না শুনতে পায় এমনিভাবে বললুম, "তটবন কী রকমের বন, বলো না, কাকু?

"দন্ডকবন, খান্ডব বন অনেক সব বনই তো ছিল আগে মহাভারতের কালে তা তো শুনেছি। এখন ও কিছু কিছু আছে টিঁকে হয়তো, কিন্তু তটবন? সমুদ্রতটের বা নদীতটের বন কি? নাঃ , এ ঠিক হচ্ছে না ... আচ্ছা বাদল, কথাটা কি কোন বাঙালির মুখে তুমি শুনেছো?"

"না কাকু, একজন হিন্দীভাষীর মুখের কথা।"

"এই রে, তা'হলে তো কথাটায় বন মানে জঙ্গল না ও হতে পারে, বাদল। অন্য অর্থে প্রয়োগ করা হতেই পারে শব্দটা। আগে ল্যাক্টো বন বন নামে কিন্তু একটা চকোলেট ছিল। বেশ ভালো খেতে। পাঁউরুটিও হয় একটা ওই নামের। মিষ্টিমতন বেশ লাগে।"

আমি হেসে ফেলে বললুম , "কাকু, তোমাকে ধন্যবাদ । শুনেই তো খেতে ইচ্ছে করছে আমার। কিন্তু আমি এইবার বুঝতে পারছি মানেটা একটু একটু করে। তবে পরীক্ষা প্রার্থনীয়, কাকু.... হিঃ...হিঃ...হিঃ..."

কাকু চুপ। কী মানে জানতে চাইলো না। আমরা শেষরাতে যথাস্থানে হাজির হয়ে গ্রামের একটা ঝোপড়ি মতন বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। নৌগড় বাজার থেকে জায়গাটা নাকি অনেকটা ভেতরে। গ্রামের মধ্যে। সেখানে লাইটও নেই। নিঃঝুম ঘোর অন্ধকার রাত। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে জোর। তবে একজন চৌকিদার ছিল। সে ডাকাডাকিতে উঠে বেরিয়ে এসে ঘুমচোখে গেট খুললো। কাঠের আগড় বলাই ভালো সেই গেটকে। ঘরও খুলে দিলো সে একটা। মাত্র শিকল তোলা ছিল। তালাটালার বালাই নেই। এই রকম ব্যবস্থায় চুরি হবে না তো কী হবে? কেমন লোক রে বাবা এরা সব?

ঘরে মাত্র একখানা খাটিয়ায় একটা কম্বল পাতা আছে বটে কিন্তু টেবিল চেয়ারের বালাই না থাকলেও একটা বালতি ও মগ রয়েছে। জল সমেত। একটা হ্যারিকেন সে জ্বেলে এনে দিতে তবে সব কিছু ঠিক করে দেখা গেল। একটা অন্য খাটিয়া ও এনে পাতলো সে লোক বেশি দেখে। ড্রাইভার আংকল একটা অন্য ঘর পেলো।

কাকু ব্যাগ থেকে টর্চ বার করতে করতে মৃদুস্বরে বললো, "জায়গাটা খুব সুবিধের নয় বলে মনে হচ্ছে, বাদল। তটবন না হলেও এমনি বন তো থাকতেই পারে আশেপাশে। এ হচ্ছে এক অজ গ্রাম।

নৌগড় বাজার থেকে খানিক দূরে। কলটলও নেই। জলের জন্য একটা কুয়ো থাকলেও আছে। বাথরুম যে নেই আমি শিওর। তার মানে বুঝছো কিছু, বাদল?"

আমি শুনেই খিল খিল করে হেসে দিতে চঞ্চল বললো, "হঠাৎ হাসির কী হল, বাদল?"

"সকাল হলে বুঝতে পারবি নিজেই, যখন ওপেন এয়ার বাথরুমে যেতে আর কুয়োতলায় চান সারতে হবে...হিঃ হিঃ হিঃ—"

সকালবেলায় কাঁচা ভিজে ছোলা ও দুধ দিয়ে জলযোগ সারতে হল গ্রামের দারোগার ব্যবস্থায়। তারপর চঞ্চল প্রতিবন্ধী সেজে লাঠি হাতে ও আমি চাকর হয়ে মাথায় গামছা জড়িয়ে রওনা হয়ে পড়লুম।

দিনভোর আমাদের রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াতে হল। সবাই কার কী চুরি গেছে, তার লম্বা লিস্ট হাতে নিয়ে এসে কাকুকে জ্বালিয়ে মারতে শুরু করলো। হাতে হাতে চোর ধরেও বামাল ধরা না পড়ায় পুলিশকেও চোরদের ছেড়ে দিতে হয়েছে কখন আর কীভাবে, সেই সব ধারাভাষ্য শুনতে শুনতে আমরা অস্থির। দেহাতি ভাষায় কাঁদুনি গাওয়া আর থামেই না। মহিলাদের তো কথাই নেই । অর্ধেক কথা তো বোঝাই দায়। ধন্যি বাবা কাকুর ধৈর্য। একটু ও রাগলো না কাকু। সব লিস্ট নিল। অভিযোগ শুনল। নোটও করল কিছু কিছু। শেষে গড়ের মন্দিরে গেল। সেই মন্দিরে তখন দেবতা নেই। তাই বলতে বলতে পুজারি বামুনের কান্না আর থামেই না।

দুপুরে গ্রামপ্রধানের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল।শুদ্ধ দেশি খানা। ডাল, দেশি ঘি লাগানো মোটা মোটা চাপাটি আর আলুর ভাজি। বাটি চোখা অর্থাৎ লিট্টি আর বেগুন আলু পোড়া খাবার নিমন্ত্রণ পরদিনের জন্যও পাওয়া গেল। এইসব খাবার দিনকয়েক খেলে আর দেখতে হবে না! তবে গ্রামের অভিজ্ঞতাও বেশ মজার। যদিও চঞ্চলের কিচ্ছুটি সেখানের পছন্দ নয়, তবে তার আর কী করা যাবে? এরই মধ্যে এই বয়সে চঞ্চলের মতন সুন্দর বাবুয়া কি করে প্রতিবন্ধী হল তাও অনেকে জানতে চেয়েছে কাকুর কাছে বেশ দরদ দেখিয়ে। কাকু বলেছে, "উপরবালে কি মর্জি, ভাই। " মোটকথা এইসব গ্রামেতে সুবিধার অনেক অভাব আছে ঠিকই কিন্তু লোকগুলো শহুরেদের মতন কুচুটে নয়। চোরডাকাতের কথা তো আলাদা। তারা নেই কোথায়?

সে যাক। বিকেলে আমাদের দু'ক্রোশ দূরে থানায় যেতে হল। গ্রামের কাঁচা অসমতল রাস্তায় গাড়ি না থাকলে সাইকেল বা বৈলগাড়ি ভরসা। দারোগা মিঃ দুবে একখানা কাগজ হাতে নিয়ে মুখ শুকিয়ে বসেছিলেন একটা কালোমতন টেবিলের পিছনে নিজের পুরোনো কাঠের চেয়ারে। অন্য হাত মাথায়। কি না, উপর থেকে রিজার্ভ ফোর্স আসছে কাল। সব চোর ধরা পড়া চাই তিনদিনের মধ্যে আর চোরাই মালও উদ্ধার হওয়া চাই। বুঝলুম কালকের সেতুভঙ্গ আর পুলিশ জীপের উড়ে যাওয়ার ফল।

কিন্তু কাকু চুপ। কাল আবার দেখা হবে বলে সোজা বাড়ি ফিরে এসে খাটিয়াতে গিয়ে ঝপ করে শুয়ে পড়লো চঞ্চলকে নিয়ে। কাকু, কোন সূত্রই পায়নি, বোঝা গেল। আমিও তখনও কিচ্ছুটি বুঝতে পারিনি।

চঞ্চল বললো, "কাকু, ধুলোয় গা হাত পা কর কর করছে। আর তেমনি গরমও লাগছে। কাকু, চান করা গেলে ভালো হতো।"

শুনেও কাকু উঠলো না। শুধু বললো, "সন্ধে হোক।"

সন্ধের পরেই দেখি কাকু গিয়ে নিজেই কুয়ো থেকে জল তুলে আমাদের চানটান করিয়ে দিল।আমি বললুম, "কাকু, এই এলাকাটা কাল আমাদের কিন্তু একবার পুরো ঘুরে দেখতে হবে। পুলিশ ফোর্স কখন আসবে, কাকু?"

"মনে হয় সন্ধ্যাবেলায়। এইরকম সময়ে।"

মুখ ধুতে গিয়ে কুয়োর জলটা বেশ মিষ্টিমতন লাগলো আমার। অনেকটা যেন নদীর জলের মতন। কেন মনে হল তা ঠিক বুঝলুম না। তবে চান করে বেশ ঠান্ডা আর ঝরঝরে লাগছিলো।

"আচ্ছা কাকু, এইখানে কোন নদী আছে? কুয়োর জলটা যেন নদীর মতন মিষ্টি, না কাকু?"

কাকু বললো, "না নেই। তবে কোন ফল্গু নদী থাকলে বলা কঠিন।"তারপরে বললো, "বাদল, আমিও নেয়ে নিই এইবারে। লন্ঠনের আলোতে তোমরা তারপরে ঘরে বসে না হয় লুডো খেলে নিও খানিক। খাবার আসতে রাত আটটা তো বাজবেই।"

আমি তখন কাকুর ফল্গু শব্দটার মানে খুঁজছি মনে মনে। মনে পড়ি পড়ি করে ও মনে পড়ছে না কিছুতেই। কাকুকেও জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে।

লুডো খেলতে বসে অন্যমনস্ক থেকে ভুল চাল দিয়ে চঞ্চলের কাছে একদান গো হারান হারবার পরে মনে পড়ল মানেটা..... অন্তঃসলিলা। তত্ক্ষণে আমাদের জন্য ডাল আর রুটি এসে হাজির। কাকু খেয়ে উঠে চঞ্চলকে নিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। আমি অন্য খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ভাবলুম রাতে আবার সেই ছেলেধরা বজ্জাত ডাকাতগুলো না আসে। আসতেই পারে। পাহারার তো বালাই নেই। তাই মনে হয় যে তাদের ভয়ে রাতে আমার ভাগ্যে ঘুম নেই লেখা। কাকুরা ঘুমিয়ে পড়লে তখন না হয় দেখা যাবে। একটু সাবধান থাকা ভালো।

খানিক পরে আমার দু'চোখের পাতা বেশ ভারীমতন লাগতে দুত্তোর ঘুমের না নিকুচি করেছে বলে উঠে পড়লুম আমি। তালাটা বার করলুম কাকুর ব্যাগ থেকে। ঘরটা একদুয়ারী বলে তালাটা শুধু সুরযোতে পরিয়ে আটকে দিলুম আগে। কেউ না শিকল তুলে আটকে দিতে পারে দরজাটা বাইরে থেকে। সঙ্গে একটা পাতলা পলিথিনের টুকরো ছিল। সেটা জানলার গ্রিলের গায়ে ভেতর থেকে টেপ দিয়ে আটকে দিলুম যাতে চট করে কিছু না ঢুকে পড়ে ঘরে।

আমার ছোট্ট এলইডি টর্চ জ্বেলে দেখলাম ঘরের এক কোনে বেশ বড় একটা মাটির জালা বা কুন্ডা রয়েছে। সেটাকে তুলে নিয়ে এসে বাইরে দাওয়ার এক ধারে বসালুম। এইবার চাই জল। দড়ি বালতি নিয়ে গিয়ে কুয়ো থেকে কাকুর মতন করে জল তুলে এনে জালাটায় ভরতে শুরু করে দিলুম।

শেষে ঘরে আর না থেকে দাওয়ায় জালাটার আড়ালে গিয়ে বসে রইলুম আমি। দেখাই যাক না আমার অনুমান সত্যি হয় কি না।

কিন্তু হঠাৎ আমার পেটে দারুণ ব্যথা করতে শুরু হয়ে গেল। কুয়ো থেকে জল তুলেছি বলে তো মনে হয় না পেটে এতো ব্যথা করছে। সন্দেহ হল ফুড পয়জনিং নয় তো? কাকুর হোমিওপ্যাথির ওষুধের বাক্স থেকে এখনই ওষুধ খেতে হবে আমাকে। তাই খেয়ে গিয়ে এসে আবার বসেছি।

আবার একটু পরেই আমার মনে হল টয়লেটে মানে এই গ্রামের ভাষায় মাঠে যেতে হবে। এই রাতে একলাটি। কী করি? কাকু তো সবে ঘুমিয়েছে। ডাকাও ঠিক নয়। আর এখুনি মনে হয় কেউ আসছেও না বেশি রাত না হলে। অবশ্য গ্রামে রাত সাড়ে দশটা অনেক রাত।

আমার পিন পিস্তল, একটা তোয়ালে, একলোটা জল আর টর্চ নিয়ে কুয়োতলা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলুম বাইরের দিকের গেট না খুলে। খুব গাছপালা আছে এমন একটা জায়গা মিললো। তোয়ালে জড়িয়ে বসে পড়ে বুঝলুম আমার পেট ছেড়ে দিয়েছে আর খুব কনকনও করছে। নাঃ, মার্ক সল- - ৩০ ও খেতে হবে দেখছি। নির্ঘাৎ ডালে কিছু মিশিয়ে দিয়েছে কেউ। এ'তো খুব বিপদজনক জায়গা দেখছি! কারো ভরসা নেই। কাল স্রেফ চিঁড়ে ভিজিয়ে তাই খেয়ে থাকব আমি। কাকু চিঁড়ে, মিল্ক পাউডার সব সঙ্গে করে এনেছে।

ঘরে ফিরে এসে ওষুধ খেলুম। দরওয়ানের তখনও পাত্তা নেই কোথাও। কী আর করি একলাটি? আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলুম আমি। কতক্ষণ বসে ছিলুম তা জানি না। হাতে তো

ঘড়ি নেই আমার! একটা ডিজিটাল ঘড়ি না হলেই নয় দেখছি। তা একটু বেশ ঝিমমতন এসে গিয়েছিলো আমার।

শুকনো পাতার ওপরে মচ মচ শব্দে চটকা ভাঙলো। পাতাগুলো আমিই এনে দাওয়ায় ছড়িয়ে রেখেছিলাম খানিক আগে। চেয়ে দেখি যে একটা লোক খুব সতর্কভাবে দাওয়ায় এসে উঠে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে প্রথমে শিকলটা তুলে দরজা বন্ধ করতে চেষ্টা করলো । না পেরে তখন একটা পকেট স্প্রেগান বার করে দরজায় আর জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে কি যেন স্প্রে করতে শুরু করলো সিঁ সিঁ সিঁ করে। তারপরে সে স্প্রেগানটা পকেটে রেখে আর একটা কী বার করল দেখে আমিও আমার পিন পিস্তলটা তুলে নিয়ে লোকটার পায়ে নিশানা করলুম।

হঠাৎ ফস করে সে লাইটার জ্বেলে ঘরের দরজা জানলায় আগুন ধরিয়ে দিলো। আমিও ট্রিগার টিপলুম। কাকুর তৈরি আমার এই খেলনা পিস্তলের স্প্রিংটা খুব মজবুত আমি জানি। একবার পায়ে পিন গেঁথে গেলে অপারেশান না করলে সে বার করা যাবে না তা ও জানি।

“আইরে বাপ্পা রে। মর গইলি রে…” বলে সে চিৎকার করে পেল্লায় এক লাফ দিয়ে নিচে গিয়ে পড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে গেল।

ওদিকে ঘরের দরজা জানলা সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে দেখে আমি পিস্তল ফেলে দিয়ে জলভর্তি লোটা হাতে নিয়ে জল ছুঁড়ে আগুন নেভাতে উঠেপড়ে লেগে পড়েছি। অপরাধী ধরতে চেষ্টা করবার তখন সময়ই নেই। দরজার আগুন তো কিছুক্ষণ পরে নিভলো কিন্তু জানলার পলিথিন শিটটা পেট্রোলে ভিজে ছিল বলে দাউ দাউ করে পুরোই জ্বলে গেল। কিছুতেই নিভলো না। ঘরের মধ্যে কিন্তু আগুন লাগলো না কিছুতে, এই যা রক্ষা। কাকু ততক্ষণে ঘুম ভেঙে আগুনের বহর দেখে লাফিয়ে উঠে ঘুমন্ত চঞ্চলকে কোলে তুলে নিয়ে জলে জলময় দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে আমার কান্ড দেখছে অবাক হয়ে।

"এসব কি কান্ড বাদল? তুমি শোওনি?"

"না কাকু। এ'সব হচ্ছে লঙ্কাকান্ড। আমাদের ঠিক গাধা বাঙালি মনে করে এরা। আরও কিছু কান্ড হয়েছে, কাকু। মনে হয় বারকয়েক করে আমাদের সকালে উঠেই মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। তোমাকে আর চঞ্চলকেও। আমার নম্বর তো লেগেই গিয়েছে। হিঃ....হিঃ...হিঃ...। ঘরে চলো, আমি বলছি সব।"

তাড়াতাড়ি করে কাকু কীসব ট্যাবলেট ওষুধ বার করতে বসলো আমার সব কথা শুনে। তা সেই ওষুধ খেয়েও আমাদের বার তিনেক করে দৌড়তেই হল মাঠে তারপরে। তাই পরের দিন আমাদের চিঁড়ে সম্বল করেই থাকতে হল সত্যিই।

৩

দিনভোর গোটা এলাকাটা ঘুরলো কাকু। বিকেলে দক্ষিণদিকটা দেখা বাকি আছে বলে সেইদিকে চললো পায়ে হেঁটে। তা সেদিকে চামারদের বস্তি ছাড়া আর কিছুই নেই দেখা গেল। খাঁ খাঁ করছে মাঠ। দূরে গোটা কয়েক গাছ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তির মধ্যে একটা মোটে গাছ ছিল। বহু পুরনো, তা সেটাকেও জন চারেক লোক মিলে দড়ি দড়া বেঁধে কাটছে দেখে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। গ্রামেতেও দেখি শহরের হাওয়া লেগেছে। গাছ কেটে ঘর বাড়ি তোলা শুরু হয়েছে।

আমরা দাঁড়িয়ে গাছ কাটা দেখছি। মাথার ওপরে তিন চারটে কি পাখি যেন খুব জোরে জোরে ডেকে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হঠাৎ গাছটা মড় মড় করে উঠলো। আর যারা গাছ কাটছিল, তারা গাছকাটা বন্ধ করে লাফিয়ে উঠে সরে গেল পেছন দিকে। সরে গিয়ে তারা সবাই একসাথে মিলে সেই দড়িদড়া টেনে ধরলো। গাছটা মড় মড় করে আড় হয়ে নিচু হচ্ছে তখন ধীরে ধীরে। কাকু সরে এলো আমাদের নিয়ে কিন্তু চঞ্চল হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল সেই পড়ন্ত গাছটার দিকে।

কি দুষ্টু ছেলেরে বাবা? ভয় ডর বলে কিছুই নেই। বাধ্য হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাকুও ছুটলো দুষ্টু ছেলেটার পেছনে। বললো, "এই চঞ্চল, না... না যেও না ও'দিকে এখন। গাছ পড়ছে তো, সাবধান...।"

চঞ্চল খানিক এগিয়ে গিয়েই হাই জাম্প দিলো একটা । ছেলেটা যখন নিচে এলো ধপ করে তখন তার হাতে কিছু রয়েছে দেখে কাকু বললো, "ওটা আবার কী চঞ্চল?"

"পাখির বাসা, কাকু। দুটো ছোট্ট ছোট্ট সাদামতন ডিমও আছে এর ভেতরে। আমি দেখে নিয়েছি। এইজন্যেই তো ওই পাখিরা অতো কাঁদছিলো, কাকু। তুমি শুনলে না এসেই ..."

"তা কী হবে ওই পাখির বাসা দিয়ে এখন?"

"দূরের ওই গাছগুলোর একটার ডালেতে তুলে বসিয়ে দেব। বাদল তো এই কাজে এক্সপার্ট ছেলে। ওর পকেটে সুতলিও আছে। আমি ঠিক জানি। বাসাটাকে দু'মিনিটেই ও ঠিক করে গাছে বসিয়ে দেবে ডিমগুলোকে না ছুঁয়েই।"

আবার সেই নেই কাজ তো খই ভাজ অবস্থা আমার কপালে। চঞ্চলের আব্দার। না মেনে আমি যাই কোথায়? যে গাছের ডালে বাসাটা বসিয়ে দিলুম আমি সেই গাছেই গিয়ে দেখি পাখিগুলোও বসে পড়ল সব ঝুপ ঝাপ করে। চেঁচামেচি সব তখন তাদের একদম বন্ধ। কাকু অবশ্য বাসাটা নিচে থেকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল সাবধানে, নইলে একলা পারতুম না আমি তা ঠিক।

গাছটা থেকে নেমে এসে আমি বললুম, "এবার কী হুকুম, চঞ্চল?"

"চল সোজা এগিয়ে গিয়ে, দেখি ও'দিকটায় কি আছে?"

"ভূত আছে..."

"তাই দেখবো, চল।"

তাই চললুম তিনজনে। খানিক পথ গিয়ে দেখি কিছু কোথাও নেই। নির্জন প্রান্তরে দূরে সূর্যাস্ত হচ্ছে। খুব সুন্দর দৃশ্য। পিছন থেকে একটা পাখি এসে আবার উড়ছে ঠিক আমাদের মাথার ওপরে।

"ওই বাঁধমতন জায়গাটা কিসের বল তো বাদল? ওইটার ওপরে উঠবো চল। সূর্যাস্ত সুন্দর দেখা যাবে।"

তাই গেলুম। চঞ্চল আগে গিয়ে লাফিয়ে উঠলো হাতচারেকের মতন উঁচু সেই মাটির বাঁধে।আমি নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে মাঠের মাঝে এই লম্বামতন বাঁধটা কিসের? ভেতরে ইঁট আছে হয়তো। তা এটা কোন কাজেই বা লাগে?

"ওপারে কি আছে, চঞ্চল?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

"কিচ্ছু তো নেই বাদল। শুধু বালির সমুদ্র। ওরে বাপরে....আরে আরে ঠোক্কর মারছিস কেন আমাকে? আমি কি দোষ করলুম আবার?"

বলেই ধপ করে নিচে আমার পাশে লাফিয়ে নেমে এলো, চঞ্চল।

"কি হয়েছে, চঞ্চল?"

"আরে, ওই দুষ্টু পাখিটা না আমাকে ঠুকরে তাড়িয়ে দিলো। সূর্যাস্ত দেখতেও দেবে না ও আমাকে। কি পাজি পাখি রে বাবা! আমি আবার উঠছি গিয়ে।"

চঞ্চল উঠেই কিন্তু আবার পরক্ষণেই লাফিয়ে নেমে এলো সেই পাখিটার ঠোকর খেয়ে। বললো, "আমার না বেজায় রাগ হচ্ছে, বাদল। তোর পিন পিস্তলটা একবার আমাকে দে তো, আমাকে ঠোকর মারা বার করে দিচ্ছি। দুষ্টু পাখিটার দুটো ঠোঁটই না পিন দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছি তো আমার নাম চঞ্চল নয়।"

আমি ভ্রু কুঁচকে বললুম, "একদম না চঞ্চল। আর কাকু, তুমি এই দুষ্টু ছেলেটাকে কোলে তুলে নাও তো। একদম ছাড়বে না কিন্তু। আমার সন্দেহ হচ্ছে কিছু বিপদ আছে এই জায়গাটায়। ওই পাখিটা সব জানে। আমরা কিচ্ছুটি জানি না। আমি পরীক্ষা করবো। কাকু, আমি এখুনি আসছি..."

কাকু চঞ্চলকে তখনি নিচু হয়ে কোলে তুলে নিলো আর পাখিটা ও তাই না দেখে ফিরে চলে গেল সেই গাছটায়। এ কী রহস্য রে বাবা?

আমি যখন ফিরে এলুম তখন আমার হাতে সেই কাটা গাছটার একটা ছোট ডাল দেখে চঞ্চল বললো, "গাছের ডাল দিয়ে পাখি তাড়াবি নাকি বাদল?"

আমি উত্তর না দিয়ে ডালটা নিজের শার্টের মধ্যে গুঁজে নিয়ে সেই বাঁধটার ওপরে চঞ্চলের মতন লাফিয়ে না উঠে দু'পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দু'হাতের চাপে আস্তে করে উঠে পড়লুম ।

আমার দেখাদেখি কাকুও চঞ্চলকে নামিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়ে উঠে পড়ল বাঁধটায়। চঞ্চল দুষ্টু ছেলে হলে কি হয়, ও ভীষণ বুদ্ধিমান আর কাকুর দারুণ বাধ্য ছেলে। ঠিক একটা মূর্তির মতন ছেলেটা দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি ডালটা হাতে নিয়ে বাঁধের ও'পারে বালিতে ছুঁড়ে দিয়ে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে রইলুম বাঁধের ওপরে। কাকুও। তবে কাকু বার বার মুখ ফিরিয়ে চঞ্চল কি করছে তাও দেখে নিচ্ছিলো।

প্রথমে কিছুক্ষণ তো কিছুই হল না। ডালটা বালিতে পড়েই ছিলো। তারপরে ধীরে ধীরে সেটা সোজা হয়ে উঠতে শুরু করলো আপনিই। ঠিক যেন ভৌতিক কান্ড। ভারী দিকটা নিচু হয়ে বালিতে গেঁথে গেল। একটু পরেই গোড়ার দিকটা ডুবে গেল আর তারপরে গোটা ডালটাও খুব ধীরে ধীরে বালিতে তলিয়ে যেতে শুরু করলো।

ব্যাপার দেখে কাকু বললো, "বাদল, তোমার কি মহাভারতের যুদ্ধের গল্পের কথা মনে আছে? মহারথী কর্ণের রথচক্র দিনের শেষে মেদিনী গ্রাস করে ছিলো জানো তো? কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরের কোন ও এক অংশের মতন এও হচ্ছে সেই সর্বগ্রাসী মেদিনী। আসলে কোন নদী বা জলাশয়ের বহু পুরনো খাত। এখন সেই নদী লুপ্ত বা অন্তঃসলিলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বালির নিচে এখন ও শক্ত মাটি নেই, হয়তো পাঁক কাদা বা জল আছে। তাই ওপরের বালিও শক্ত নয়, চলায়মান। এই হচ্ছে সেই প্রাচীন নদীর ...'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললুম, "বাঁধ বা তটবন্ধ, কাকু। যাকে ওরা হিন্দীতে তটবন বলছিলো। আর আমাকে এই বালিতেই ফেলে দেবে বলছিলো তুমি এই জায়গায় যদি আসো, ওদের বারণ না শুনে। আমাকে তাই অপহরণ করেছিলো বাড়িতে কখন আমি একলা আছি তা জেনে নিয়ে। এই তবে চোরাবালি, কাকু?"

"একদম ঠিক, বাদল। এখন আমি বুঝে গেছি রহস্যটা কোথায়। বাদল তুমি নেমে যাও। আমি শুয়ে শুয়ে আর বুকে হেঁটে পুরো বাঁধটা এখুনি পরীক্ষা করতে চাই। তুমি পিস্তলটা নাও আমার। রেডি থাকবে। কোন কিছু এগিয়ে আসছে বা নড়ছে দেখলেই গুলি চালাবে। নো মার্সি। কুইক।"

আমি নেমে পড়লুম নিচে আর কাকু নিজের ডান হাতটা বাঁধের ভেতর দিকে ঝুলিয়ে রেখে বাঁ হাতে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলো বাঁধের ওপরে শুয়েই। কাজটা খুব কঠিন। হাতে ভীষণ জোর লাগে। একটুতেই হাঁফিয়ে যেতে হয়। কাকু থেমে থেমে এগিয়ে চললো। সাথে নিচে আমরাও।

অনেকক্ষণ পরে ঘোর অন্ধকার হয়ে আসতে কাকু নেমে এসে মাটিতেই শুয়ে পড়ে বললো, "বাদল, চঞ্চলকে বলো, ওর বাপিকে ফোন করতে। যেন এখুনি কপ্টারে চলে আসে।ততক্ষণ আমাদের এইখানেই থাকতে হবে পাহারায়, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। এখনও হয়তো ফোর্স আসে নি। তবে আমি রহস্যের সমাধান পেয়ে গেছি। এই বাঁধের নিচের দিকে ঠিক এইখানে একটা লোহার বোল্ট পোঁতা আছে । আর সেই বোল্টে বাঁধা আছে একটা সরু কালো মজবুত নাইলন কর্ড। দড়িটা অনেক লম্বা। সব কিছুই বালিতে ডুবে আছে আর সেই দড়ির অপরপ্রান্তে খুবই ভারী কিছু বাঁধা আছে। টেনে তোলা একলার সাধ্য নয়।"

চঞ্চল ফোন করলো। চঞ্চলের বাপী ফোন তুলেই রাগ করে বললেন, "আরে, আমি তো এসেই পড়েছি। যতদূর পেরেছি কপ্টারে আসবার পরে এখন পুলিশের অয়্যারলেস ভ্যানে আসছি। তুই কাকুর সঙ্গে নৌগড় গিয়েছিস শুনেই তোর মা আমাকে ফোনে তাড়া করতে শুধু বাকি রেখেছে। বাদল ছেলেটা তো হচ্ছে মাস্টার বন্ড, ওকে তো যেতেই হবে, তাই গেছে। তোর খামোকা ওই সব ডেঞ্জারাস জায়গাতে যাবার কি দরকার ছিল, শুনি? ধরে এমন পিট্টি দেব যে তখন বুঝবি। তা নৌগড় বাজার

আসছে। সেখান থেকে তোরা যেখানে আছিস সেইখানে যাবার রাস্তা বল। নাঃ, সে ও তোর দ্বারা হলে তো! ফোনটা তোর কাকুকে দে শিগগির করে দেখি...।"

তারপরে তো কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ নিয়ে ভ্যান এসে হাজির। তখন কাকু সব চোরাই মাল উদ্ধার করতে শুরু করলো। একটা নয় চারটে বোল্টে বাঁধা বিরাট বিরাট সব বান্ডিল টেনে তোলা হল। সোনার বিষ্ণুমূর্তির সাথে অনেক অনেক অন্য সব ঠাকুরের মূর্তি আর গয়নাপত্র, টাকাপয়সা বহু কিছু দামি জিনিস উদ্ধার করা হল। পুলিশ সতর্ক ছিলো বলে চোরেরা সব চুরি বা ডাকাতি করে নিয়ে এসেও কিছুই বিক্রি করে উঠতে পারে নি। তবে আমার কিন্তু মনে হয় যে এইবার আর চোর ডাকাতগুলোর কোন নিস্তার নেই তা ঠিক। বিশেষ করে চঞ্চলসমেত সবাইকে পুড়িয়ে মারবার অপচেষ্টার কথা শুনে চঞ্চলের পুলিশ অফিসার বাপী যা রাগবে না!

কাকু তখন সেই সমস্ত জিনিসপত্র পুলিশের জিম্মাতে দিয়ে আমাদের দু'জনের হাত ধরে নিয়ে ছুটলো বাড়ি মানে বাসার পথে। আমাদের গায়ের গরম আর ধুলোময়লা কাটাতে আগে তিনজনে করলুম সেই কুয়োর মিষ্টি ঠান্ডা জলে স্নান আর তারপরে চিঁড়ে টিঁড়ে যা ছিলো জলে ভিজিয়ে পেট পুরে খেয়ে নিলুম। তার পরেই কাকু জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে পডলো। সেই ঘরে আর থাকে কাকু চঞ্চলকে নিয়ে?

আমি গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে একটু পরেই একদম ঘুমিয়ে গেলাম। চঞ্চলও ঘুমিয়ে পড়েছিলো আমার পাশেই শুয়ে খানিক পরে। কিন্তু কাকু ঠায় জেগে বসে ছিল। সকাল হয়ে যাবার পরে আমার ঘুম ভাঙতে উঠে দেখি তক্ষণে আমরা কাশীর গঙ্গার ব্রিজ পার হয়ে এসেছি।

তার মানে বাড়ি তো এসেই গেছে। আর কি?

ছবিঃ শিমুল সরকার

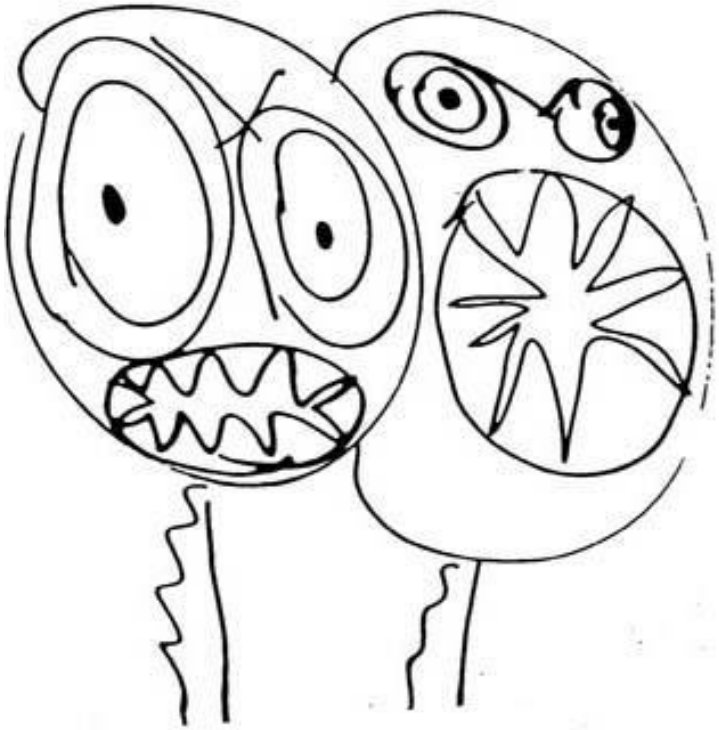

ভূতায়ন@ভয়মেলডটকম

রতনতনু ঘাটী

ভূতদাদু বাড়িতে এলে পড়াশোনায় ছুটি। ভূতদাদু কিন্তু ভূত নন, মানুষ। গা ছমছমে ভূতের গল্প বলেন, তাই ওরকম নাম। শুধু আমরাই নয়, ভূতদাদুর গল্প শুনতে মাঝে মাঝে মা-কাকিমারাও এসে গোল হয়ে বসেন।

ভূতের গল্প শুনে আমরা কেউ যে বিশেষ ভয় পাই তা নয়। তা হলে ভূতের গল্প শুনি কেন? তার একটাই কারণ, শাওন একটা খাতা করেছে। ও আমার পিসির ছেলে, আমাদের বাড়িতেই থাকে। ও খাতাটার নাম দিয়েছে ভূতায়ন। সেই খাতায় ভূতের নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করার কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা।

কী কী রাখা হবে সেই খাতায়? সে নিয়ে আমরা ভাইবোনেরা তিন- তিনবার মিটিং- ও করেছি। সবশেষে আমরা একমত হয়েছি যে ভূত নিয়ে যে সব তথ্য এখনও কেউ জানে না, সেই সব তথ্যই এখানে রাখা হবে। অনেক তথ্য জোগাড় হয়ে গেলে ছোটোকাকুর সুপারিশে ওঁর প্রকাশক বন্ধুর প্রকাশনী থেকে ভূতায়নের প্রথম খন্ড বের করা যেতে পারে। তবে সেসব আমরা বড়ো হলে তারপর!

এরকম একটা খাতা তৈরির আইডিয়াটা প্রথম মাথায় আসে ছোটোকাকুর ছেলে ঝিলমের। শাওন একাই যে সব তথ্য জোগাড়, করে তা নয়। আমরাও হাত লাগাই। যে যেখানে ভূত নিয়ে যেমন তথ্য পাই, সব এনে সেই খাতায় লিখে ফেলি।

ভূতের গল্প বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তাই ভূত দাদুকে থেমে যেতে হয়। সেজোকাকুর মেয়ে নোলক জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ভূতদাদু, বলো তো, ভূত কি মানুষকে কামড়ায়?"

দাদু বললেন, "কামড়ায় বইকি! সেবার তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামের মাধাই সামন্তের ছোটো ছেলেকে....."

আমরা কেউ আর মাধাই সামন্তের গল্পের মধ্যে ঢুকলামই না। সঙ্গে সঙ্গে ভূতায়নের পাতায় নোট নিয়ে নিলাম, "ভূত মানুষকে কামড়ায়।"

গতকাল দাদু যখন সন্ধেবেলা একটা ভূতের গল্প বলছিলেন, "একদিন এক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে একটা ভূত ঢুকেছিল..."

অমনি দাদুকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "দাদু, ভূত কি চাইনিজ খেতে ভালোবাসে, না মোগলাই?"

ভূতদাদু বললেন, "ভূতের বেশি পছন্দ চাইনিজ। পিয়াল, তোকে বলি, আমার নিজের চোখে দেখা। সেবার ধর্মতলার একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ....."

ব্যস, আমরা আর কেউ ভূতের গল্পের মধ্যে মনই দিলাম না। ভূতায়নের পাতায় চটপট লিখে নিলাম, "ভূত চাইনিজ খেতে ভালোবাসে।"

বছরে একবার করে সপরিবার আমাদের বেড়াতে যাওয়া হয়। জায়গার নামটা ঠিক করা হয় লটারির মাধ্যমে। বাড়ির সব সদস্যেরই ভোটদান বাধ্যতামূলক, বাবার কড়া নির্দেশ। ভোটদানে আমাদের মতো ছোটোদেরও সমান অধিকার। ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোয় যে যার পছন্দের জায়গার নাম লিখে ভরে দেবে বাবার সামনের প্লাস্টিকের কৌটোয়। বাবা বাড়ির সবচেয়ে খুদে সদস্যের হাতে তুলে দেন লটারির অধিকার। এবারও তাই হলো। ঝিলম বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ও যে কাগজটা তুলবে, তাতে যে জায়গার নাম লেখা থাকবে, সেখানেই বেড়াতে যাওয়া হবে।

সেবার লটারিতে উঠল দিঘার নাম। আমরা কেউ চেয়েছিলাম লোলেগাঁও, কেউ অযোধ্যা পাহাড়, কেউ ভালকিমাচান। কিন্তু কে যে মাঝখান দিয়ে দিঘার নামটা লিখে দিল! কিন্তু এতো আর নড়চড় হওয়ার নয়।

একটা মিনিবাসের মতো গাড়ি ভাড়া করে দিঘায় বাবার অফিসের বাংলোয় গিয়ে পৌঁছতে এগারোটা বাজল।

সন্ধেবেলা বাংলোর কেয়ারটেকার হরিবংশীদাদু ভূতের গল্প বলতে শুরু করলেন, "দিঘার ঝাউবনের ভূত, অন্য সব ভূতের চেয়ে দেখতে একদম আলাদা। তার পাঁচটা চোখ। দুপাশে দুটো, সামনে পিছনে, মাথার উপরে....."

তক্ষুণি মেজোকাকুর মেয়ে মেঘলা জিজ্ঞেস করে বসল, "ও দাদু, ভূত কী সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারে?"

হরিবংশী দাদু চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললেন, "তা পারে না বটে! তবে জলের উপর দিয়ে..."

আমরা আর দিঘার ভূতের গল্পে নেই। পাঁচজনেই ভূতায়নের পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে নোট করলাম, "ভূত সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারে না।"

এ পর্যন্ত ভূতায়নের পাতায় যে সব তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি এর বেশির ভাগটাই ভূতদাদুর মুখ থেকে শোনা ভূতের গল্প থেকে সংগ্রহ করা। এবার তার একটা তালিকা তুলে দিচ্ছিঃ

- ভূত বিখ্যাত মানুষদের অটোগ্রাফ পেলে জমায়।
- ক্রিকেট মাঠে ভূত থাকে গ্যালারির নিচে।
- মানুষ তো বটে, সব প্রাণীই মরলে ভূত হয়।
- ভূতের বয়স বাড়ে না।
- প্ল্যানচেটে ডাকলে ভূত রাগ করে।
- মেট্রো রেলের ভেস্টিবিউলে ভূত থাকে।
- ভূত ছোটোদের হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেয়।

অনেকদিন ধরে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা ভূতের তথ্য আমরা এভাবে কেন সকলের সামনে তুলে ধরলাম? এর কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের বয়সী ছোটোরা যারা ভূতের ভয় পায়, তারা এরপর থেকে সতর্ক হতে পারবে। আর আমাদের মতো যাদের ভূতের নানারকম তথ্য জোগাড় করার বাতিক আছে, তাদের সংগ্রহে এর বাইরে কিছু তথ্য থাকলে যেন আমাদের মেলে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের মেল আইডি হলোঃ ভূতায়ন@ভয়মেলডটকম।

তরুণকুমার সরখেল

সত্যবাবু ভালোমানুষ

সত্যসাধনবাবু একজন নিপাট ভদ্রলোক ও অত্যন্ত গোবেচারা মানুষ। তিনি নিজে কোন সাতে- পাঁচে থাকেন না। তবে ভালো মানুষ হওয়ার অনেক ফ্যাসাদ। ভালো লোকের ভালোমানুষীর সুযোগ নিতে চায় সকলেই। সত্যসাধনবাবু বেশ বুঝতে পারেন যে সকলেই তাঁকে ঠকাতে চায়। কিন্তু সব জেনেশুনেও তিনি ঠকে যান।

নিত্যসাধন ও সত্যসাধন যমজ ভাই। ছোটবেলা থেকেই দুজনের চেহারায় মিল থাকলেও দুজনের স্বভাবে বিস্তর ফারাক ছিল। নিত্য ছিল ভীষণ ডানপিটে আর লড়াকু। বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারিতে সে ছিল এক নম্বরে। আর সত্য ছিল যেমন শান্ত তেমনি ঠান্ডা স্বভাবের। বড় হয়েও তার সেই মিনমিনে স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি।

সত্যসাধনবাবু সহকারী শিক্ষকের চাকরি পেয়ে শহরে এসে চোখে অন্ধকার দেখলেন। এখানে কোথায় থাকবেন, কোথায় খাবেন তার ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একজন সহকর্মীর চেষ্টায় তিনি শহরের শেষপ্রান্তে একটা ঘর ভাড়ায় পেলেন। কাছেই খাঁদুদার হোটেল। সেখানেই সকাল-সন্ধ্যা দু- বেলা খাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

সত্যবাবু ভূগোলের শিক্ষক। ভূগোলের ক্লাসে ছেলেদের একেবারেই মন বসে না। সত্যবাবুকে ক্লাসে ছেলেরা ভয়ও পায়না একদম। পড়ানোর সময় সবাই এত গোলমাল করে যে কেউই পড়া শুনতে পায়না। সত্যবাবু বেশ চেঁচিয়েই পড়ানোর চেষ্টা করেন কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়না। ছেলেরা গোলমাল করতেই থাকে। সামনের গুটিকয় ছাত্র সত্যবাবুর পড়া শুনতে পায়। পেছনের ছাত্ররা তখন হয় কেউ কেউ ঘুমোয় নয়তো কাগজের বল তৈরি করে এর ওর গায়ে ছুঁড়ে মারে। হেডস্যার যতীনবাবু ক্লাস চলাকালীন মাঝেমধ্যেই ক্লাসের পিছন দিকে চুপিচুপি ঢুকে পড়েন। তাঁকে দেখে ছাত্ররা নিমেষেই তথাগত বুদ্ধের মত হয়ে যায়। এইমাত্র যে ছেলেটি খাতার পাতা ছিঁড়ে রকেট বানিয়ে ক্লাসে উড়িয়ে দিল সে হেডস্যারকে দেখে এমনভাবে সত্যস্যারের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল যেন মনে হবে সে একজন অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র। যে ছেলেরা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি

যতীনবাবু তাদের এক একটি প্রমান সাইজের গাঁট্টা মেরে উঠিয়ে দেন। ছাত্ররা এই ধরনের গাঁট্টা খুব চেনে। যতীনবাবুর গাঁট্টা যে একবার খায় সে ভোলে না। সত্যবাবু হঠাৎ পিন ড্রপ সাইলেন্স হয়ে গেল কেন বুঝতে পারেন না। তিনি পিছনে তাকিয়ে যতীনবাবুকে দেখে লজ্জায় পড়ে যান। যতীনবাবু এর আগেও দুবার তাঁর ক্লাসে ঢুকে পড়েছিলেন। আসলে সত্যস্যারের ক্লাসে এত গোলমাল হয় যে সেটা অফিসঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন যতীনবাবু সব কাজ ফেলে সত্যবাবুর ভূগোলের ক্লাসে চলে আসেন।

অফিস ঘরে বসে যতীনবাবু সত্যসাধনবাবুকে ডেকে পাঠান। তারপর বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে বলেন, "কি সত্যবাবু আপনি ছেলেগুলোকে ধমক টমকও তো লাগাতে পারেন! কই আর কারো ক্লাসে তো এত চিৎকার শোনা যায়না। শুনুন, ক্লাস নেওয়া মানে কিন্তু চেয়ারে বসে থেকে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে গড় গড় করে পড়া বলে যাওয়া নয়। আপনি পুরো ক্লাস পায়চারি করবেন। দরকার হলে লাস্ট বেঞ্চে যে ছেলেটি বসে রয়েছে তার পাশে বসে পড়াবেন। বুঝলেন?" সত্যবাবু বুঝলেন ঠিকই, কিন্তু ছাত্ররা বুঝলে তবে তো। তিনি তাদের কিছুতেই বাগে আনতে পারেন না।

আজ সত্যবাবু বেশ দরদ দিয়েই ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন এমন সময় টিফিনের ঘন্টা বেজে উঠল। তাঁর পড়ানোটা শেষ হতে না হতেই ছেলেরা সব চোঁ- চাঁ করে বাইরে বেরিয়ে গেল। সত্যবাবু ধীরে ধীরে টিচার্সরুমে ফিরে এলেন। জহরবাবু ইতিহাসের শিক্ষক। নাকের ডগায় চশমা পরেন। নাদুস- নুদুস চেহারা। সবসময় মজা করতে ভালবাসেন। সত্যবাবু টিচার্সরুমে তাঁর পাশেই বসেন। জহরবাবু বললেন, "ভূগোল মানেই গোল আর এই গোল থেকেই যত গন্ডগোল। এই দেখুন না আমার ভুঁড়িটা দিন দিন কেমন গোল হয়ে উঠেছে! ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়াটাও গোলমেলে ব্যাপার। কি বলেন সত্যবাবু?"

এ কথায় অন্যান্য শিক্ষকরাও হেসে উঠলেন। অবশ্য সত্যবাবু এ হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না কারণ জহরবাবু ঠিক কী বলতে চাইলেন সেটাই তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়।

সন্ধায় বাড়ি ফিরে একটু জিরিয়ে নিয়ে টিভি খুলে বসতে না বসতেই বাড়ির মালিক মন্ডলবাবু দোতলা থেকে নিচে নেমে এলেন। "কি সত্যবাবু ফ্রি আছেন নাকি? নবীনকে তাহলে পাঠিয়ে দিই।" সত্যবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন, "হ্যাঁ পাঠান।"

এই হয়েছে আরেক জ্বালা। মন্ডলবাবুর ছেলেকে ভূগোলটা বিনিপয়সায় ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। সারাদিন স্কুল করে এসে এই সময়টা তিনি টিভি দেখে বা বই পড়ে কাটাতে চান। কিন্তু তা হবার নয়। বাড়ির মালিক এক কাপ চা পাঠিয়ে দিয়ে নবীনকে তাঁর কাছে রেখে যান। ভালোমানুষ সত্যবাবু খাঁদুর হোটেলে খেতে যাবার আগে পর্যন্ত নবীনের মগজে ভূগোলের পেরেক ঢোকাতে ব্যস্ত থাকেন।

প্রত্যেক পাড়ার মোড়েই কিছু বখাটে ছেলের আড্ডা থাকে। সত্যবাবু এই পাড়াতে এসেই ছেলেগুলোকে লক্ষ্ করেছেন। প্রথম প্রথম তারা সত্যবাবুকে কিছু বলত না। কিন্তু দু- একদিন পরেই তিনি শুনতে পেলেন পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "ভূগোলবাবু, পৃথিবীর ওজন কত?" আশ্চর্য কান্ড ! তিনি যে ভূগোল শিক্ষক এটা এরা জানল কী করে? নবীনের কাছে জেনেছে কি? খাঁদুর হোটেল ভাড়াবাড়ি থেকে হেঁটে দশ মিনিট। পাড়ার মোড় দিয়েই যেতে হয়। পাঁচ- সাতজন ছেলে এই সময়টা রোজ বসে থাকে। মোড়ের মাথায় আগে একটা স্ট্রিটলাইট ছিল। এখন তা নষ্ট হয়ে গিয়ে জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে। সেই অন্ধকার রাস্তায় সত্যবাবু হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও বখাটে ছেলেগুলো তাঁকে ঠিক চিনতে পারল। কীভাবে যেন এখন ছেলেগুলো তাঁর

নামটাও জেনে গেছে। ছেলেগুলো সুর করে বলতে লাগল, "সত্যবাবু মিথ্যে বলেন, নিজেই নিজের কানটি মলেন।" সত্যবাবু কোন রকমে ছেলেগুলোর নাগালের বাইরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

খাঁদুর হোটেলে এসে কাঠের বেঞ্চিতে বসতেই খাঁদুর অর্ডার হয়ে গেল, "বাবুকে জল দে।" কাজের ছেলে ফটিক খাবার টেবিলে ঠকাং করে এক গ্লাস জল রেখে গেল। সকাল- সন্ধে দু'বেলা এই খাঁদুর হোটেলের খাবার খেয়ে খেয়ে সত্যবাবুর জিভে চরা পড়ে গেছে। থোড়- বড়ি- খারা আর খারা- বড়ি- থোড় খেয়ে খেয়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। রুটি সহযোগে তরকারি খেতে গিয়েই তিনি বুঝলেন দিনের বাসি তরকারিটাই গরম করে খেতে দেওয়া হয়েছে। যতই গরম করুক সবজিটা থেকে হালকা টক টক গন্ধ ছাড়ছে এটা সত্যবাবু ঠিক ধরে ফেললেন। তবে তিনি মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করলেন না। পাশে আরো দু- একজন ঐ সবজিটাই অম্লানবদনে খেয়ে নিল দেখে তিনি একটু খাবার খেয়েই উঠে পড়লেন।

খাঁদুর হোটেল থেকে বেরিয়ে সত্যবাবু একটু জোরেই পা চালাতে লাগলেন। বখাটে ছেলেগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিত্যবাবু। তিনি সত্যবাবুর অপেক্ষাতেই ছিলেন। এরপর দুজন মিলে গল্প করতে করতে ভাড়াবাড়িতে এসে ঢুকলেন।

নিত্যবাবু বললেন, "বাড়িটা তো বাসস্ট্যান্ড থেকে একটু দূরে। কাছাকাছি ভাড়াবাড়ি পাওয়া গেলনা?" সত্যবাবু বললেন, "এ দিকটা বেশ নির্জন। গ্রাম্য ভাব আছে। তাই এদিকটাই পছন্দ হয়ে গেল, তাছাড়া ভাড়াবাড়ি খোঁজাও তো একটা ঝক্কি।" নিত্যবাবু বললেন, "শোন কাল ভোরবেলার বাস ধরে তুই গ্রামে চলে যা। জ্যাঠামশাই কি সব কাগজপত্র তোকে দিয়ে সই- সাবুদ করাবে। আমাকে কালকের দিনটা শহরেই কাটাতে হবে। ফিরব পরশু সকালে। অসুবিধা নেই তো?"

সত্যবাবু বললেন, "একটা অসুবিধে অবশ্য আছে, হঠাৎ না জানিয়ে স্কুল কামাই করলে যতীনবাবু আবার রেগে যান।" নিত্যবাবু বললেন, "না জানিয়ে কেন? আমি নিজে গিয়ে তোর সিএল- এর দরখাস্ত জমা দিয়ে আসব। স্কুল এখান থেকে আর কত দূর! আমার কাজগুলো না হয় স্কুল থেকে ফিরে এসেই করে নেব।"

কথামত ভোরবেলাতেই সত্যবাবু বেরিয়ে পড়লেন। নিত্যবাবু উঠলেন আরো একটু পরে। দাড়ি কেটে স্নান সেরে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলেন। সত্যবাবুর সিএল এর দরখাস্তটা পকেটে ঢুকিয়ে মোড়ের মাথায় এলেন। একটা রিকশায় চেপে বাসস্ট্যান্ডে এসে বাস ধরে সোজা স্কুলে পৌঁছে গেলেন। প্রেয়ার শেষ করে ছাত্ররা তখন ক্লাসে ঢুকে পড়েছে। শিক্ষকরাও রোল কলের খাতা ও চক- ডাস্টার হাতে নিয়ে যে যার ক্লাসে ঢুকে যাচ্ছে। নিত্যবাবু অফিস ঘরের দিকে যাবেন ঠিক তখনই হেডস্যার যতীনবাবু অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিত্যবাবুর কাছে চলে এলেন। নিত্যবাবুর হাতে চক ডাস্টার আর রোল কলের খাতাটা ধরিয়ে বললেন, "সোজা ক্লাসে চলে যান। ফিরে এসে অ্যাটেনডেন্সে সই করবেন। না হলে ছেলেগুলো চেঁচিয়ে গন্ডগোল করবে। আপনার দেরি দেখে আমিই সেভেন বি- তে যাচ্ছিলাম। প্রথমের ক্লাসটা মিস যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। যান যান।"

নিত্যবাবু পকেট থেকে সত্যবাবুর দরখাস্তটা বের করতে যাচ্ছিলেন তার আগেই যতীনবাবু চক- ডষ্টার হাতে গুঁজে দিয়ে অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন। কী আর করা যায়! সেভেন বি- এর ছেলেরা মহা গোলমাল শুরু করেছে। ক্লাসের বাইরে তখনও দু- একজন ঘোরাফেরা করছিল। নিত্যবাবু দরজার সামনে এসে দেখলেন দরজার গায়ে লেখা রয়েছে সেভেন- বি। তিনি চুপচাপ ক্লাসে ঢুকে পড়লেন। ধীরে ধীরে খাতা খুলে রোল- কল করতে লাগলেন। সামনের ছাত্ররা ইয়েস স্যার বলে শান্ত হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু পেছনদিকে গোলমাল চলতেই লাগল। নিত্যবাবু একটি ছাত্রর কাছে এসে ভূগোলের বইটি নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন সত্যটা কতদূর পড়িয়েছে কে জানে। আজ তিনি পুরনো পড়া থেকে দু- একটি করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সময়টা কাটিয়ে দেবেন। সত্যর ছাত্ররা সত্যকে ভয় পায়না মনে হচ্ছে। তিনি প্রথম দিকের আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির চ্যাপ্টারটা খুলে একবার চোখ চালিয়ে নিলেন। তারপর ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটু গলা- খাঁকারি দিলেন। তবে এতেও ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষিত হলনা। উপরন্তু পেছন দিকের হৈ- হট্টগোলটা বেড়েই চলল। নিত্যবাবু বই থেকে চোখ তুলে পিছন দিকে চাইলেন। সেখানে ছাত্ররা কেউ বই খাতা বের করেনি। তার বদলে গল্প- গুজবে মেতে রয়েছে । নিত্যবাবু ছাত্রদের এরকম আচরণে বেশ অবাক হলেন। তিনি ধীর পায়ে পিছনের দিকে চলে এলেন। দুটি ছাত্র মারামারি শুরু করে দিয়েছে। নিত্যবাবু যে ছাত্র দুটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এটাও তারা বুঝতে পারল না। ছেলে দুটি এবার নিজেদের মধ্যেই কিল- চড়- ঘুষি চালাতে লাগল। একজনের ঠোঁট কেটে রক্তও বের হয়ে গেল। অপরজনের জামার তিনটি বোতাম পট পট করে ছিঁড়ে গেল। তবে হাতাহাতি বন্ধ হল না। নিত্যবাবুকে তোয়াক্কা না করেই পাশ থেকে দু- একটি ছেলে সাবাশ দিতে শুরু করল। নিত্যবাবু ভূগোলের ক্লাস মাথায় উঠল। তিনি তো আর সত্যবাবু নন যে বিশৃঙ্খলা সহ্য করবেন! রাগে তাঁর মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তিনি রক্তচোখে কয়েক সেকেন্ড ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন তারপর হাতের দুটি থাবায় ছাত্র দুটির চুল শক্ত করে ধরে বিশাল এক হুঙ্কার ছাড়লেন। সেই হুঙ্কার শুনে পুরো ক্লাস একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সকলের চোখ চলে গেল স্যারের এই রুদ্রমূর্তির দিকে। আজ কি হল সত্যস্যারের? তিনি তো ছাত্রদের গায়ে হাত তোলেন না! এমনকি জোরে বকা- ঝকাও করেন না কোনদিন। শুধু বলেন, "মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে কেউ বড় হতে পারবে না।

পড়ায় মন দাও"। ব্যাস এই পর্যন্তই। তা স্যারেরা তো এরকম উপদেশ দিতেই পারে, তা বলে ছাত্ররা কি সেই উপদেশে কান দেবে?বয়েই গেছে। কিন্তু আজ তো শুকনো উপদেশ নয়! একেবারে রুদ্রমূর্তি। ছেলেদুটি তখনো স্যারের মুঠোয় বন্দি। তাদের মাথার চুল যেন উপড়ে পড়বে। যন্ত্রণায় নাক চোখ কুঁচকে আছে। আর সেই দৃশ্য দেখে অন্য ছাত্ররা বিলকূল বোবা হয়ে গেছে। নিত্যবাবু আরো একবার হুঙ্কার ছাড়লেন। তাঁর সেই সিংহগর্জন পৌঁছে গেল টিচার্সরুম পর্যন্ত। যতীনবাবু সেই চিৎকার শুনে তড়িঘড়ি সেভেন বি- এ পৌঁছে দেখলেন সত্যবাবু দুটি ছেলের কান ধরে হিড় হিড় করে বাইরে নিয়ে আসছেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, "গেট আউট। আমার ক্লাশে এরকম বেয়াদপি যেন আর না হয়।" হেডস্যার দেখলেন ক্লাসের সব ছাত্র নিজের নিজের জায়গায় বসে বই খুলে রেখেছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। তিনি সত্যবাবুর পিঠে একটা চাপড় মেরে বললেন, "সাবাশ! এই তো চাই। স্পেয়ার দা রড অ্যান্ড স্পয়েল দি ষ্টুডেন্টস।" এই বলে তিনি চলে গেলেন। অবশ্য নিত্যবাবুও আর দাঁড়ালেন না। দু- এক মিনিট পরে তিনিও হন্ হন্ করে বেরিয়ে মেন গেটের দিকে চলে গেলেন। যে ছাত্র দুটি নিলডাউন দিয়েছিল তারা হাঁটু গেড়ে বসেই থাকল।

নিত্যবাবু বাসে উঠেই জানালার দিকে একটা সিট পেয়ে গেলেন। বাসের ঐ একটি সিটই খালি ছিল। তিনি একবার চোখ চালিয়ে দেখলেন বাসে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। যতগুলি সিট ততগুলি লোক। কখনো কখনো এরকমটি হয়ে যায়। শহরে ফিরে তিনি অনেকগুলি কাজ সারলেন। তারপর সন্ধ্যে নাগাদ সত্যর ভাড়াবাড়িতে ফিরলেন। সারাদিন বেশ পরিশ্রম হয়েছে। এরপর শুয়েবসে একটু বিশ্রাম দরকার। পাঁচ মিনিট পরেই নবীন এসে হাজির। পেছনে মন্ডলবাবু। হাতে তাঁর চায়ের কাপ। নিত্যবাবু চা একদম পছন্দ করেন না। চা দেখলেই তাঁর রাগ বেড়ে যায়। তিনি লেবু মেশানো শরবত ভালবাসেন। মন্ডলবাবু বললেন, "আপনার চা এনেছি। ওরে নবীন, মাস্টারমশাইয়ের হাতে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দে।" নিত্যবাবু বললেন, "আমি চা খাই না। ওটা নিয়ে যান।" মন্ডলবাবু বললেন, "সে কি মশাই? চা তো আপনি রোজই খান। আজ খেতে ইচ্ছে না করলে খাবেন না, জোর করব না।" ইতিমধ্যে নবীন বইপত্র নিয়ে নিত্যবাবুর খাটে উঠে পড়েছে দেখে নিত্যবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। "আজকে পড়ানো টড়ানো হবে না। আমি ভীষণ টায়ার্ড।"মন্ডলবাবু সে কথা শুনে বললেন, "ঠিক আছে আধঘন্টা বাদেই না হয় নবীনকে ছেড়ে দেবেন।"

তাঁর কথা শেষ না হতেই নিত্যবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "দেখুন আজ আমি এক মিনিটের জন্যও কাউকে পড়াবো না, বুঝেছেন? নাকি আরো সোজা করে বলতে হবে?" মনে মনে ভাবলেন, সত্যটা কি সব আপদ জুটিয়ে রাখে! কোন মানে হয়? এসব আপদ ঘাড় থেকে না ঝেড়ে ফেললে ঘাড়েই শক্ত করে চেপে বসে। সত্যবাবুর এই অচেনা ছবিটার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন মন্ডলবাবু। তিনি আর কোন কথা না বাড়িয়ে নবীনকে নিয়ে ছাদে উঠে গেলেন।

গলির মোড়ে যেখানে পাঁচ- সাত জন আড্ডা দিতে বসে আজকে তাদের দল ভারী। সবাই একসঙ্গে জুটেছে। অনেকক্ষন ধরেই হইহল্লা চলছে। পাশেই একটা পানের দোকান। সেখানে চানাচুর- কেক–চকোলেট সবই পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যেই সেখান থেকে খাবার আসছে। পাঁচু বলে একটা ছেলে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে ভূগোলবাবু আসছে রে"। আলো- আঁধারি রাস্তায় কে আসছে যাচ্ছে ছেলেগুলো ঠিক বুঝতে পারে। নিত্যবাবু অনেকটা কাছে এসে গেছেন। তিনি চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মাঝরাস্তায় পাঁচু নিত্যবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, "স্যার পৃথিবীর ওজন কত সেটা এখনও জানালেন না কিন্তু। এ কী রে? ভূগোলবাবু খাঁদুর হোটেলে খেয়ে

দিন দিন কেমন তাগড়া হয়ে যাচ্ছে রে! আগে তো ফড়িং এর মত ছিলেন।" এরপর পাঁচু হাততালি দিয়ে হেঁড়ে গলায় গান শুরু করল, "সত্যবাবু মিথ্যে বলেন..."

এই সত্যবাবু নামটা কানে যেতেই নিত্যবাবু এক নিমেষে কেসটা ধরে ফেললেন। এটা কি অপারেশন নাম্বার থ্রি? তিনি মুখে একটা কথাও বললেন না। কিন্তু বাচ্চা ছেলের মত ল্যাং মেরে পাঁচু নামের ছেলেটিকে মাটিতে ফেলে দিলেন। পাঁচু মাটিতে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেল। তাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে দু-জন দৌড়ে কাছে চলে এল। নিত্যবাবু দু-জনকেই বিরাশি সিক্কার চড় কষালেন। সত্যবাবুর পেল্লাই চড়গুলো যে মোটেই মিথ্যে নয় এটা যখন তারা বুঝতে পারল তখন আর কেউ ট্যাঁ-ফোঁ করল না। এতবড় একটা অপারেশন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এটা নিত্যবাবু ভাবতেও পারেন নি। ছেলেগুলোকে তিনি একটা কথাও বলেননি। শুধু একটা হাত ও পায়ের খেল দেখিয়েছেন মাত্র। তিনি কয়েক পলক ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন যে এরা আর সত্যকে ঘাঁটাবে না। সত্যটাও হয়েছে তেমনি। কোন কিছুর প্রতিবাদ করা তার ধাতে নেই। আরে বাবা কামড়ানোর কি প্রয়োজন, ফোঁসটাতো করতে পারিস। ফোঁস করলেই তো কাজ হাসিল হয়ে যায়!

যাইহোক আর আশা করি কোন নতুন উপদ্রবের উদয় হবে না । ছেলেগুলোকে পিটিয়ে তিনি অনেকটা চাঙ্গা বোধ করলেন। ক্ষিদেটাও চনমনে হয়েছে। খাঁদুর হোটেলে গিয়ে বেঞ্চিতে বসতে না বসতেই ফটিক নামের ছেলেটি ঠকাং করে এক গ্লাস জল দিয়ে গেল। দোকানের মাঝখানে একটা বাল্ব ঝুলছে। তার আলোতে নিত্যবাবু দেখলেন গ্লাসের জলে কিছু একটা ভাসছে। তিনি ছেলেটিকে ডেকে জলটা পাল্টে দিতে বললেন। ছেলেটি আরো এক গ্লাস জল দিয়ে গেল। নিত্যবাবু গ্লাস থেকে এক চুমুক জল খেতে গিয়েই মাছের আঁশটে গন্ধ পেলেন। তিনি জলটা পাশে রেখে হাফপ্লেট তড়কা ও রুটির অর্ডার দিলেন। খাঁদুবাবু কাকে যেন ডাক পাড়লেন, "হাফ-তড়কা রুটি।" তারপর বললেন, "সত্যবাবু আজ অনেক তাড়াতাড়ি এলেন যে?" নিত্যবাবু সে কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি খাবার টেবিলের পাশে রাখা খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন। পনেরো কুড়ি মিনিট কেটে গেল তবু রুটি তড়কা পাতে পড়ল না। নিত্যবাবু গলা চড়ালেন, "বলি খাবার কি আসবে না উঠব?" খাঁদুবাবু বলল, "আরে মশাই ব্যাস্ত হচ্ছেন কেন? ভালো খাবার পেতে গেলে একটু ধৈর্য ধরে বসতেই হবে। এই তো সবে রুটি বেলা শেষ হয়েছে। এবার উনুনে সেঁকে পরিবেশন করতে যা বাকি। ফটিক, বাবুকে কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ দে।" নিত্যবাবু খবরের কাগজ এক পাশে সরিয়ে বেসিন থেকে হাত ধুয়ে এলেন। আরো তিনজন খদ্দের খাবার টেবিলে এসে বসল। তাদের একজন নিত্যবাবুকে দেখে ঘাড় নাড়ল। নিত্যবাবুও ঘাড় নাড়লেন। ফটিক নিত্যবাবুর থালায় গরম রুটি আর বাটিতে করে তড়কা দিয়ে গেল। তা দেখে পাশের তিনজন খদ্দেরই রুটি তড়কার অর্ডার দিল।

নিত্যবাবু একটুকরো রুটি ছিঁড়ে তড়কা সহযোগে মুখে দিয়েই থেমে গেলেন। তড়কা একেবারে টকে গেছে। নির্ঘাৎ এটা সকালের খাবার। তিনি তড়কার বাটিটা একটু জোরেই ঠেলা মারলেন। বাটিটা ঠকাং করে মেঝেতে পড়ল তারপর তড়কাটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল নিচে। খাঁদুবাবু ক্যাশবাক্স থেকে খুচরো পয়সা বের করছিলেন। তিনি সত্যবাবুর এহেন আচরণ দেখে বিস্মিত হলেন। একটু চেঁচিয়েই বলে উঠলেন, "এটা একটা দোকান। আপনার ঘর পেয়েছেন কি, যে ইচ্ছে হল আর অমনি সবজির বাটি ছুঁড়ে দিলেন?" বাকি খদ্দেররাও নিজেদের মধ্যে কথা থামিয়ে নিত্যবাবুকে দেখতে লাগলেন। নিত্যবাবু বললেন, "সকালের খাবার রাতে খাওয়াচ্ছেন, এর মানেটা কি? আমরা কি গরু নাকি?" খাঁদুবাবু ক্যাশবাক্সের ঢাকা ঝপাং করে বন্ধ করে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন,

“একদম বাজে কথা বলবেন না। কী মনে করেছেন কী? আমার খদ্দের ভাঙাবেন? খাঁদু দত্তকে ভড়কি দেওয়া অত সহজ নয়। আপনার মতন অনেক খরিদ্দার আমার দেখা আছে। ঠিক সেই সময় ফটিক থালায় রুটি আর তড়কা নিয়ে এসে বাকি খদ্দেরদের টেবিলে রাখল। নিত্যবাবু তাঁদের কাছে এসে বললেন, “নিন একটু মুখে দিয়ে দেখুন খাবার টকে গেছে কি না। লোকগুলো প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, “হ্যাঁ একদম ঠিক কথা। এ খাবার মুখে দেয়া যায় না।” তারাও তড়কার প্লেট একদিকে সরিয়ে হাত গুটিয়ে নিল। খাঁদুবাবু এবার বেশ চুপসে গেলেন। এতক্ষন তিনি বেশ হম্বি- তম্বি করছিলেন। এবার নিচু স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বললেন, “বাবুদের কী খাবার দিয়েছিস? আমার বদনাম করে দিলি যে!” তারপর তিনি নিত্যবাবুর কাছে এসে নরম স্বরে বললেন, “কিছু মনে করবেন না স্যার। কাজের ছেলেগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না। আপনি বসুন।” কিন্তু নিত্যবাবু আর বসলেন না। এই তো সবে আটটা বাজে। আরেকটু হেঁটে গেলেই তো বাজার পৌঁছে যাবেন। তিনি উঠে বেসিনে হাত ধুয়ে বের হয়ে গেলেন। খাঁদুবাবু পেছন থেকে ডাকছেন, “বলি ও সত্যবাবু, রাগ করলেন নাকি?”

সত্যবাবু লোকটি যেমন তেমনি আছেন। কথায় বলে স্বভাব যায় না ধুলে। তিনি যেমন ভালোমানুষটি ছিলেন তেমনই রইলেন। তবে নিত্য তাঁকে বলে গেছেন এরপর থেকে তিনি যেন একটু আধটু ফোঁস –ফাঁস করেন। তা না হলে সকলেই ঘাড়ে চেপে বসবে।

ঠিক দশটার সময় টিচার্স রুমে পৌঁছতেই যতীনবাবু এক গাল হেসে বললেন, “ঠিক করেছেন। আপনি একদম ঠিক কাজ করেছেন। ছেলেগুলো দিনকে দিন বাঁদর হয়ে উঠছে। ওদের বাঁদরামো ওভাবেই ঠেকাতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তা আপনি কাল ওভাবে চলে গেলেন কেন?” সত্যবাবু কোন জবাব দিলেন না। শুধু মুচকি মুচকি হেসে অ্যাটেনডেন্সের খাতায় দুটো সই করলেন। একটা গতকালের আর একটা আজকের। ক্লাসে ঢুকেই তিনি টের পেলেন ছেলেরা তাঁকে ভয় ও ভক্তির চোখে দেখেছে। তিনি গম্ভীরভাবে পড়ানো শুরু করে দিলেন। তাজ্জব ব্যাপার, পেছন দিকের বদমাশ গোছের ছেলেগুলোও ভালো ছেলেদের মত বই খুলে বসেছে। কোথাও গোলমাল নেই।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সত্যবাবু টিভি খুলে বসলেন। আজ নবীন পড়তে আসেনি। মন্ডলবাবুও চা পাঠান নি। এতে সত্যবাবু খুশিই হলেন। সন্ধ্যেটা নিজের মতো করে কাটানো যাবে। তিনি সাড়ে আটটা পর্যন্ত টিভি দেখে ও গল্পের বই পড়ে কাটালেন। তারপর রাতের খাবার খেতে বেরিয়ে পড়লেন। মোড়ের মাথায় যে ছেলেরা বসে আড্ডা দিচ্ছিল তারা সত্যবাবুকে দেখে কথা থামিয়ে দিল। সত্যবাবু ধীরেসুস্থে হেঁটে মোড়ের রাস্তাটা পেরিয়ে গেলেন। ছেলেগুলোর কাছ থেকে কোন সাড়া পেলেন না। ওদের এরকম ভদ্র হয়ে যাবার পেছনে কি রহস্য আছে কে জানে।

খাঁদুবাবু আজ বেশ আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। বার বার তিনি সত্যবাবুর খাবার টেবিলের কাছে এসে খাবার- পত্র ঠিক আছে কিনা জেনে নিলেন। সত্যবাবুকে একসময় ফাঁকা পেয়ে বললেন, “কাল সকালে আপনাকে নিজের হাতে সর্ষেবাটা ইলিশ রেঁধে খাওয়াবো। দেখবেন কেমন রান্না করি।” তিনি সত্যবাবুর হাতে মৌরি আর মিছরির দানা ঢেলে দিলেন।

সত্যবাবু মৌরি চিবোতে চিবোতে হাঁটতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, নিত্যটা সেরকমই থেকে গেল, ভালোমানুষ আর হতে পারল না!

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

শিশির বিশ্বাস

গল্পটা শুনেছিলাম ধূর্জটিবাবুর কাছে। সে সময় নাথের বাগানে এক এঁদো গলির ভেতর সারদাময়ী মেসের দোতলার এক ঘরে আমাদের 'শনিবারের সভা' বসত। নির্ভেজাল আড্ডার আসর। প্রতি শনিবার সন্ধেয় খোলা হত মেসের এই ঘরটি। বেয়ারা ব্রজ ঝাড়পোঁছ করে মেঝেয় মস্ত ফরাশটা পেতে দিত। একে একে হাজির হত সবাই। এর মধ্যেই ব্রজ গোটা কয়েক রেকাবিতে গরম তেলেভাজার সঙ্গে মুড়ি এনে হাজির করত। মাঝেমধ্যে অন্য খাবারও আসত। জমে উঠত আসর। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমরা যারা শনিবারের সভার শরিক, তাদের প্রায় সবাই কোনোও না কোনোও সময় এই সারদাময়ী মেসের আবাসিক ছিলাম। তবে ব্যতিক্রমও ছিলেন কয়েকজন। ধূর্জটিবাবু তাদেরই একজন। মাঝবয়সি ভদ্রলোক সরকারি দপ্তরের এক পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আচার আচরণেও সেটা প্রকাশ পেত। সাধারণত কথা বলতেন কম। তবে যখন বলতেন, চমৎকার বাচনভঙ্গিতে জমিয়ে ফেলতেন। সারাটা সময় হাতে থাকত একটা হাভানা চুরুট।

সেদিন, অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় আসর বসেছে। মহালয়ার ঠিক পরের দিন। উৎসবের আমেজ। তাছাড়া দিনকয়েক আবহাওয়া একটানা মেঘলা থাকার পর গত দুদিন হল বেশ পরিষ্কার। শনিবারের সভায় তাই সমাগম একটু বেশি। খাবারের আয়োজনও একটু স্পেশাল। মুড়ি তেলেভাজার সঙ্গে দেদার গরম জিলিপি। খুচখাচ রঙ্গরসিকতার ফাঁকে হাত চলছে সবার। এর মধ্যেই হঠাৎ ঝুপ করে লোডশেডিং। ব্রজ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই গোটা কয়েক মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেল। বলাবাহুল্য, অন্ধকার তাতে দূর হল সামান্যই। কলকাতায় লোডশেডিং তখন সবে শুরু হয়েছে। কে একজন বললেন, "এ তো দেখছি এক ভালো আপদ শুরু হল! যা শুনছি তাতে তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সহজে মিটবে না।"

ওদিক থেকে আর একজন বললেন, "তা না মিটুক, কিন্তু আজকের এই অন্ধকারের সন্ধেটা আমরা অন্যভাবে উপভোগ করতে পারি। আজকের আসরের বিষয়বস্তু হোক অলৌকিক ঘটনা। এই অন্ধকারে সেটা জমবে বেশ।"

মুহূর্তে হইহই করে উঠল সবাই। ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়ে গেল প্রস্তাব। ধূর্জটিবাবু নীরবে চুরুট টানছিলেন এতক্ষণ। প্রস্তাব শুনে একটু নড়ে উঠে স্বভাবসিদ্ধ ভরাট গলায়

বললেন, "কারও আপত্তি না থাকলে এ ব্যাপারে আমি একটা ঘটনার কথা বলতে পারি। অদ্ভুত হলেও আমি এর প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটেছিল আমার জীবনেই"।

লোডশেডিং –এর সন্ধ্যা। ঘরের ভিতর আলো –আঁধারির এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ! বিষয়বস্তুর পক্ষে একেবারে জমজমাট। তার উপর বক্তা ধূর্জটিবাবু। তিনি শুরু করলেন তাঁর কাহিনি।

"সে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। বয়স কম। কলেজ থেকে বের হয়ে সবে চাকরিতে ঢুকেছি। ছেলেবেলার সেই ডানপিটে স্বভাবটা তাই যায়নি। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলেই নেচে ওঠে মন। এই সময় একদিন অফিসে এসে হাজির বাল্যবন্ধু সোমনাথ। বলল, 'ধূর্জটি, মাস দেড়েকের ছুটি ম্যানেজ করতে পারবি? চল কেদারনাথ ঘুরে আসি। অবনীকেও বলেছি, ও রাজি হয়েছে।'

"সোমনাথ, অবনী আর আমি শুধু বাল্যবন্ধুই নই, এক সাথে স্কুলেও পড়েছি। তারপর কলেজে। সবসময় একসাথে থাকতাম। সবাই বলত তিন মূর্তি। কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি আর সোমনাথ চাকরিতে ঢুকলাম। অবনী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়তে গেল। যদিও চাকরির দরকারটা আমাদের থেকেও বেশি ছিল ওর। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। গ্রামে সামান্য জমিজমার উপর নির্ভর করে অবনীর মা খুব কষ্ট করেই ছেলের লেখাপড়া আর সংসার চালাতেন। লেখাপড়ার ওপর অবনীরও ঝোঁক ছিল। তাই চাকরির চেষ্টা না করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হতে আমরা আবাক হইনি। আসলে প্রাণের বন্ধু হলেও তিনজনের স্বভাব ঠিক একরকম ছিল না। আমি যতটাই ডানপিটে অবনী ছিল ততটাই ধীরস্থির। বিধবা মা'কে খুব ভক্তি করত। আর ছোটোবেলা থেকেই সোমনাথ ধার্মিক মানুষ। ঠাকুরদেবতার উপর অচলা ভক্তি। হঠাৎ কেদারনাথ যাওয়ার পরিকল্পনা ওই কারণেই।

"সে যাই হোক, আমি কিন্তু এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে। এ যে সময়ের কথা, কেদারনাথ ভ্রমণ তখন সহজ ব্যপার নয়। হৃষীকেশ থেকে পাহাড়ি গ্রাম আর বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটাপথ। ক্রমাগত চড়াই আর উতরাই। সোমনাথকে শুধু বললাম, 'অবনী যাবে বলছিস, ওর মা রাজি হয়েছেন? সব বলেছিস তাঁকে?'

"বিধবা মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে অত দূরে এমন অনিশ্চয়তার পথে পাঠাতে সহজে রাজি হবেন না বুঝেই বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু আমাকে আবাক করে দিয়ে সোমনাথ বলল, 'সেজন্য চিন্তা নেই, মাসিমার সম্মতি পাওয়া গেছে। ওঁকে কথা দিয়েছি অবনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেব ওঁর কাছে। অবনীরও খুব ইচ্ছে যাওয়ার তাই আর আপত্তি করেননি।'

"গোছগাছ করে তিন বন্ধু একদিন রওনা দিলাম। ট্রেনে হরিদ্বার। দিনদুই কাটালাম গঙ্গার ধারে এক ধর্মশালায়। তারপর একদিন হৃষীকেশ, লছমনঝোলা হয়ে এক তীর্থযাত্রী দলের সাথে ভিড়ে পড়লাম।

"উঁচুনিচু পাহাড়ি পথ চলেছে বনের ভিতর দিয়ে। মাঝেমধ্যে দু- একটা ছোট গ্রাম। তীর্থযাত্রীদের জন্য চটি। এক আধটা দোকানপাট। আমাদের খাওয়াদাওয়ার আর রাতের আশ্রয়। এছাড়া মাঝেমধ্যেই পার হতে হচ্ছে পাহাড়ি নদীর উপর দড়ির নড়বড়ে ঝুলন্ত সেতু। সে এক অভিজ্ঞতা! গোড়ায় দিনকয়েক একটু কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু পরে সহ্য হয়ে গেল ব্যাপারটা। এ এক অদ্ভুত জীবন। দিনভর পথ চলো। পথে কোনোও চটিতে দিনের খাওয়া আর বিশ্রাম সেরে নাও। সন্ধের পর পথচলা বারণ। তখন আশ্রয় নাও কোনও চটিতে।

"পথে প্রথমেই পড়ল দেবপ্রয়াগ। গঙ্গা এখানে অলকনন্দার সাথে মিলিত হয়ে বয়ে চলেছে দক্ষিণে সমতলভূমির দিকে। শাস্ত্র অনুসারে এই দেবপ্রয়াগই নাকি মর্তলোকের সীমানা। এর পরেই শুরু হল দেবলোক। দেবপ্রয়াগ তাই তীর্থযাত্রীদের কাছে পুণ্যস্থান। এখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা গারওয়ালের রাজধানী শ্রীনগর হয়ে পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগ। এখানে অলকনন্দার সাথে মিলিত হয়েছে মন্দাকিনী। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথের পথ গেছে এই মন্দাকিনীর পাশ দিয়ে। সেই পথ ধরে গুপ্তকাশী, শোনপ্রয়াগ হয়ে একদিন এসে পৌঁছলাম গৌরীকুন্ড। কেদারনাথ এখান থেকে মাত্র একদিনের পথ হলেও উচ্চতার পার্থক্য খুব বেশি। পার্থক্য তাপমাত্রারও। গৌরীকুন্ডে দিনের বেলা তেমন শীতবস্ত্রের দরকার হয় না। কিন্তু শোনা গেল, কেদারনাথে দিনেদুপুরেও নাকি মোটা কম্বল জড়িয়ে রাখতে হয়। এদিকে রাত্তিরের ঠান্ডা আর পথকষ্টে দলের অনেকেই তখন অল্পবিস্তর অসুস্থ। সবাই তাই ঠিক করল গৌরীকুন্ডে দিন দুই বিশ্রাম নেবে। আমরা তিন বন্ধু এ পর্যন্ত মোটামুটি সুস্থই রয়েছি। তাই ঠিক করলাম, অযথা দেরি করব না।

"অবনীর জ্বরটা এল সেই রাত্তিরেই। সাথে বুকে পিঠে ব্যথা। মাথায় সামান্য যন্ত্রণা। কিন্তু তেমন গ্রাহ্য করলাম না কেউ। অবনী নিজেও বলল, 'এই সামান্য জ্বরে এমন কিছু অসুবিধা হবে না। অল্পই তো পথ!'

"সুতরাং পরদিন ভোরে যথাসময় বেরিয়ে পড়লাম। গৌরীকুন্ড থেকে কেদারনাথের পথ প্রকৃতই বন্ধুর। ঘন ঘন চড়াই আর পাকদন্ডী। কিন্তু চারপাশের দৃশ্য অসাধারণ। সেই নয়নাভিরাম প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরালে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। পাশ দিয়ে ভীমগর্জনে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। দুধারে পাহাড়ের উপর থেকে ছোটবড় কত যে ঝরনা এসে মিশেছে তার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। পথের বাঁকে মাঝেমধ্যেই দৃষ্টিপথে ধরা দিচ্ছে দূরে বরফেমোড়া সকালের রোদে কাঁচা সোনার বরণ কেদারনাথ শৃঙ্গ। সে দৃশ্য পথের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। যাই হোক, একনাগাড়ে চড়াই পার হয়ে আমরা যখন কেদারনাথে পৌঁছলাম বেলা তখন প্রায় দুটো। আকাশে রোদের ছিটেফোঁটাও তখন অবশিষ্ট নেই। জোরালো হাওয়া বইছে। ঠান্ডা বরফ- শীতল হিমেল বাতাস। এই দুপুরেও ভিতরের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

"কেদারনাথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সত্যিই কোনোও তুলনা নেই। মন্দাকিনীর দুধারের খাড়া পাহাড় এখানে সরে গেছে আনেকটাই দূরে। মাঝে বেশ খানিকটা প্রায় সমতল। এরই শেষ প্রান্তে পাথরের তৈরি চমৎকার কেদারনাথ মন্দির। পেছনে পর্বতের চুড়ো থেকে নেমে আসছে মন্দাকিনী। গমগম শব্দে বয়ে চলেছে মন্দিরের পাশ দিয়ে। মন্দিরের ডানদিকে বিজয় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঝরনাধারার মতো নেমে আসছে দুধগঙ্গা। জল তার দুধসাদা। মিশেছে মন্দাকিনীর সঙ্গে। পাশেই খানিক দূরে ক্ষীরগঙ্গা। দূরে মন্দিরের পিছনে বরফে মোড়া বিশাল কেদারনাথ শৃঙ্গ। সব মিলিয়ে সে এক ছবির মত দৃশ্য। দু'চোখ ভরে দেখেও যেন আশ মেটে না।"

এই পর্যন্ত বলে ধূর্জটিবাবু থামলেন। মোমবাতির মৃদু আলোয় ঘরের ভিতর শ্রোতাদের মুখের উপর সামান্য দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "অলৌকিক গল্প শুনতে বসে আপনারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাই আর সময় নষ্ট করব না। মূল ঘটনায় আসি। কেদারনাথ মন্দিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিন সেসব দেখার মতো অবস্থা আমাদের সত্যিই ছিলো না। পথশ্রমের ক্লান্তি, তার উপর প্রচন্ড ঠান্ডায় অবনীর অবস্থা তখন

ভালো নয়। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শেষদিকে তো আর চলতেই পারছিল না। আমাদের দুজনকে প্রায় বয়ে আনতে হয়েছে। কেদারনাথে পৌঁছে তাড়াতাড়ি এক চটিতে এসে উঠলাম।

"সে'সময় তীর্থযাত্রীরা কেদারনাথ দর্শন করে দিনেদিনেই নেমে যেত গৌরিকুন্ডে। ভালো চটি কেদারনাথে তখন ছিল না। ছিল মাথা গোঁজার মতো সামান্য ব্যবস্থা। অসুস্থ অবনীকে তারই একটায় বিছানা পেতে গোটা কয়েক কম্বল চাপিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। অসুস্থ মানুষটিকে নিয়ে এরপর যে কী ভীষণ বিপদে পড়লাম তা বলে বোঝানো যাবে না। জ্বরটা বেড়েই চলল। সেই সাথে শ্বাসকষ্ট। ব্যপারটা যে নিউমোনিয়ার দিকে যাচ্ছে, লক্ষণ ভালো নয় বুঝতে বাকি রইল না। এই দুর্গম পান্ডববর্জিত স্থানে কী করব কেউ যখন বুঝে উঠতে পারছি না এমন সময় আমাদের চটিওয়ালা সুরজদেও বললেন, 'বাবুজি, একটা কথা বলব?'

"বৃদ্ধ সুরজদেও মন্দিরে পান্ডার কাজও করে। সামান্য আয়ের জন্য পড়ে আছে এই দুর্গম দেশে। চমৎকার মানুষ। এই বিপদে নিজেই এগিয়ে এসেছে অবনীর শুশ্রূষায়। যথাসাধ্য চেষ্ঠা করে চলেছে। আমরা সায় দিতে বললেন, 'বাবুজি আজ শুক্লা চতুর্দশী। প্রতি মাসের এই রাতে একজন সাধুপুরুষ এখানে আসেন। সারা রাত মন্দিরের চাতালে শুয়ে কাটিয়ে দেন। ফিরে যান ভোর হবার আগেই। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। সবাই বলেন উনি দিব্যপুরুষ। বয়সের গাছপাথর নেই। এদিন উনি এখানে আসেন উত্তরে কেদারনাথ পর্বত ডিঙিয়ে। কোথা থেকে কেউ জানে না। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আপনারা ওঁকে ধরুন। ওনার অসাধ্য কিছু নেই।'

"সাধুসন্ন্যাসীর ওপর সোমনাথের ভক্তি বরাবর। দিনকয়েক হিমালয়ের পথে ঘুরে এ ব্যাপারে আমার নিজেরও তখন কিছু দুর্বলতা এসে গেছে। তা ছাড়া প্রবল স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়া মানুষ সামান্য খড়কুটোও আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলাম। বৃদ্ধের কাছ থেকে সব খবর নিয়ে দু'জন এক সময় হাজির হলাম মন্দিরের পেছনে খানিক দূরে আপ্রশস্ত সমতলভূমিতে। সন্ধের অন্ধকার নামতে তখনও খানিক বাকি। আশপাশে জনপ্রানী কেউ নেই। আদূরে মন্দাকিনীর তিনটি ধারা মিলিত হয়ে শুধু ভীমগর্জনে বয়ে চলেছে। দূরে কেদারনাথ পর্বতের শিখর শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় ঝকমক করছে। কতক্ষন সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি, দূরে পাহাড়ের আড়াল থেকে এক জটাজূটধারী সাধু এদিকে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষটি অদূরে মন্দাকিনীর ওপারে এসে হাজির হলেন। ভস্মমাখা বিশাল শরীর। এই ভয়ানক শীতেও সারা শরীর প্রায় নগ্ন। কোমরে এক টুকরো কৌপীন মাত্র। গলায় মস্ত এক রুদ্রাক্ষর মালা। মাথায় বিশাল জটাজূট। দীর্ঘ শ্মশ্রু। আজানুলম্বিত বাহু। সন্ধ্যার আবছা আলোয় আমার মনে হল মানুষটির ভস্ম আচ্ছাদিত শরীর দিয়ে যেন এক দিব্য জ্যোতি ফুটে বের হচ্ছে। ভেবেছিলাম, খানিক এগিয়ে মন্দিরের সামনে দড়ির সাঁকোটা দিয়ে নদী পার হবেন কিন্তু হঠাৎ আমাদের সামনেই তিনি স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর জলে পা রাখলেন। অক্লেশে হেঁটে পার হয়ে এলেন নদী। গোড়ালির বেশি ডুবল না। অদ্ভুত ব্যাপার দেখে দুজনেই হতবাক। এই ভয়ানক স্রোতস্বিনী নদী এভাবে পার হাওয়া সম্ভব, চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে সাধুবাবা কাছে এসে পড়ছেন।

"মন্ত্রমুগ্ধের মতো দু'জন এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। আশ্চর্য! সাধুবাবার পা দুটি খটখটে শুকনো। সামান্য জলের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু তাই নয়, অপূর্ব এক মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে তাঁর শরীর থেকে। বিস্ময়ে তখন দু'জনের বাকরোধ হয়ে গেছে। কথা বলার সামান্য শক্তিও শরীরে অবশিষ্ট নেই। প্রণাম করে শুধু তাকালাম তাঁর মুখের দিকে। কিন্তু তাও ঠিকমতো পারলাম না। জোড়া ঘন ভুরুর তলায় অমন দিঘল চোখ, দিব্য অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এর আগে কখনও দেখিনি। সে চোখের দিকে তাকাবার জন্য যে মানসিক ক্ষমতার দরকার, তার কিছুমাত্র ছিল না আমাদের। মুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তিনি চলে গেলেন।

"প্রায় হতবুদ্ধির মতো দু'জন এরপর কতক্ষণ সেই নির্জন ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। চমক ভাঙল অদূরে মন্দিরের মৃদু ঘন্টাধ্বনির শব্দে। সন্ধ্যা উৎরে গেছে অনেকক্ষণ। আরতি শুরু হয়েছে। ফিরে এলাম ডেরায়। সব শুনে বৃদ্ধ সুরজদেও দু'হাত কপালে ঠেকালেন শুধু।

"রাতে অবনীর অবস্থা আরও খারাপ হল। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। ডবল নিউমোনিয়া। সঙ্গে সামান্য ওষুধপত্র যা ছিল, তারপর টোটকা, ব্যর্থ হল সবই। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এল। চেতনাহীন শরীর নিঃসাড় হয়ে এল ক্রমশ। রাত্তিরটা যে আর কাটবে না, বুঝতে বাকি রইল না কারও।

"রাত তখন কত খেয়াল নেই। বাইরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জোরালো হিমেল হাওয়া। ঘরের ভিতরে বসেও দারুণ ঠান্ডায় জমে আসতে চাইছে শরীর। শিয়রে বসে উদ্‌বিগ্ন সোমনাথ নাড়ির গতি পরীক্ষার জন্য অবনীর হাতটা তুলে নিয়েছিল। খানিক দেখে সেটা নামিয়ে রেখে ছিলে- ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে বলল, 'ধূর্জটি, তুই বোস। আমি আসছি।' দরজা খুলে মুহূর্তে প্রায় পাগলের মতো বের হয়ে গেল ও।

"এই রাতে সোমনাথ কোথায় ছুটছে, বুঝতে তখন বাকি নেই আমার। কিন্তু এই অবস্থায় ওকে একা ছাড়তেও সাহস হল না। ছুটে সঙ্গ নিলাম। বাইরে ঝড়ের মতো বরফ-শীতল হাওয়া বইলেও আকাশ বেশ পরিষ্কার। কুয়াশা তেমন জমাট বাধেনি তখনও। প্রচন্ড ঠান্ডায় প্রায় জমে আসতে চাইছে শরীর। জ্যোৎস্নার আলোয় হোঁচট খেতে খেতে কোনও রকমে এক সময় এসে পৌঁছলাম মন্দিরের সামনে উঁচু সুপ্রশস্ত পাথরের চাতালের কাছে। এই প্রচন্ড ঠান্ডায় গোটাকয়েক রোমশ পাহাড়ি কুকুরের সঙ্গে সেখানে শুয়ে আছেন জটাজূটধারী প্রায় নগ্ন একটি মানুষ। সেই সাধুবাবা। নিদ্রিত মানুষটির দেহ- নিঃসৃত দিব্যজ্যোতি রাতের অন্ধকারে আরও স্পষ্ট।

"মানুষটি যে সামান্য নন সেটা আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হল, যেমন ভেবেছিলাম মানুষটি তার চাইতেও অনেক বড়। সামান্য মানুষ আমরা, এমন দিব্য পুরুষের সাথে কথা বলার ক্ষমতা কোথায়? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। কোনওমতে বসে পড়লাম তাঁর পায়ের কাছে। কতক্ষণ যে দু'জন ওইভাবে পড়ে ছিলাম, জানি না । বোধ হয় চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ দেখি সাধুবাবা উঠে বসেছেন। তাঁর দু'চোখের দৃষ্টি গতকালের মতো অমন তীব্র অন্তর্ভেদী নয়। বরং অনেক প্রশান্ত। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। আমরা তাকাতে বললেন, 'এভাবে এখানে কেন বাবারা? ঘরে যাও। ফেরার যে সময় হল আমার!' দিব্য পুরুষটির ওই কথায় যেন বাক্‌স্ফূর্তি হল আমাদের। সোমনাথ মূহূর্তে তাঁর পায়ের উপর

হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ‘আমাদের সঙ্গী অবনীকে সুস্থ করে দিন বাবা। ঘরে ফিরে যাই। দয়া করুন।’

মৃদু হাসলেন উনি, ‘মৃত মানুষকে কী বাঁচানো যায় বাবা? সে পারেন ওই ওপরওয়ালা। আমি সামান্য মানুষ। সে সাধ্য কোথায়? তাছাড়া মৃত্যু সে তো জীবনেরই পরিণতি। ওই ওপরওয়ালাই আমাদের পৃথিবীতে পাঠান। কাজ ফুরিয়ে গেলে আবার নিজের কাছে ডেকে নেন। মৃত্যু তাই দুঃখের নয়। পরম আনন্দের।’

“একথা আগেও তো শুনেছি। কিন্তু সেই রাতে দিব্যপুরুষটির মুখের ওই কথাগুলি আমার ভিতরটা যেন জুড়িয়ে দিল। মনে হল, এরপর কিছু চাইবার নেই আর। সোমনাথ কিন্তু থামল না। একই ভাবে তার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলল, ‘কিন্তু আমি ওর বিধবা মাকে যে কথা দিয়ে এসেছি বাবা যে তীর্থ শেষে অবনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেব তাঁর কাছে! একমাত্র সন্তানের জন্য তিনি যে পথ চেয়ে রয়েছেন! ফিরে গিয়ে তাঁকে কী বলে বোঝাবো আমি? দয়া করুন বাবা। মায়ের কাছে ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।’

“প্রায় পাগলের মতো সোমনাথ এরপর কতক্ষণ যে তাঁর পায়ের উপর মাথা কুটেছিল আজ তা আর মনে নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়া দিলেন উনি। ডান হাত তুলে বললেন, ‘তাই হোক বাবা। অবনীকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিও তুমি।’

“তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত। পুব আকাশে পাহাড়ের পিছনে সামান্য ফিকে রং ধরেছে। চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিলেও চারপাশটা ফরসা হয়েছে সামান্য। দেরি না করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বড়ো বড়ো পা ফেলে মন্দির পার হয়ে চলে গেলেন উত্তর দিকে। অন্ধকারে আর দেখা গেল না তাঁকে।

“নিঃশব্দে দু’জন একসময় ফিরে এলাম ডেরায়। ঘরে ঢুকে চমকে উঠলাম প্রায়। অবনীর মুখের ভাব আগের মতোই তেমন ফ্যাকাশে। চোখ দুটোও অসুস্থ মানুষের মতো স্থির। কিন্তু বিছানার উপর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিব্যি উঠে বসেছে। আমাদের দেখে সামান্য ভারি গলায় বলল, ‘আমাকে একা রেখে তোরা গিয়েছিলি কোথায়? জ্বরটা কিন্তু একদম সেরে গেছে রে। বেশ লাগছে এখন। মনে হচ্ছে হেঁটেই ফিরতে পারব।’”

ধূর্জটিবাবু থামলেন। আমরা একঘর মানুষ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম। কে যেন বলল, “আপনার বন্ধু ভালো হয়ে গেল তাহলে?এমনও হয়!”

উত্তরে মৃদু হাসলেন উনি। হাতের চুরুটে গোটা কয়েক টান মেরে বললেন, “আমার গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। সামান্য আছে। আর এ কহিনীর সেটাই ক্লাইম্যাক্স।”

থামলেন ভদ্রলোক। নিঃশব্দে চুরুট টানতে টানতে অদূরে মোমবাতির শিখার দিকে আনমনে তাকিয়ে রইলেন খানিক । তারপর হঠাৎই মুখ খুললেন আবার।

“অবনীকে নিয়ে এরপর একদিন ফিরে এলাম কলকাতায়। পথে অবনীর আর কোনও সমস্যা হয়নি। তবু কেন জানি না ওকে কখনই তেমন স্বাভাবিক মনে হয়নি। সেই হাসিখুশি অবনী হঠাৎ কেমন পালটে গেছে। কথা বলে কম। গম্ভীর হয়ে থাকে। গলার স্বরটাও কেমন অন্য রকম। ঘড়ঘড়ে। মুখের সেই ফ্যাকাশে ভাবটাও রয়ে গেছে। পালটায়নি একটুও। চোখের মণি দুটোও কেমন স্থির। যাই হোক, ফিরে গেলাম যে যার বাড়িতে। কেটে গেল মাসকয়েক। অবনীর সাথে এরপর দেখা হয়েছে বার কয়েক। কিন্তু কখনই ওকে সেই আগের মতো মনে হয়নি। কেমন যেন পালটে গেছে মানুষটা।

“এর প্রায় মাসছয়েক পরের কথা। একদিন দুপুরে হঠাৎ অবনী অফিসে এসে হাজির। পরনে গুরুদশার কাপড়। চমকে উঠে বললাম, ‘এ কী রে অবনী! মাসিমা মারা গেছেন ! কী হয়েছিল?’

“অবনী ভারি গলায় বলল, ‘গত পরশু হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। কাউকেই সেভাবে জানাবার সময় পাইনি। সবে সোমনাথের অফিস হয়ে তোর এখানে আসছি। সোমনাথ অফিসে নেই। বেরিয়েছে। খবরটা তাই এখনও দেওয়া হয়নি ওকে। তা শোন, মায়ের কাজটা একটু বড় করেই করব ঠিক করেছি। তোদের থাকাটা তাই খুব জরুরি।’

“অফিস থেকেই টেলিফোন করলাম সোমনাথকে। পেয়েও গেলাম। কাছেই অফিস। শুনে হন্তদন্ত হয়ে চলে এল আমার অফিসে। আরও প্রায় ঘন্টাদেড়েক কথা বলার পর চলে গেল ওরা।

“মায়ের শেষ কাজটা বেশ জাঁকজমক করেই করল অবনী। সেদিন সব মিটতে আমরা যখন বিদায় নিলাম, রাত তখন প্রায় দশটা। পরদিন সকালে যথাসময়ে অফিসে এসে বসেছি,

তখন টেলিফোন এল। উঠে গিয়ে ধরতেই ওধার থেকে সোমনাথের উত্তেজিত গলা, 'ধূর্জটি, এইমাত্র খবর পেলাম অবনী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। অবস্থা ভাল নয়। পারলে এক্ষুনি চলে আয়।'

"খবর পেয়ে সোমনাথ আগেই হসপিটালে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকেই ফোন করেছিল ও। অফিস থেকে বের হয়ে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ছুটলাম। এই সামান্য সময়ের মধ্যে অবনীর কী এমন হতে পারে ভেবে পেলাম না কিছুতেই। হাসপাতালের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতেই দেখা হয়ে গেল সোমনাথের সঙ্গে। থমথমে মুখে এগিয়ে এসে বলল, 'অবনী সম্ভবত বাঁচবে না রে ধূর্জটি। স্যালাইন, অক্সিজেন কিছুই টানতে পারছে না। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। ওর বাড়ির আত্মীয়রা একবার দেখতে চেয়ে আবেদন করেছিল। অনুমতি মিলেছে। আমরা সবাই যাচ্ছি। তুইও চল।'

"ছুটলাম ওদের সাথে। লিফটে চারতলায় উঠে করিডোর ধরে খানিক হেঁটে অবনীর কেবিন। প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথটুকু পার হয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, কেবিনের পর্দা সরিয়ে নতমুখে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। পিছনে নার্সও রয়েছেন একজন। আমাদের দেখে বললেন, 'সরি, পেশেন্ট মারা গেছেন। এইমাত্র। একবার দেখে আসতে পারেন।'

"ডাক্তার চলে গেলেন। প্রায় আচ্ছন্নের মতো নার্সের সঙ্গে ঢুকলাম কেবিনের ভিতর। ছোট্ট কেবিন। বিছানায় আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা অবনীর দেহটা। ঘরে আমরা ক- টি প্রাণী তখন নির্বাক। কারও মুখেই কথা নেই। আমাদের অবস্থা দেখে নার্স ভদ্রমহিলা নিজেই এগিয়ে গিয়ে মৃত অবনীর মুখের উপর থেকে চাদরটা সামান্য সরিয়ে দিলেন। আর তারপরেই ভয়ার্ত আর্তনাদে পিছিয়ে এলেন কয়েক পা। বিছানায় শোয়ানো রয়েছে একটা পুরোনো শুকনো খটখটে নরকঙ্কাল। মেদ মাংসের সামান্য চিহ্নও নেই তার গায়ে।"

ঘরের ভিতর বাজ পড়লেও বোধ হয় এতখানি চমকাত না কেউ। মোমবাতির মৃদু আলোয় প্রায় হাঁ করে সবাই গল্প গিলছিলাম এতক্ষণ। ব্যাপারটা সামলাতেই লেগে গেল কয়েক সেকেন্ড। তারপরেই চারদিক থেকে প্রশ্নবাণ ছুটল, "নরকঙ্কাল! সেকী! কোত্থেকে এল?"

সামান্য হাসলেন ধূর্জটিবাবু। হাতের চুরুটে একটা টান দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "ব্যাপারটা নিয়ে সেই সময় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কাগজে লেখালেখিও কম হয়নি। তদন্তও হয়েছিল। কিন্তু রহস্যের মীমাংসা হয়নি । তবে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা নানা পরীক্ষার পর জানিয়েছিলেন, নরকঙ্কালটি অন্তত ছ- মাসের পুরোনো। আর সেটা অবনীরই।"

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

বিশ্বসাহিত্য

[লেখক পরিচিতি: হারবার্ট জর্জ (এইচ জি)ওয়েলস ব্রিটিশ সাংবাদিক , ঔপন্যাসিক , সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক হলেও সারা বিশ্বের কাছে তিনি পরিচিত কল্পবিজ্ঞান লেখক হিসাবে। লন্ডনে টি এইচ হাক্সলের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান পড়ার সময়ই কল্পবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়, তার ফলেই বিশ্ববাসী তাঁর কাছে উপহার পায় 'দি টাইম মেশিন(১৮৯৫)''দি ইনভিজিবল ম্যান (১৮৯৭)' এবং 'দি ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ড(১৮৯৮)' এর মত কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস। তিনি আরও লিখেছেন 'টোনো ব্যাঙগে(১৯০৮')এবং 'দি হিস্ট্রি অব মিঃ পলি(১৯১০)'এর মত উপন্যাস। "দি আউটলাইন অফ হিস্ট্রি" লিখেছেন ১৯২০ সালে। এছাড়াও তিনি লিখেছেন বেশ কিছু চমকপ্রদ ছোটগল্প, 'দি রেড রুম'যার অন্যতম।]

"আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কোনও অশরীরির সাধ্য নেই, আমাকে ভয় দেখায়।" কথাগুলো বলে গ্লাস নিয়ে আমি উঠে দাড়ালাম। সামনে জ্বলছে ফায়ার প্লেসের গনগনে আগুন।

"সেটা তোমার ব্যাপার, " রোগাভোগা শুকনো চেহারার মানুষটা কথাটা বলে আমার দিকে বাঁকাভাবে তাকাল।

"আমার এই আঠাশ বছর বয়স হল এখন পর্যন্ত ভূত দেখলাম না, " আমি বললাম।

বয়স্কা মহিলাটি এতক্ষণ একদৃষ্টে আগুনের দিকে তাকিয়েছিল, আমার কথা শুনে ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকাল, "তা বাপু আঠাশ বছরে এমন একখানা বাড়িও তো দেখনি। অনেক কিছুই এখনো দেখতে বাকি। মাত্র আঠাশ বছর বয়স তোমার। আরো কত কি এখনও দেখবে আর দুঃখ পাবে।" কথার তালে তালে তার মাথাও এদিক- ওদিক দুলছিল।

বুড়ো মানুষগুলোর একঘেয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে শুনতে আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে তারা বোধহয় এই বাড়ির অশরীরি আতঙ্ক সম্বন্ধে আমাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে। আমার শূন্য

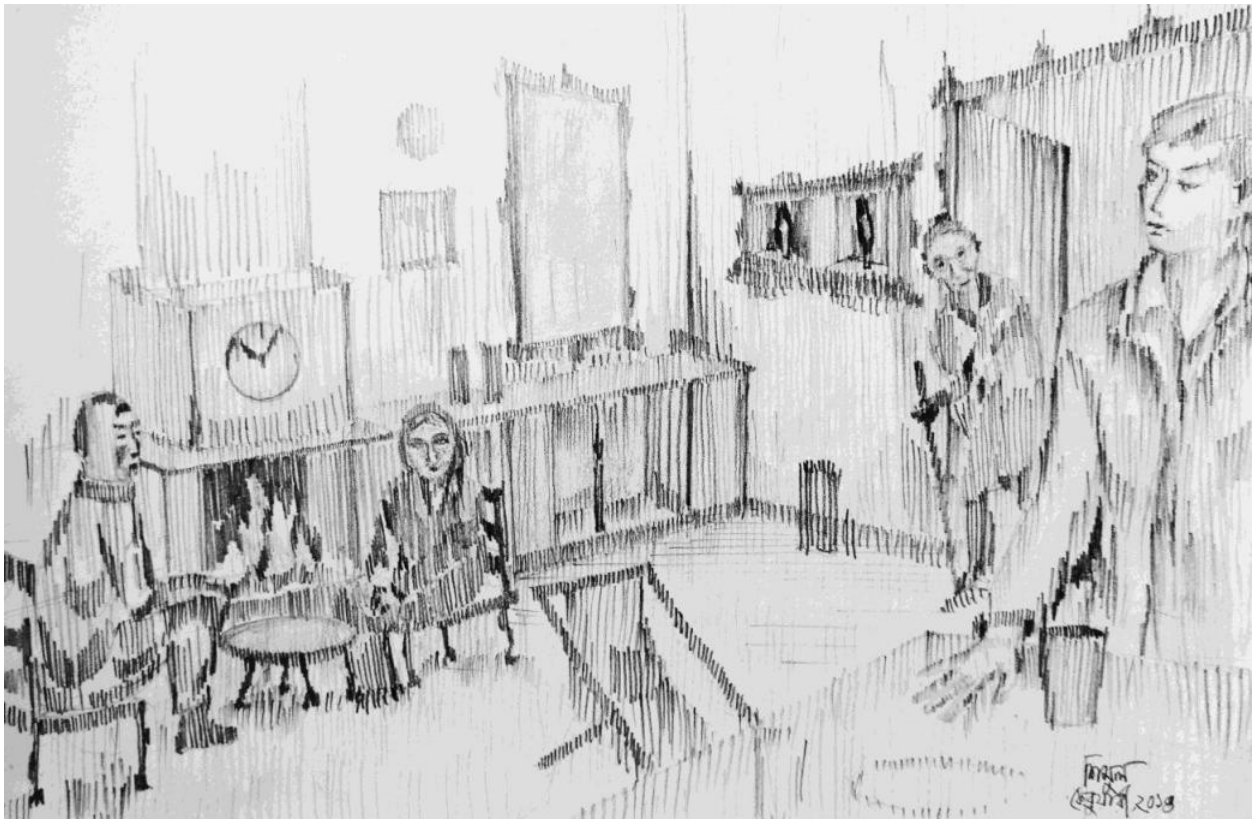

গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বোলানোর ফাঁকে,ঘরের শেষ প্রান্তের অদ্ভুতদর্শন আয়নাটাতে নিজের সংক্ষিপ্ত অথচ অবিশ্বাস্যরকম বলিষ্ঠ অবয়বের একঝলক দেখতে পেলাম । চমকে উঠলাম নিজেই।

"শুনুন," আমি বললাম, "আজ রাতে আমি যদি কিছু দেখতে পাই আমার জ্ঞানের ভান্ডার তাতে বাড়বে। আমি খোলা মনে সবকিছু বিচার করার জন্য এসেছি।"

"সেটা তোমার ব্যাপার," রোগাভোগা শুকনো চেহারার মানুষটা আরেকবার কথা বলল। ঠিক এই সময় বাইরের পাথরের মেঝেতে লাঠির ঠুকঠুকানি আর অন্য একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, যেন কেউ পা টেনে টেনে হাঁটছে। তারপর ক্যাঁ- চ করে খুলে গেল দরজাটা আর ঘরে প্রবেশ করল আরেকজন বৃদ্ধমানুষ। আরো কুঁজো, চামড়া আরও কোঁচকানো, প্রথমজনের চেয়ে আরো বেশি বয়স্ক। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, চোখ ঢাকা ছিল অস্বচ্ছ চশমায় আর আধখোলা,ঝুলে পড়া ফ্যাকাশে –গোলাপী নিচের ঠোঁট থেকে হলদে, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। টেবিলের উল্টোদিকে থাকা আরামকেদারাটার দিকে সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে পড়ল সে, শুরু হল কাশির দমক। শুকনো চেহারার মানুষটা এই বৃদ্ধের দিকে একবার তাকাল মাত্র, বিরক্তির ছাপ তাতে স্পষ্ট। বয়স্কা মহিলা তার আসাকে কোনোরকম পাত্তা না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল আগুনের দিকেই।

কাশির আওয়াজ একটু কমে এলে, শুকনো চেহারার মানুষটি বলল, "আমি বলছি- এটা তোমার ব্যাপার।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো বলছি, এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত আগ্রহ,"আমি বললাম।

ঘোলাটে চশমা পর মানুষটা এই প্রথম আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সতেচন হয়ে উঠলো। আমাকে দেখার জন্য একঝলক ঘাড় ঘোরাল সে। চশমার ফাঁক দিয়ে এক মুহুর্তের জন্য দেখতে পেলাম তার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ লালচে চোখ দুটি। তারপর আবার শুরু হল কাশির দমক, থুথু ছিটকোতে লাগল চতুর্দিকে।

"আচ্ছা তুমি পান করছ না কেন?" রোগাভোগা শুকনো চেহারার মানুষটা তার দিকে বিয়ারের পাত্রটা এগিয়ে দিল। ঘোলাটে চশমা পরা মানুষটা কাঁপা কাঁপা হাতে একটা গ্লাসে বিয়ার ঢালল, যার অর্ধেকটাই আবার ছড়িয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। বিরাট ছায়াটা দেওয়ালে রাক্ষুসে ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দিয়ে যেন ভ্যাঙাচ্ছিল তার বিয়ার ঢালা আর পান করার ভঙ্গিটাকে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এখানে এমন ভূতুড়ে মানুষজনের সান্নিধ্য আমি আশা করিনি। একটানা দমবন্ধ করা ভাব ক্রমেই জাঁকিয়ে বসেছিল মনের মধ্যে। এই তিনজন বৃদ্ধ- বৃদ্ধার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল তারা কেউ কাউকে পছন্দ করে না এবং তারা আমাকেও বিশেষ পছন্দ করছে না। তাদের এই হঠাৎ হঠাৎ কথা বলা পরক্ষণেই চুপ করে যাওয়া – এইসব ব্যাপার স্যাপার দেখে অস্বস্তিটা ক্রমশই বাড়ছিল আমার। সেটা কাটানোর জন্য আমি বললাম,"আমাকে বরং এ বাড়ির ভূতের ঘরটা দেখিয়ে দিন, সেটাই বরং ভালো হবে।"

কাশতে থাকা বুড়োটা আচমকা তার ঘাড়টা আমার দিকে ঘুরিয়ে , ঘোলাটে চশমার ফাঁক দিয়ে দুটো লাল চোখে এমনভাবে তাকাল যে আমি কেঁপে উঠলাম। কেউ কোনও উত্তর দিল না অবশ্য।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করে, আমি একটু জোরেই বললাম "যদি আপনারা আমাকে এ বাড়ির ভূতুড়ে ঘরটা দেখিয়ে দেন , তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করে আমাকে সঙ্গ দিতে হবে না।"

"দরজার বাইরে চাতালে একটা মোমবাতি আছে," রোগাভোগা শুকনো চেহারার মানুষটা বলল, "কিন্তু আজকের রাতটায় তুমি যদি ঐ লাল কামরায় যাও--- "

"বিশেষ করে আজকের রাতটায়," বৃদ্ধা মহিলাটির কাঁপা কাঁপা গলায় মন্তব্য ।

"তুমি একা যাও!"

"ঠিক আছে, একাই যাব", আমি বললাম ,"কিন্তু কোনদিক দিয়ে যাব?"

"বারান্দা দিয়ে হেঁটে খানিকটা গেলে তুমি একটা দরজা পাবে, সেখানে একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেক উঠলে একটা বারান্দা । সেখানে পাবে আরেকটা দরজা , মোটা পশমের পর্দা ঝোলানো। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে ল- ম্বা করিডরের একেবারে শেষ মাথায় চলে যাবে, সেখানে বাঁদিকে কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙলেই লাল কামরা।"

"বেশ আমি তাহলে এই পথে যাব," বলে আমি যাত্রাপথটা আরেকবার ঝালিয়ে নিলাম। রোগাভোগা শুকনো চেহারার মানুষটা শুনে ঠিকঠাক করে দিল।

"তাহলে তুমি সত্যিই যাচ্ছ?" ঘোলাটে চশমা পরা, অস্বাভাবিক মুখের মানুষটা তৃতীয়বারের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে , সেই প্রথমবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

"বিশেষ করে আজকের রাতটায়!" বৃদ্ধা মহিলাটির কাঁপা কাঁপা গলা শোনা গেল।

"আমি সেজন্যই এসেছি," বলে আমি দরজার দিকে এগোলাম। যখন আমি এগোচ্ছি, দেখতে পেলাম ঘোলাটে চশমা পরা মানুষটা আরামকেদারা থেকে উঠে টেবিলের পাশ দিয়ে টলতে টলতে এগোতে লাগল ফায়ারপ্লেসের কাছটায় যাওয়ার জন্য , যেখানে সবাই বসে আছে। দরজার কাছে গিয়ে আমি ঘুরে আরেকবার সবার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম তারা সবাই আলো আঁধারির মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে, একে অন্যের কাঁধের ফাঁক দিয়ে ইতিউতি চাইছে আমার দিকে, তাদের প্রাচীন, বয়স্ক মুখগুলোতে পড়েছে একটা অদ্ভুত অভিসন্ধির ছাপ।

"শুভরাত্রি," বলে আমি দরজাটা খুললাম।

"এটা তোমার ব্যাপার , তুমি নিজেই যাচ্ছ বাপু," রোগাভোগা শুকনো চেহারের মানুষটা বলল।

বাইরে গিয়ে আগে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিলাম। তারপর দরজাটা টেনে দিয়ে , কনকনে

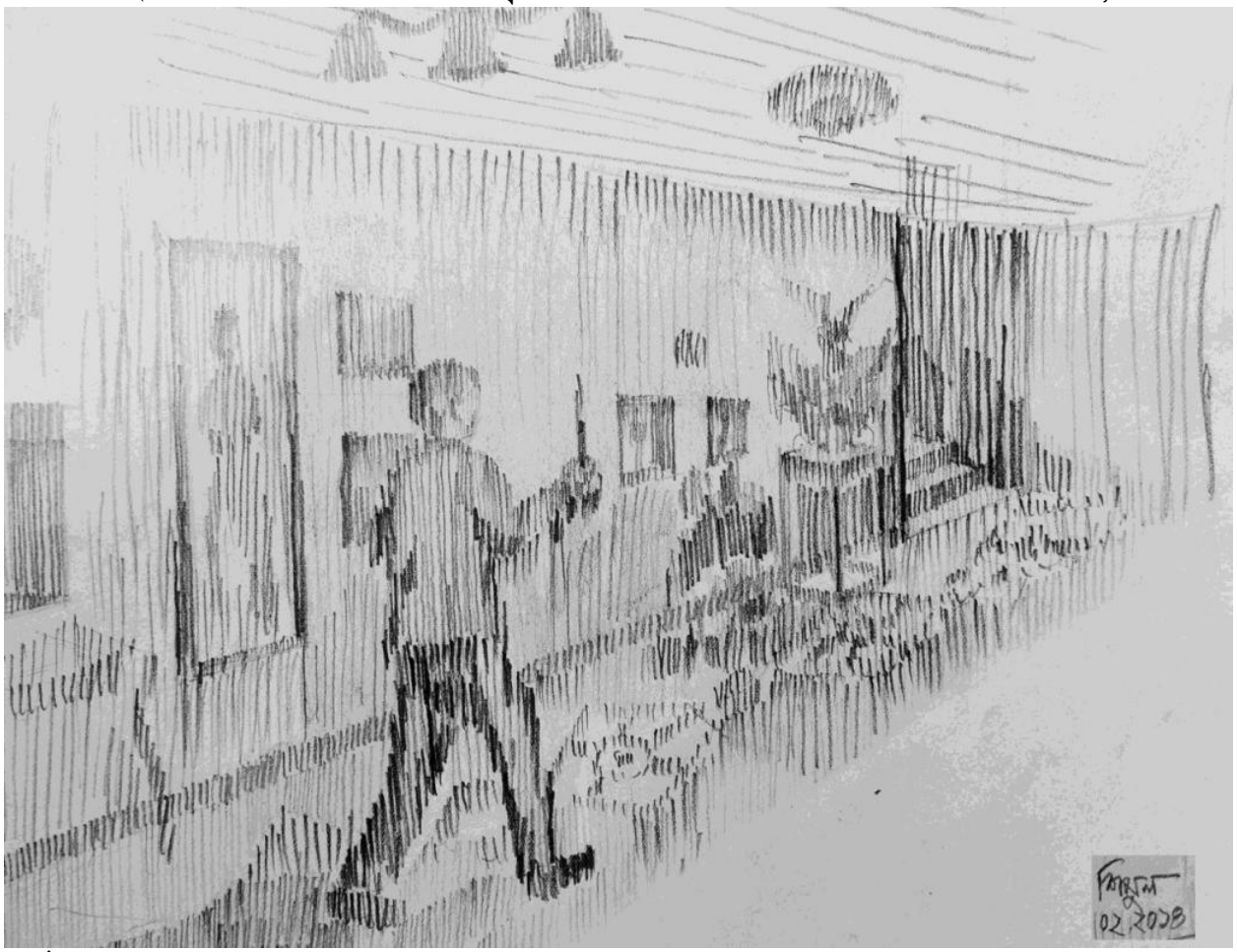

দসঠান্ডা বারান্দায় পা বাড়িয়ে দিলাম। আমার পায়ের শব্দ বারান্দায় সৃষ্টি করছিল প্রতিধ্বনি।

আমি স্বীকার করছি , যে তিনজন কর্মচারীর হাতে নাইটের স্ত্রী এই প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছেন, তাদের এমন ধরনের আচার- আচরণ, যে ঘরটায় তারা বসেছিল সেই ঘরের গাঢ় রঙ , তার প্রাচীন আমলের আসবাবপত্র, সবকিছুই আমার মনের মধ্যেই একটা অদ্ভুত প্রভাব ফেলেছিল। মনে হচ্ছিল , ওরা যেন এক অন্য যুগের মানুষ, প্রাচীন যুগের , যে যুগে আধিভৌতিক বিষয়গুলো ছিল অনেক বেশি প্রকট, যে যুগে অশুভ লক্ষণ আর ডাইনি- মায়ারা ছিল বিশ্বাস্য, যখন অশরীরি আত্মায় অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠতো না। মানুষগুলোর চালচলনই যেন কেমন ভৌতিক ধরনের , ওদের পোশাক- আশাক পরার ধরন- ধারণ, চলাফেরার কায়দাকেতা সবকিছু যেন কোনও মৃত মানুষের কল্পনাপ্রসূত। যাই হোক এই ধরনের চিন্তাভাবনাগুলোকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে পথের দিকে তাকালাম। ধুলোভরা, কনকনে ঠান্ডা, সামনের লম্বা খোপকাটা পথের দু'পাশে আমার মোমবাতির টিমটিমে আলো তৈরি করছিল অদ্ভুত ছায়াছবি। ঘোরানো সিঁড়িপথের ওপর নিচে , আমার পদশব্দ সৃষ্টি করছিল প্রতিধ্বনি। একটা ছায়া এঁকেবেঁকে আমার পিছুপিছু চলছিল, আর একটা আমার সামনে দিয়ে মাথার ওপরের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল, কে জানে। ল্যান্ডিং এ পৌছে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলাম, মনে হল কোনও কিছু নড়াচড়ার আওয়াজ পেলাম , কিন্তু সেখানে বিরাজ করছিল এক অপরিসীম নৈঃশব্দ। তারপর আমি পশমের ভারী পর্দা ঝোলানো দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে করিডরের সামনে দাঁড়ালাম।

নিচের সিঁড়ির বিরাট জানলা দিয়ে প্রবেশ করছিল চন্দ্রালোক, ধুইয়ে দিচ্ছিল সবকিছু, কালচে- রুপোলি ছায়াছায়ার মায়াজালে আচ্ছন্ন ছিল চারদিক। এমন দৃশ্য দেখব আশা করিনি। প্রতিটি জিনিস ছিল ঠিকঠাক জায়গায়, যেন এ প্রাসাদ আঠেরো মাস আগে নয়, গতকালই পরিত্যক্ত হয়েছে। দেওয়ালগিরিতে বসানো ছিল মোমবাতি। যতটুকু ধুলো পড়েছিল কার্পেটে অথবা পালিশ করা মেঝেতে, তা এমন সূক্ষ, এমন মসৃণতায় সমানভাবে ছড়ানো ছিল , যে চাঁদের আলোয় তা প্রায় বোঝাই যাচ্ছিল না। আমি এগোতে গিয়েও আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ল্যান্ডিং এর একেবারে শেষ প্রান্তে, কিছু ব্রোঞ্জের মূর্তি দাঁড় করানো ছিল(যেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না)কিন্তু এদের ছায়া এমন অত্যাশ্চর্য জীবন্তভাবে দেওয়ালের সাদা প্যানেলে পড়েছিল যে মনে হচ্ছিল , সামনে আমার চলার পথে কারা যেন গুটিসুটি মেরে বসে আছে, যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল আমার। প্রায় আধমিনিট মতো আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর পকেটের রিভলবারের ওপর একটা হাত রেখে এগিয়ে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, এটা একটা গ্যানিমিড আর ঈগলের মূর্তি- চন্দ্রালোকে চকচক করছে। মুহূর্তেই চাঙ্গা হয়ে উঠল আমার হতোদ্যম স্নায়ুতন্ত্র। এতটাই , যে কিছুটা এগিয়েই একটা টেবিলের ওপর বসানো যে পোর্সেলিনের চিনামাটির মূর্তিটা নিঃশব্দে মাথা নাড়ছিল ,পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটা দেখেও আমি খুব সামান্যই চমকে গেলাম। করিডোরের শেষ প্রান্তে, আলো আঁধারির মধ্যে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে গেছে লাল কামরার দরজার দিকে। দরজা খোলার আগে , আমি মোমবাতির আলোয় চারদিক ভালো করে দেখে নিলাম। আমার মনে পড়ল, এই ঘরের রহস্যভেদ করার জন্য আমার আগেও একজন এসেছিল। সেই কাহিনীর স্মৃতি আমার চেতনাকে ক্ষণিক বেদনায় আচ্ছন্ন করল, আমি ঘাড় ঘুরিয়ে সেই চন্দ্রালোকিত গ্যানিমিডের মূর্তির

দিকে তাকালাম , তারপর চকিত হাতে লাল কামরার দরজা খুললাম, ল্যান্ডিং এর চাপা , বিষণ্ন নৈঃশব্দ্যকে পেছনে ফেলে।

ঘরে ঢুকেই আমি তৎক্ষণাৎ চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা আটকে দিলাম। তারপর মোমবাতি তুলে ধরলাম, যে ঘরে রাত কাটাতে হবে , সেই ঘরের সমস্ত কিছু ভাল করে দেখে নেওয়ার জন্য। এই তাহলে লোরেইন ক্যাসেলের সেই কুখ্যাত লাল কামরা, সেই ঘর যেখানে সেই তরুণ ডিউক মারা গেছিলেন। নাকি এটা বলাই ভালো যে এখান থেকেই তাঁর মরণের ডাক এসেছিল, তিনি দরজা খুলে সিঁড়ির ধাপ থেকে সোজা নিচে পড়ে গিয়েছিলেন , মটকে গেছিল ঘাড়, সেই সিঁড়ির ধাপ, যেগুলো বেয়েই আমি এখুনি উঠে এলাম। এখানকার ভৌতিক পরিবেশের কুসংস্কার ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি, পরিণামে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। আমার ধারণা, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল মৃগীরোগে , কিন্তু সবার ধারণা , ভূতে তাঁর ঘাড় মটকে মেরেছে। এ ঘরে প্রথমে ভয় পেয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক মহিলার, যদিও ঠাট্টা করে ভয়টা দেখিয়েছিলেন তাঁর স্বামীই। একটা তরতাজা প্রাণের অবসান হয়েছিল এমন মর্মান্তিকভাবে। এ ঘরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে আরো পুরোনো নানান সব কাহিনি। এই বিরাট বিষণ্ন, অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরার আবছায়া জানালায়, এর দেওয়ালের চোরাকুঠুরি আর কুলুঙ্গির দিকে তাকিয়ে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে ভয়ের কাহিনী পল্লবিত করতে এ ঘরের কালো কালো প্রান্তগুলোয় জমে থাকা অন্ধকারই যথেষ্ট। আমার হাতের মোমবাতিটার ছোট্ট আলো এই প্রকান্ড কামরার জমাট বাঁধা অন্ধকার সরিয়ে দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল। অপার রহস্য আর ছমছমে পরিবেশের মাঝে ছোট্ট একটা আলোর দ্বীপ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

ঠিক করলাম প্রথমে ঘরটাকে একবার ভাল করে দেখে নেব। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও কিছু চোখের সামনে না ঘটছে, ততক্ষণ আজেবাজে কোনও চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া কাজের কথা নয়। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করা হয়েছে কিনা সেটা আরেকবার দেখে নিয়ে আমি সামনের দিকে তাকালাম। প্রতিটা আসবাবপত্রে চোখ বোলালাম, খাট থেকে নামানো ঝালরটা তুলে দেখলাম, সরিয়ে দেখলাম চাদরটাকেও। জানালার খড়খড়িগুলো টেনে, তার কবজাগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম সব ঠিক আছে কিনা, তারপর বন্ধ করে দিলাম।

নিবিড় আঁধারে দাড়িয়েছিল ফায়ারপ্লেসের চিমনিটা, সামনে ঝুঁকে দেখলাম তাও,আর গাঢ় রঙের ওককাঠের প্যানেলগুলো ঠক ঠক করে বাজিয়ে দেখলাম, সেখানে কোনও গোপন পথ আছে কিনা। ঘরে দুটো বিরাট আয়না ছিল, প্রতিটার সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে একজোড়া করে মোমদানি, আর ফায়ারপ্লেসের পাশের ম্যান্টেলশেলফের চিনামাটির মোমদানিতেও বসানো ছিল অনেকগুলো মোমবাতি। একে একে সবকটাই জ্বালিয়ে দিলাম, আগুন ধরানোর জন্য তৈরি করা ছিল ফায়ারপ্লেসটা – এতটা দায়িত্বশীলতা অবশ্য আমি বুড়োদের কাছ থেকে আশা করিনি। অন্তত শীতের কাঁপুনির হাত থেকে তো রক্ষা পাওয়া যাবে। আগুনের আঁচ গনগনে হয়ে উঠলে আমি সে দিকে পিছন ফিরে ঘরটাকে আরেকবার দেখলাম। তারপর ছিটকাপড়ের ঢাকনা দেওয়া আরামকেদারাটা আর একটা টেবিল সামনে নিয়ে নিলাম যাতে সেটা টপকে কেউ সরাসরি আমার

কাছে আসতে না পারে। টেবিলের ওপর রইল আমার রিভলভার-- প্রয়োজনবোধে যেকোনো মুহূর্তে সেটা হাতে তুলে নেওয়ার জন্য।

এতকিছুর পরও আমি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ঘরের কোণে কোণে জমে ছিল ঘন অন্ধকার, থমথম করছিল চতুর্দিক, এক অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য নানারকম অলীক কল্পনার জন্ম দিছিল আমার মনে। ঘরে প্রতিধ্বনিত হছিল ফায়ারপ্লেসের আগুন জ্বলার ফটফট আওয়াজ, যার শব্দে বার বার চমকে উঠছিলাম আমি। কেবল মনে হচ্ছিল, ঘরের শেষ প্রান্তের ছায়াচ্ছন্ন চোরাকুঠুরিতে অজানা কারও উপস্থিতি, যেন কেউ লুকিয়ে আছে, জীবন্ত কিছু, এই স্তব্ধতা আর নিঃসঙ্গতার মধ্যে এই চিন্তাভাবনাগুলো বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল মনের মধ্যে। কিছুতেই অস্থিরতা সামলাতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যই, একটা মোমবাতি নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে এলাম যে সত্যিসত্যিই সেখানে কেউ নেই। মোমবাতিটা চোরাকুঠুরির মেঝেতেই দাঁড় করিয়ে দিলাম।

এ সময়টা কেন যেন আমার স্নায়ুগুলো অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল , খুব বিচলিত বোধ করছিলাম আমি, যদিও এমনটা হওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যাই হোক, যদিও আমি জানতাম ও নিশ্চিত ছিলাম যে আলৌকিক বলে কিছু হয় না, তাই সময় কাটানোর জন্যই কিছু ছড়া আওড়াতে লাগলাম। কিন্তু কয়েকটা জোর গলায় বলার পরই বুঝতে পারলাম যে আওয়াজটার প্রতিধ্বনি হচ্ছে, যা মোটেই শুনতে ভাল লাগছে না। খানিক বাদে টের পেলাম এসব হানাবাড়ি আর অলৌকিক ব্যাপার যে কতটা ফালতু, সে সম্বন্ধে আমি নিজের মনেই বকরবকর করছি! বুঝতে পারলাম ঘাবড়ে গেছি। আমার মন বারবার ফিরে যাচ্ছিল নিচের তলার তিন বিচিত্রদর্শন বৃদ্ধ- বৃদ্ধার দিকে। চেষ্টা করেও মনকে বশে আনতে পারছিলাম না। এই বিরাট ঘরের বিবর্ণ লালচে আর কালোরঙ মনেও মধ্যে ছাপ ফেলেছিল যথেষ্ট। এমনকি, সাতখানা মোমের আলোতেও ঘরটা খুব ম্লান লাগছিল। চোরাকুঠুরির মোমবাতিটা দমকা বাতাসে কেঁপে উঠছিল, কম্পমান অগ্নিশিখা তৈরি করছিল নানারকম ছায়া আর উপছায়া, ক্রমাগত নড়েচড়ে স্থান পরিবর্তন করছিল সেগুলো। উপায় ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল বাইরের বারান্দায় দেখা মোমবাতিগুলোর কথা। অতএব, একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে চন্দ্রলোকিত বারান্দায় গিয়ে গোটাদশেক মোমবাতি নিয়ে ফিরে এলাম। দরজাটা খোলাই রইল। ঘরের এদিক- ওদিক ছড়ানো ছিল চিনামাটির তৈরি কয়েকটা টুকটাক জিনিস, প্রত্যেকটার ওপর একটা করে মোমবাতি বসিয়ে জ্বালিয়ে দিলাম, তারপর সেগুলো ছড়িয়ে দিলাম ঘরের বিভিন্ন জায়গায় যেখানে অন্ধকার গভীর । কিছু রাখলাম মেঝের ওপর , কিছু জানালার ফাঁকে, সাতেরোটা মোমবাতির প্রত্যেকটাকেই এমনভাবে সাজালাম যাতে ঘরের প্রতিটি ইঞ্চিই কোনও না কোনও মোমবাতির থেকে আলোকিত হয়। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগল। মোমবাতিগুলোর পলতে টলতেগুলো মাঝে মধ্যে ঠিকঠাক করে দেওয়া আমার এখন সময় কাটানোর একটা খেলা হয়ে দাঁড়াল।

অত কিছু করা সত্ত্বেও, একটা অজানা আশঙ্কা মনের মধ্যে হানা দিয়ে যাচ্ছিল বার বার,যেন যে কোনো মুহূর্তেই ভয়ানক একটা কিছু ঘটে যাবে এখানে। মধ্যরাত্রির কিছু পরেই চোরাকুঠুরির মোমবাতিটা আচমকা নিভে গেল, আর মসীকৃষ্ণ ছায়া লাফিয়ে ফিয়ে এল তার

জায়গায়। আমি মোমবাতিটা নিভতে দেখিনি। কেবল ঘুরে তাকিয়ে সেখানে অন্ধকার দেখতে পেলাম, যেন কেউ সচকিত হয়ে দেখল কোনো অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের উপস্থিতি। "আরিব্বাস!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "জোর হাওয়া ছেড়েছে দেখছি!" টেবিল থেকে দেশলাইটা তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে এগিয়ে গেলাম সেদিকে, মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দেব বলে। প্রথম কাঠিটা ধরাতে পারলাম না। যখন দ্বিতীয়টা জ্বালালাম, মনে হল সামনের দেয়াল থেকে কে যেন চোখ টিপল আমার দিকে তাকিয়ে। শক্ত হয়ে গেল আমার ঘাড়, কোনোক্রমে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ ঘোরালাম পিছন দিকে। আশ্চর্য, ফায়ারপ্লেসের সামনের টেবিলের মোমবাতি দুটোও নিভে গেছে! চকিত পায়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। "অদ্ভুত ব্যাপার, " আমি বললাম "আমি আবার ওগুলো নেভালাম কখন?"

ফিরে গিয়ে আবার তাদের একটাকে জ্বালালাম। যখন জ্বালাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম একটা আয়নার ডানদিকের মোমদানির একটা মোমবাতি মিটমিট করেই নিভে গেল আর প্রায় পরক্ষণেই তার পাশেরটাও নিভে গেল। এবার আর কোনও ভুল নেই। শিখাটা স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন কেউ পলতেটাকে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে চেপে ধরল, কোনও লালচে আভা হল না, ধোঁয়া ছাড়ল না, পলতেটা শুধু কালো হয়ে গেল। আমি হাঁ করে দেখছিলাম, আর তখনই , খাটের পাশের মোমবাতিটা নিভে গেল আর ছায়ারা যেন আমার দিকে আরেক পা এগিয়ে এল।

"এ হতে পারে না," আমি বলে উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই ম্যান্টেলশেলফের প্রথম মোমবাতিটা আর তারপরেই তার পরেরটাও নিভে গেল।

"কী হচ্ছে কী এসব!" আমি কোনওক্রমে চেঁচিয়ে উঠলাম। গলাটা নিজের কানেই বিচিত্র শোনালো। তক্ষুনি ওয়ারড্রোবের মোমবাতিটা নিভে গেল আর চোরাকুঠুরির যে নিভে যাওয়া বাতিটা আমি আবার জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, নিভে গেল সেটাও।

"দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা," হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠে আমি দেশলাইটা খামচে ধরলাম, ম্যান্টেলশেলফের বাতিগুলো জ্বালাব বলে। আমার হাত এত কাঁপছিল যে প্রথম দুটো কাঠি দেশলাইবাক্সের গায়ে লাগাতেই পারলাম না। যখন ম্যান্টেলশেলফের বাতিগুলো জ্বালালাম, ঠিক সেই সময়েই ঘরের দু'প্রান্তের দুটো মোমবাতি নিভে গেল, তার জায়গায় ফিরে এল আঁধার। একটা দেশলাইকাঠি দিয়ে আয়না সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত বড় মোমবাতিগুলো আবার জ্বালালাম, আর দরজার কাছে মেঝেতে যেগুলো ছিল ,জ্বালালাম সেগুলোও; মনে হল, বাতি জ্বলা- নেভার এই ভয়ঙ্কর খেলায় জিতে গেলাম আমিই, কিন্তু ঠিক তখনই এক ঝটকায় ঘরের বিভিন্ন প্রন্তের চারটে আলো একসঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি শিহরিত হয়ে দ্রুত আরেকটা কাঠি ধরালাম, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে , বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম, কী করব ভেবে না পেয়ে।

যখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম , তখনই মনে হল যেন একটা অদৃশ্য হাত এসে এক ঝটকায় টেবিলের সমস্ত বাতিগুলো নিভিয়ে দিল। তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করে আমি ছুটে গেলাম চোরাকুঠুরিতে, সেখান থেকে জানলায়। তিনটে মোমবাতি জ্বালালাম। সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ারপ্লেসের সামনের দুটো মোমবাতি নিভে গেল। দেশলাইটা ঘরের কোণের লোহার বাক্সের দিকে ছুঁড়ে

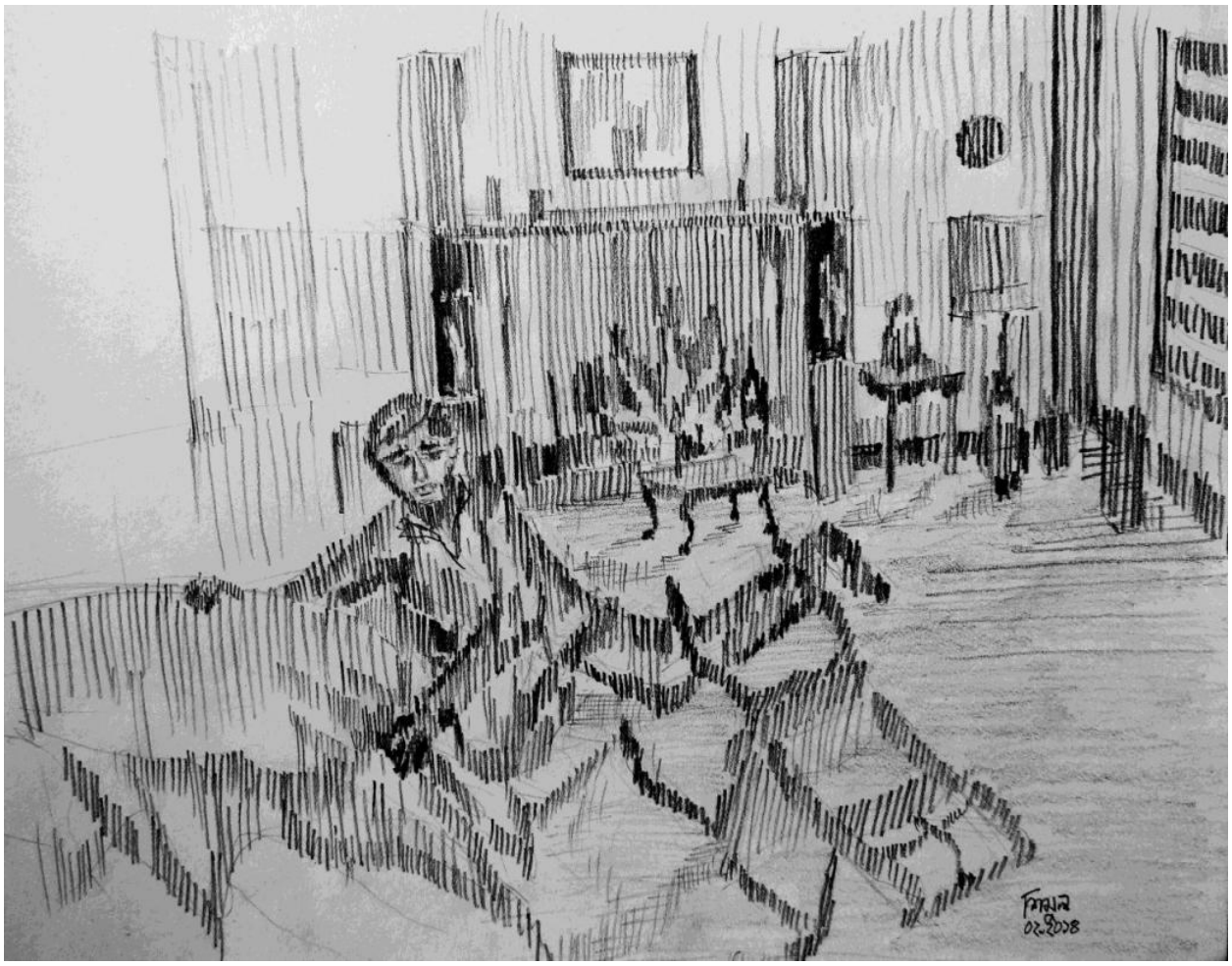

ফেলে দিয়ে আমি একটা বড় বাতিদান তুলে নিলাম, দেশলাই ধরানোর সময়টা বাঁচানোর জন্য । কিন্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বাতিগুলো ক্রমাগত নিভে যাচ্ছিল, ফিরে আসছিল ছায়ারা, যাদের ভয় পাচ্ছিলাম আমি, যাদের বিরুদ্ধে আমি লড়ে যাচ্ছিলাম , গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছিল তারা, একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক থেকে। থেকে থেকেই একটা ছায়া ফিরে আসছিল , মিনিটখানের জন্য নেচে বেড়াচ্ছিল , আবার কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। এগিয়ে আসা অন্ধকারের ভয়ে আমার আতঙ্ক তখন প্রায় চরম পর্যায়ে পৌছেছিল, আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। আমি লাঁফাচ্ছিলাম, আমি হাঁফাচ্ছিলাম , আমি খ্যাপার মতো ছুটে যাচ্ছিলাম একটা মোমবাতি থেকে আরেকটার দিকে, এগিয়ে আসা ছায়াদের সঙ্গে একটা ব্যর্থ লড়াই করার জন্য।

টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমার জানুতে কালশিটে পড়ে গেল, হোঁচট খেলাম চেয়ারের সঙ্গে , উল্টে গেল চেয়ার , উল্টে পড়লাম আমিও, টেবিলের চাদরটাকে জড়িয়ে। মোমবাতিটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল আমার তক্ষুনি আরেকটা তুলে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। টেবিলের থেকে এটা তুলে নিতে যাওয়ার সময় আচমকা আমার গতিতে তৈরি হওয়া বাতাসে এটা নিভে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, শেষ দুটো বাতিও নিভে গেল!

কিন্তু আছে, ঘরে এখনও একটা আবছা আলো আছে, একটা রক্তিম আলো। যেটা অন্ধকারকে এখনও আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ফায়ারপ্লেস! হ্যাঁ এই আগুন থেকেই আমি মোমবাতি জ্বালিয়ে নিতে পারি।

আমি সেদিকে ফিরলাম, যেখানে জ্বলন্ত কাঠ আর কয়লার মাঝে আগুনের শিখাটা নাচছিল, লালচে আলোর প্রতিফলনগুলো ছড়িয়ে পড়ছিল আসবাবপত্রের ওপরে, সেদিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই জ্বলন্ত শিখাটা ক্রমশ ছোট হতে হতে নিভে গেল , নিভে গেল ধিকধিক করে জ্বলতে থাকা আগুন, হারিয়ে গেল প্রতিফলনগুলো, আমার মোমবাতিটা সেখানে চেপে ধরতেই অন্ধকার গ্রাস করল আমাকে , আচ্ছন্ন করল আমার দৃষ্টি, যেন আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, আর চূরমার করে দিল আমার মস্তিস্কের যুক্তির শেষ টুকরোগুলোও। বাতিটা আমার হাত থেকে পড়ে গেল। একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আমি দু'হাত ছুঁড়লাম সেই অকল্পনীয় অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য আর গলার স্বর সপ্তমে তুলে আমি সর্বশক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলাম – একবার, দুবার, তিনবার। আর তখনই আমার মনে হল পালাতে হবে। ছুটে পালাতে হবে এখান থেকে।

আমি জানি, বাইরেই আছে সেই চন্দ্রালোকিত করিডর। তাই মাথা নিচু করে, দুহাতে মুখ ঢেকে আমি দরজার দিকে ছুটলাম।

কিন্তু আমি খেয়াল করতে পারিনি , যে দরজার অবস্থানটা ঠিক কোথায়। ফলে দৌড়তে গিয়ে খাটের কোনায় সজোরে ধাক্কা খেলাম। টলতে টলতে পিছিয়ে এলাম আমি, ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার এগোতে গিয়ে এবার ধাক্কা খেলাম আরও বড় কোনও জিনিসের সঙ্গে । আমার আবছা মনে আছে, আমি এভাবে বারংবার আঘাত পাচ্ছিলাম, সেই নিকষ কালো অন্ধকারে চলছিল একটা অন্ধ লড়াই, আমি পাগলের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একদিক থেকে অন্য দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম, অবশেষে কপালে এক ভয়ঙ্কত আঘাত ,পতনের এক ভয়াবহ অনুভুতি যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে, উঠে দাঁড়ানোর মরিয়া প্রচেষ্টা , তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

দিনের আলোয় চোখ মেললাম আমি। আমার মাথায় একটা হালকা ব্যান্ডেজ বাঁধা। রোগাভোগা শুকনো চেহারার মানুষটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে উদগ্রীব হয়ে আছে। আমি নিজেকে দেখলাম, কী ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম ঘরের কোনে সেই বৃদ্ধা, ছোট একটা শিশি থেকে একটা গ্লাসে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢালছে, এখন আর তাকে রাতের মত রহস্যময় লাগছিল না।

"আমি কোথায়?"আমি জিজ্ঞসা করলাম," মনে হচ্ছে আপনাদের আগে দেখেছি, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিকঠাক মনে করতে পারছি না।"

তখন তারা আমাকে বলল সেই ভয়ঙ্কর লাল কামরার কথা। "আমরা তোমাকে ভোরবেলা উদ্ধার করেছি" রোগাভোগা মানুষটা বলল, "তোমার কপালে আর ঠোঁটে রক্ত মাখা ছিল।"

খুব ধীরে ধীরে রাতের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছিল আমার। "তুমি নিশ্চয়ই এখন স্বীকার করবে, ঐ ঘরটা ভূতুড়ে?" রোগাভোগা মানুষটা বলল। সে এখন আর আমার সঙ্গে রুক্ষভাবে কথা

বলছিল না , বরং তার কথায় ফুটে উঠেছিল সহমর্মিতার ছাপ, যেন কোনও ভেঙে পড়া বন্ধুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

"হ্যাঁ," আমি বললাম "ঘরটা ভূতুড়ে।"

"তাহলে তুমি ভূত দেখেছ। আর আমরা ,যারা সারাটা জীবন এখানেই কাটিয়ে দিলাম , আমরা তো কখনোই ওখানে রাতে পা দেওয়ার সাহস পর্যন্ত পাইনা। এখন বলো এটা কি সত্যিই বৃদ্ধ আর্লের আত্মা, যিনি—"

"না, " আমি বললাম, "সে সব কিছু নয়। "

"আমি বলছি," গ্লাস হাতে বৃদ্ধা মহিলাটি বলল, "এটা সেই দুঃখি তরুণী কাউন্টেস যিনি ভয় পেয়ে--- "

"না, তাও নয়," আমি বললাম, "ওখানে কোনো আর্ল বা কাউন্টেসের ভূত নেই, ওখানে কোনও ভূতই নেই- কিন্তু যা আছে তা ভয়ঙ্কর, আরো ভয়ঙ্কর-- "

"তার মানে?" তারা জিজ্ঞাসা করল।

"সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস যা সাধারণ মানুষকে সারাক্ষণ তাড়া করে ফেরে," আমি বললাম, "আর তা হল – ভয়! আতঙ্ক ! যার কোনও আলো নেই, শব্দ নেই, যা কোনও যুক্তির ধার ধারে না, যা মানুষকে বধির করে ফেলে, অন্ধকারে ঢেকে ফেলে, অসহায় করে ফেলে! এটা করিডর থেকে আমার পিছু নিয়েছিল, এটাই লাল কামরায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল- "

আমি আচমকা থামলাম! হাঁফাচ্ছিলাম। হাতটা উঠে এসেছিল কপালে ব্যান্ডেজের ওপর। সবাই স্তব্ধ হয়ে ছিল।

তারপর ঘোলাটে চশমা পরা বুড়ো মানুষটা বলল, "আমি জানতাম। এটা সেটাই। এটা তাহলে সেটাই। সেই অন্ধকারের শক্তি। এই অন্ধকারের শক্তি ওখানে লুকিয়ে আছে। দিনের বেলা এটা লুকিয়ে থাকে যবনিকার অন্তরালে। সন্ধে হলেই এটা ছড়িয়ে পড়ে করিডোরে, গুঁড়ি মেরে থাকে, তোমার পিছু নেয়। এমনভাবে , যাতে তোমার ঘাড় ঘোরানোর সাহসটাও না থাকে। ভয় আছে ঐ ঘরে। কুৎসিত কালো ভয়, আর থাকবেও – যতদিন পর্যন্ত এই প্রাসাদে পাপ থাকবে। "

ছবিঃ শিমুল

রামছাগলের ছা

অচিন্ত্য সুরাল

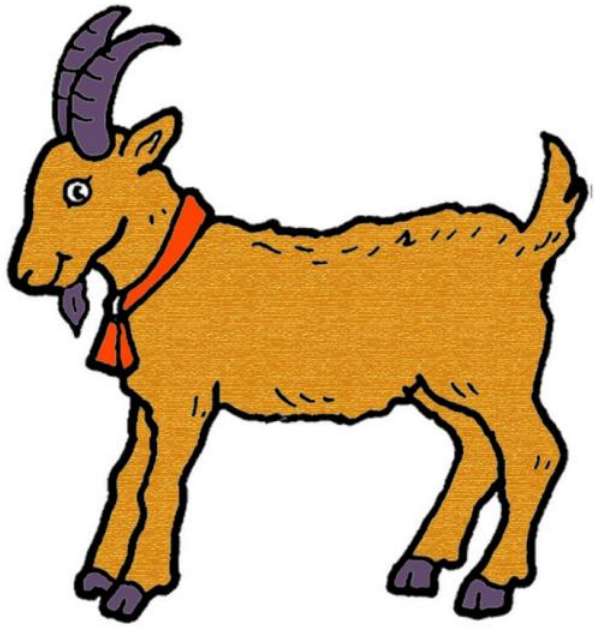

এক একজন থাকে না একটু পাগলাটে ধরণের হয় ! আমাদের এই রামছাগলের ছা সেইরকম। সবাই যেমনটা ভাবে, যেভাবে থাকে সে তা নয়। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে যে রামছাগলরা নাকি বোকা, তাদের নাকি একটুও বুদ্ধি নেই। তারা এই পৃথিবীর কিছুই বোঝে না। তাই সবাই রামছাগলকে খুব হ্যাটা করে। বোকা মানুষ দেখলে লোকে বলে 'ওটা একটা রামছাগল।' এইসব জেনে আর শুনে রামছাগলের ছা ঠিক করল এই বদনাম ঘোচাতে হবে। তা করতে হলে তাকে অনেক কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে। তবেই তো বাড়বে বুদ্ধি। আর কে না জানে যে জানতে হলে, শিখতে হলে ঘরের ভিতরে থেকে কিম্বা আশেপাশে ঘুরঘুর করে কিছু হবে না। বেরিয়ে পড়তে হবে। পৃথিবীটা যে কত বড় আর সেখানে কতরকম কান্ড ঘটছে তার খবর রাখতে হবে চোখ-কান খোলা রেখে। সবকিছু দেখতে হবে শুনতে হবে, যা দেখল বা শুনল তা নিয়ে ভেবে ঠিক করতে হবে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। আর সেসব এলাকার সবাইকে শোনাতে হবে, বোঝাতে হবে।

মাকে গিয়ে তার ইচ্ছের কথা বলতে তার মা প্রথমে ব্যা ব্যা করে খুব কান্নাকাটি করল। কিন্তু ছা-এর জেদ দেখে তাকে অনেক আদর করে বলল, বাছা আমার, তুই যদি পারিস আমাদের বংশের এই বদনাম ঘোচাতে, তাহলে সবাই কী যে খুশি হবে আর তোকে রামছাগলের রাজত্বে রাজা বানিয়ে দেবে। তুই বেরিয়ে পড়- কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি। চোখ কান খোলা রেখে যত পারিস ঘুরে বেড়াবি আর যা দেখবি সব মনে রাখবি। তবে একটা কথা বলে রাখি- যেখানে সেখানে গান ধরিস না যেন। কারণ মানুষগুলো খুব সুবিধের নয়। মনে রাখবি-

‘রামছাগলের ছা
গাইলে গানের গা,
মানুষ বড় রাগ করে রে
কাড়বি না তাই রা’

মায়ের কথা মন দিয়ে শুনে বেরিয়ে পড়ল রামছাগলের ছা। আস্তে আস্তে তার চলা, ডানদিক, বাঁদিক ঘাড় ঘুরিয়ে সব দেখা, কে কী বলছে তা ভাল করে শোনা আর সবকিছু মনে রাখার চেষ্টা করা তার সারাদিনের কাজ। সে দেখে আর শোনে সবাই কেমন সাবধানে চলাফেরা করে যাতে কোনও বিপদ না আসে। কেমন করে বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ভাল করে বাঁচা যায় আর সবাই মিলে কেমন করে মজা করা যায়।

যেতে যেতে সে দেখল একটা পুকুর, তাতে বেশ জল টলটল করছে। একটা পানকৌড়ি মাঝে মাঝে এক জায়গায় ডুব মারছে আর সেখান থেকে খানিক দূরে আবার ভেসে উঠছে। রামছাগলের ছা খুব ভাল করে দেখল তাকে আর ভাবল বাঃ, এটা তো বেশ মজার লুকোচুরি খেলা। সে ভাবছে আর কান খাড়া করে রেখেছে। হঠাৎ শুনতে পেল জলের তলা থেকে উঠে আসা একটা কথা-

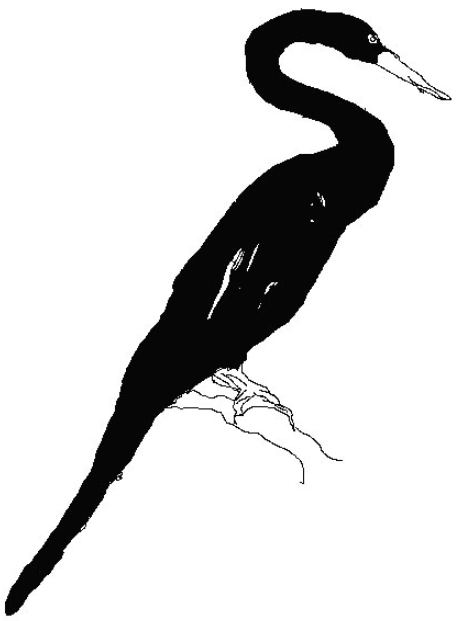

মাগুরমাছের মা
বলল, ‘বাছা আয় পালিয়ে
ওইদিকে দেখ যাচ্ছে দেখা
পানকৌড়ির পা’

কথাটা শুনে সে নিজের মনে মনে বলল, ওঃ, ওটা তাহলে পানকৌড়ির খেলা নয়। ও মাছ ধরার জন্য জলে ডুব দিচ্ছে। তাহলে কী করে খাবার ধরতে হয়, আর কী করে ধরা পড়া থেকে বাঁচতে হয় এটা একটা শেখার ব্যাপার। আর যদি কান ভাল করে খোলা রাখা যায় তাহলে জলের তলার কথাও বেশ শোনা যায়। কথাটা সে মনে রেখে এগিয়ে চলল।

পুকুরটা পার করে একটা ছোট মাঠ আর তারপরে মানুষের বাড়ি-ঘর। মাঠ দিয়ে কয়েকটা হাঁস তাদের বাচ্চাদের নিয়ে পুকুরের দিকে আসছিল। হঠাৎ দেখল আকাশ থেকে ঝপ করে নেমে এসে -

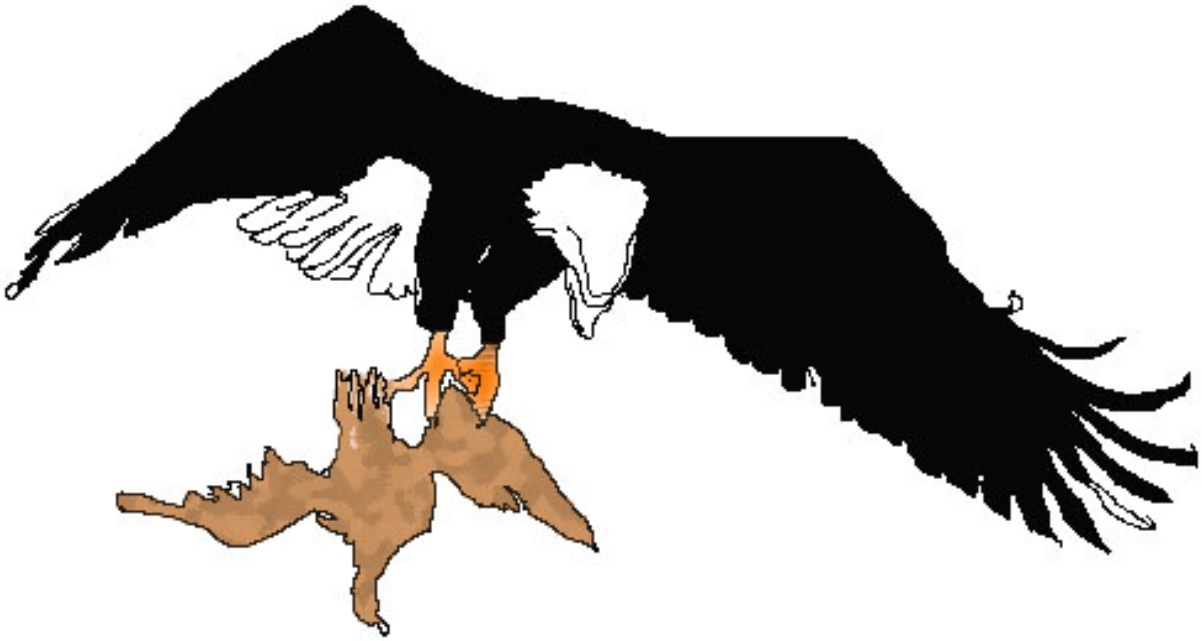

ছোঁ মেরে এক হাঁস ধরেছে
ঈগলপাখির পা,
ছটফটিয়ে খাচ্ছে খাবি
মুখটা হাঁসের হাঁ

রামছাগলের ছা ভাবল এতো অবাক কান্ড। ঈগল তো আকাশে উড়ে বেড়ায় কত উঁচুতে। অত উঁচু থেকে ঠিক খেয়াল করেছে যে হাঁসগুলো মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে চোখের নজর যদি জোরালো করা যায় তাহলে খাবার পাওয়ার অসুবিধে নেই। সে কথাটা মনে মনে তিন-চারবার আওড়ে মুখস্থ করে ফেলল আর তারপরে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। বেশ গরম লাগছিল, তেষ্টাও পেয়েছে। কিন্তু এখন পুকুরটা অনেক পিছনে পড়ে আছে। এমন সময় কোত্থেকে যেন মেঘ করে এল। বোধহয় হালকা ঝিরঝির হচ্ছে ওপরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কয়েকটা চাতক পাখি একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছে। তারা খুব খুশি মনে হল। এদিকে সামনে একটা বড় তেঁতুল গাছ। তার ডাল থেকে মাটির দিকে মুখ করে ঝুলছে অনেক বাদুড়। কানে কীসব আওয়াজ আসতেই সে কান খাড়া করল আর তেঁতুল গাছের ওপর থেকে আসা কথাগুলো শুনতে পেল-

একলা তোরা জল খাচ্ছিস-
বাদুড় বলে, 'বাঃ
আমাদেরও তেষ্টা মেটা-
চাতক ফিরে চা'

রামছাগলের ছা তখন বুঝতে পারল চাতকগুলো এইজন্যেই খুশি। বৃষ্টি পড়ছে না, শুধু হাওয়ায় যেটুকু জল আছে তারা সেটাই উড়ে উড়ে খেতে শিখে নিয়েছে। এটাও বেশ একটা ভাল শেখার জিনিস। যদি এমন কোথাও যেতে হয় যেখানে জলের অভাব সেখানে এই বুদ্ধিটা কাজে লাগবে। এরপর সে সামনের দিকে আরও এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। কানে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ আসছিল অনেকক্ষণ থেকে। ভাল করে ডানদিক বাঁদিক চেয়ে একটা মজার ব্যাপার দেখতে পেল। কয়েকটা কেন্নো পরপর লাইন দিয়েছে এমনভাবে যে মনে হচ্ছে এক একটা কেন্নো রেলগাড়ির এক একটা কামরা। কিন্তু রেলগাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে চেয়ে তার বেশ মজা লাগছিল আর ভাবছিল রেলগাড়িটা চললে বেশ ভাল লাগবে। ওমা হঠাৎ দেখে কি কোত্থেকে এক গুবরেপোকা গুটিগুটি এসে হাজির, আর তারপরেই-

পিছন থেকে মারল ঠেলা
গুবরে পোকার পো
সামনে জুড়ে ভোমরা বসে
বাজিয়ে দিল ভোঁ

ব্যাস, রেলগাড়ি চলতে লাগল। দেখে রামছাগলের ছা-এর খুব ফুর্তি। সে বুঝতে পারল অনেকে একসঙ্গে জড়ো হলে ছোটরাও অনেক বড় কাজ করতে পারে। সমস্ত ব্যাপারটা সে খুব ভাল করে মনের মধ্যে এঁকে ফেলল। ফিরে গিয়ে সে সবাইকে এই কথাটা বোঝাবে আর সবাইকে এককাট্টা করে ভাল ভাল কাজ করবে।

মনে বেশ খুশি নিয়ে সে আবার চলল। একটা জায়গায় ডোবার ধারে কিছু ঝোপঝাড় দেখে তার খিদে পেল। সে ঘাস, মনসা গাছ আর কয়েকটা খোলামকুচি আর তারপর ডোবার জল খেয়ে একটা ঢেকুর তুলে ভাবল এবার একটু জিরিয়ে নিই। একটা ছায়া মতন জায়গা দেখে সে বসে সামনের দিকে চাইতেই দেখতে পেল একটু দূরে একটা ব্যাঙ কেমন যেন ভয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে। নড়তে পারছে না যেন। তার ভয়ের কারণ কী এটা সে বসে বসে ভাবতে লাগল। একটু পরেই একটা হিসহিস শব্দ শুনে সে যা দেখল তাতে তারও বুকটা ভয়ে কাঁপতে লাগল। সাপটা স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে ব্যাঙটার দিকে। এক্ষুণি খপ করে ধরবে। আচমকা সেখানে হাজির হল একটা নেউল। তার পায়ের খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাকে সাপটা বোধহয় দেখতে পায়নি। তাই-

ফোঁস করে সেই কেউটে বলে,
‘কে রে ওটা, কে ?’
নেউল বলে, ‘থাকলে সাহস
ব্যাঙটাকে তুই নে’

তারপর সেই সাপে-নেউলে ভীষণ লড়াই হল। সেই লড়াই দেখে সে শিখে নিল কী করে ছোবল কিম্বা থাবা মারতে হয় আর কীভাবে তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়। মনে মনে বেশ এঁচে নিল যদি কুকুর তার ঘাড়ে লাফাতে আসে তাহলে শিঙের টুঁ দিয়ে কেমন করে নিজেকে বাঁচাবে। তার মনে তখন বেশ একটা বীর বীর ভাব। ফিরে গিয়ে এই ব্যাপারটা রামছাগলের বংশের ছেলেমেয়েদের শেখাতেই হবে।

এইসব দেখেশুনে নিজের বুদ্ধি অনেকটা বাড়িয়ে রামছাগলের ছা ফিরে এল তার ঘরে। রামছাগলের বংশের সবাই তখন দৌড়ে এল তার কথা শুনতে। সে তখন পিছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে সামনের পা নেড়ে নেড়ে

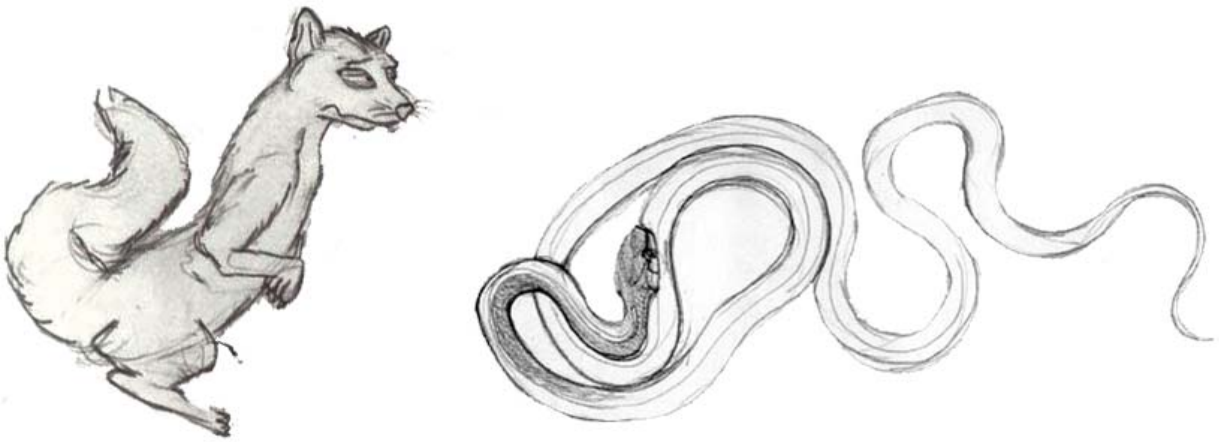

সবাইকে বলল সে কী কী দেখেছে আর শুনেছে আর শিখেছে। সে যে সত্যিই অনেক কিছু জেনেছে আর শিখেছে এটা বেশ বোঝা গেল, যখন সে আরও বলল ‘যারা বড় হয়ে গেছে তাদের মাথার ঘিলু নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের আর শেখার কিচ্ছু নেই। তাই তারা যেন ছোটদের নিজের নিজের বাড়ির মধ্যে আটকে না রাখে। সত্যিকারের শিখতে হলে জানতে হলে ছোটরা যেন বেরিয়ে পড়ে। না হলে রামছাগলের বংশের বদনাম মোছা যাবে না।’ সব ছোটরা তখন রামছাগলের ছা’এর জয়ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল এক একদিকে। তারাও ঠিক করে ফেলল যে তারা দেখবে, শুনবে, জানবে আর শিখবে আর তারপরে ভাল রামছাগল হবে, মানুষ নাই বা হল।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

সঞ্জীব চ্যাটার্জি

রিতানের আজ তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। রাস্তায় ফিরতে ফিরতে প্ল্যানটা করেই ফেলল রিতান। দিদির এখনো স্কুল ছুটি হতে প্রায় এক দেড় ঘণ্টা বাকি। আজ সে দিদির খেলনা নিয়ে খেলবে।

এমনিতে তার অনেক খেলনা তবু দিদির পুতুলগুলো দিদি তাকে ছুঁতে দেয় না। এই নিয়ে তো প্রায় প্রতিদিন ঝগড়া হয়,এমনকি অনেকবার মারপিট ও হয়েছে। যাই হোক বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় পনেরো মিনিট গেল,মা দরজা খুলে বলল "কিরে? তোর ছুটি হয়ে গেল?"

রিতান বলল "হ্যাঁ।"

"আর ফুলটুসি?"

রিতান হেসে বলল, "ওর এখনো হয়নি।"

ফুলটুসি মানে রিতানের দিদি। মায়ের আর বুঝতে বাকি রইল না রিতান এবার নিশ্চয় দিদির খেলনাগুলো আলমারি থেকে বের করতে বলবে।

"খাবি না?"

"না। খেলনাগুলো দাও, আমি খেলব।"

রিতানের মা বলল, "ঠিক আছে।" এই বলে কয়েকটা খেলনা আলমারি থেকে বের করে দিতে,তা নিয়ে রিতান চলে গেল বারান্দায়। রিতান এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে আর ফুলটুসি ফাইভে। রিতান ভাল করেই জানে তার দিদি নিজের জিনিস কাউকে ছুঁতে দেয় না। একবার পাশের বাড়ির বল্টুদা কি যেন একটা বই

নিয়ে গিয়েছিল মাকে বলে। স্কুল থেকে ফিরে ফুলটুসি সেই নিয়ে মায়ের সাথে কথা বন্ধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কি চিৎকার, ‘‘আমার জিনিস আমাকে না বলে কেন দেবে তোমরা? আজ থেকে বলে দিচ্ছি আমার জিনিস কাউকে দেবে না। এমন কি রিতানও যেন না ছোঁয় বলে দিলাম।’’

সেই থেকে রিতান একটা পেন দরকার হলেও ফুলটুসির কাছে চায় না। তবে মাঝে মাঝে ওর খেলনাগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে। রিতানের মাও কিছু বলে না। বরং লুকিয়ে দু একটা খেলনা ওকে দিয়েছে। ফুলটুসির তো অনেক খেলনা! তাই বুঝতেও পারে নি।

সেদিন কিন্তু ফুলটুসি কখন চলে এসেছে খেয়ালই করেনি রিতান। বেশ নিজের মনেই খেলছিল হঠাৎ পিঠে বলের মতো সপাটে কি একটা লাগলো বেশ জোর। ঘুরে দেখে দিদি রুদ্রমূর্তিতে দাড়িয়ে।

‘‘কি রে রি,’’ দিদি ওকে রি বলেই ডাকে, ‘‘তুই আমার খেলনাতে হাত দিয়েছিস কেন? ওঠ, ওঠ বলছি এখুনি!’’

রিতান ছুটে চলে যায় মায়ের কাছে, ‘‘মা দিদি আমাকে মারল’’ এই বলে কাঁদতে শুরু করে। মা তার চোখের জল মুছিয়ে বলে, ‘‘তোকে তো অনেক বার বারণ করেছি। শুনিস নি।’’

‘‘কি? অনেক বার? মানে আমার খেলনা নিয়ে এঘরে অনেকবার খেলা হয়েছে আর আমি জানি না?’’ ফুলটুসি চিৎকার শুরু করে, ‘‘এসব কি শুরু করেছ? আমাকে একটুও ভালবাসোনা তোমরা। আমার কোনো স্বাধীনতা নেই এ ঘরে,’’ বলতে বলতে নিজের ঘরে চলে গেল আর দুম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রিতান এবার মুখ খুলল, ‘‘ মা, দিদির জন্য যে ম্যাগিটা বানিয়েছ সেটা আমাকে দিয়ে দাও। ও তো আজ আর খাবে না!’’

মা রেগে গেল, ‘‘তোরা দুটোই সমান,’’ এই বলে চলে গেল রান্নাঘরে।

রিতান ফুলটুসির বন্ধ দরজায় একবার গিয়ে বলল, ‘‘তুই খাবি কি? না হলে আমি তোর ম্যাগিটা খেয়ে নিচ্ছি।’’

‘‘যা খুশি কর। খা, খেয়ে মর।’’

ততক্ষণে রিতানের বাবা ফিরে এসেছেন। ঘরের আবহাওয়া বুঝে উঠতে সময় লাগলনা। রেগে বললেন, “কি রে? তোরা আবার ভাইবোনে ঝগড়া শুরু করেছিস? তোদের নিয়ে আর পারলাম না। কতবার বলেছি ভাইবোন মিলেমিশে থাক। পাশে বল্টুরাও তো আছে। ওদের দেখে শেখ।”

এমন সময় দরজার বেলটা বেজে উঠল। রিতানের বাবা বললেন, “ দেখ তো রি কে?”

রিতান দরজা খুলেই লাফিয়ে উঠল, ‘‘বাবা, বেণুমামা এসেছে। বেণুমামা মানে রিতানের মায়ের মামাতো ভাই। রিতানদের নিজের কোন মামা নেই তবে বেণুমামা ওদের খুব প্রিয়। যখনই কলকাতা আসেন বেণুমামা একবার না একবার রিতানদের বাড়িতে আসএনই। বেণুমামার মস্ত বড় গুণ হল উনি খুব ভাল গল্প বলেন আর যতবার আসেন দুজনের জন্যেই নতুন কিছু খেলনা নিয়ে আসেন।

তাকে দেখে বাবা বললেন, ‘‘আরে বেণু কেমন আছিস?’’

‘‘ভালো জামাইবাবু। তোমরা সব ভালো তো ? ফুলটুসিকে দেখছি না যে? স্কুল থেকে ফেরেনি?’’

‘‘ঝগড়া হয়েছে দুই ভাইবোনের তাই দরজা বন্ধ করেছে।” বাবা মাথা নাড়ল।

‘‘কী নিয়ে ঝগড়া?’’ বেণুমামা জিজ্ঞেস করল।

‘‘সামান্য পুতুল কে খেলবে তাই নিয়ে।’’

“বুঝেছি,” বেণুমামা দরজায় গিয়ে টোকা মারল, “ ফুলটুসি আমি বেণুমামা এসেছি রে।”

কিছুক্ষণ পর দরজা খোলে ফুলটুসি।

“ও বেণুমামা কখন এলে? এবারে কী এনেছ আমার জন্য?”

“তোর জন্য না তোদের দুজনের জন্য।”

“সে তো জানিই। তবে আগে আমারটা দাও তারপর ওকে যা দেবার দিও। আমি ছুঁতেও যাব না। আমি কারো জিনিস ছুঁই না,” মুখ বাঁকিয়ে বলল ফুলটুসি।

“তাহলে তো ভারি মুশকিল হল! এটা তো একজনে খেলা যাবে না!”

“এ আবার কীরকম খেলা? ব্যাট বল এনেছ নিশ্চয়? ওসব ছেলেদের খেলা।”

“আরে না না। এটা ব্যাট বল না। এটা বুদ্ধির খেলা। যার বুদ্ধি বেশি সেই জিতবে।”

“তাহলে তো আমিই জিতবো।”

রি বলে, “হ্যাঁ তোর বুদ্ধি তো আমার জানা আছে। কত পেয়েছিস এবার অঙ্কে?”

ফুলটুসি রেগে গিয়ে বলে, “তুই নিজেরটা দেখ । আমারটা আমি বুঝবো। মামা বের করো না কী এনেছ?”

মামা ব্যাগ খুলে বার করে একটা মোটা খাতার মতো বাক্স বের করলেন। খুলতেই দেখা গেল তাতে অনেকগুলো সাদা কালো চতুর্ভুজ আঁকা।

“এটা কী মামা?” রি জিজ্ঞাসা করে।

“এটার নাম দাবা। তোরা বড় হচ্ছিস। এবার পুতুল খেলা শেষ। এই হল মন্ত্রী, রাজা, নৌকা আর বোড়ে মানে সৈন্য।”

“ধুস! এটা আমাদের না। বড়োদের খেলা,” ফুলটুসি বলে।

“কে বলল? জানিস কত ছোটো বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া যায়?”

“গ্র্যান্ডমাস্টার মানে?”

“গ্র্যান্ডমাস্টার মানে হল সেরা দাবাড়ু। একটা খেতাব, উপাধি।”

“ও বুঝেছি। যেমন বিদ্যাসাগর,” রি বলল।

বেণুমামা একটু থেমে বলে, “উমম্ অতটা না হলেও খানিকটা তো বটেই।”

“খেলাটা তুমি শিখিয়ে দেবে?”

“নিশ্চয়।”

এবার মা বলে ওঠে, “বেণু আগে একটু চা টা খা, তারপর ওদের নিয়ে বসবি। না হলে ওরা আর ছড়বে না তোকে।”

“তাতে কী হয়েছে? তুই আননা এখানেই। আমি শেখতে শেখাতে খাব, আর হ্যাঁ সাবুর পাঁপড় কয়েকটা ভাজ তো।”

এবার একসাথে রি আর ফুলটুসি বলে উঠল, “আমার জন্যেও, আমার জন্যেও।”

“আচ্ছা বাবা তোদের জন্যেও ভাজছি।”

বেণুমামা আবার শুরু করে, “শোন, এই দাবা খেলায় আসল খেলাটা খেলে ঘোড়া।”

রি বলে, “ঘোড়া?”

বেণুমামা ঘাড় নাড়েন। " হুম। দেখছিস না বাক্সের ওপর ঘোড়ার ছবি! দেখ একটা ঘোড়া রাখলাম একটা ঘরে। এবার বোঝাচ্ছি এটা কত দিকে যেতে পারে—"

বেণুমামা শেখাতে থাকে। ইতিমধ্যে চা পাঁপড় এসে গেছে। দুই ভাইবোন সব চাল শিখে প্রথমবার খেলার জন্য গুটি সাজায়। বেণুমামা চা আর খবরকাগজে মন দেয়।

হঠাৎ ফুলটুসি আর রি লক্ষ করল, দাবাটা যেন ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে আর ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে সাদা হাতি ঘোড়া আর অনেক সৈন্য। কয়েকটা সৈন্য তাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "তোমরা রি আর ফুলটুসি না ? আমাদের সাদা রাজা তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। তোমরা এখনি চলো।"

রি বলল, "কিন্তু মা যে পাঁপড় আনতে গেল তার কী হবে?"

"তোমরা ওখানে অনেক খাবার খাবে আর অনেক খেলনা পাবে।"

রি আর ফুলটুসি তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। ফুলটুসি বলল, "আচ্ছা আমরা যদি তোমাদের সাথে যাই মা রাগ করবে নাতো?"

সৈন্যরা বলল, "কেন করবে? আমরা ঠিক বুঝিয়ে দেবো তোমার মাকে।"

তারপর দুই ভাইবোন দাবার উপর বসে উড়ে চলল দাবারাজের দেশে। রাস্তায় যেতে যেতে তারা কত রকমের গাছ, কত রকমের ফুল দেখল! কয়েকটা ফুল ফুলটুসি তুলে তার স্কুল ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল। অনেক দূর উড়তে উড়তে শেষে তারা পৌঁছল দাবা রাজার দেশে। সেখানে তারা দেখল সবাই সাদা। হাতি ঘোড়া, সৈন্য, এমনকি নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলোর রংও সাদা। সাদা রানি ওদের কাছে এগিয়ে আসতেই রি বলল, "আচ্ছা তোমরা সবাই সাদা কেন?"

রানি হেসে বলল, "রিতান, এটা সাদা রাজার দেশ। এখানে সবাই সাদা। আর ওই দূরে পাহাড় দেখছ, ওখানে থাকে কালো রাজা।"

ফুলটুসি জিজ্ঞেস করল, "তোমরা যুদ্ধ করো?"

এবার রাজা উত্তর দিলেন, "তা কেন করবো? আমরা খালি যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি। কিন্তু হ্যাঁ একটা কথা মনে রেখো। এই যে তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো,মানে সাদা ঘরটার মধ্যে—"

এতক্ষণ তো লক্ষই করে নি রিতান আর ফুলটুসি! রাজা বলাতে তারা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে মাটি বলে কিছু নেই। সব সাদা কালো ঘর কাটা। আর এখানের সবাই দাঁড়িয়ে আছে সাদা ঘরের ভেতর। রিতান আর ফুলটুসি রাজার মুখের দিকে তাকাল।

রাজা বলল, "এই কালো ঘরগুলো কালো রাজার। তোমরা কিন্তু কেউ ভুলেও ওই ঘরে পা রেখো না।"

রিতান আর ফুলটুসি বলল, "ঠিক আছে রাজামশাই।"

রানি বলল, "তোমরা এখানে খুব মজা কর। যতদিন খুশি থাকো আর যেদিন বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগবে সেদিন ওই যে পশ্চিমের দিকে বড়ো ফটকটা দেখছ ওটা দিয়ে বেরোবে, তাহলেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে।"

রিতান আর ফুলটুসি বলল, "ঠিক আছে রানিমা।"

এইভাবে রিতান আর ফুলটুসি থেকে গেল সাদা রাজার দেশে। সেখানে তারা প্রতিদিন নতুন নতুন খেলনা পায়, হাতির পিঠে ঘুরে বেড়ায়,নৌকোতে চড়ে, আর রাজার অতিথিশালায় ভালো মন্দ খাবার খায়। এইভাবে বেশ ভালই কাটছিল। তবে ফুলটুসি আর রি এর ঝগড়া কিন্তু কমে নি। প্রতিদিনই তাদের কিছু না

কিছু নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকত।একদিন ফুলটুসি আর রিতান বোড়েদের সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করার সময় খুব ঝগড়া বেধে গেল দুজনের। কেউ আর থামাতে পারে না। ঝগড়া শেষে মারপিট হবার উপক্রম,এমনসময় ফুলটুসির পা পড়ে গেল কালো ঘরে, আর যেই না পড়া অমনি ফুলটুসি একটা মাটির বোড়ে হয়ে গেল। সবাই চিৎকার করল। চিৎকার শুনে সাদা রাজা রানি ছুটে এল। বলল, "হে ভগবান! তোমাদের বলেছিলাম না কালো ঘরে পা রাখবে না!"

রিতান বলল, "দিদি আমার সাথে ঝগড়া করছিল, তারপর ভুল করে পা রেখেছে।

এদিকে ফুলটুসি কাঁদতে শুরু করল আর সাদা রাজাকে বলল, "সাদা রাজা আমাকে মানুষ করে দাও। আমি আর কখনো ঝগড়া করব না।"

রাজা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটা উপায় আছে। তোমরা যদি দুজন ওই পশ্চিমের ফটকটা দিয়ে একসাথে বেরিয়ে যাও তাহলে আবার ফুলটুসি মানুষ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে যে!"

রিতান বলল, "কী মুশকিল?"

রাজা বলল, "ফুলটুসি কালো ঘরে পা দেওয়াতে ওই ফটকটা কালো রাজা কব্জা করেছে। ওখানে এখন একটা নৌকা সোজাসুজি আর একটা হাতি কোনাকুনি পাহারা দিচ্ছে।"

রিতান বলল, "তাহলে কী হবে?

রানিমা তখন বলল, "আমরা তোমাদের একটা সাহায্য করতে পারি। চাইলে রিতান যেকোনো একজনকে নিতে পারে আমাদের মধ্যে থেকে। তারপর মাটির ফুলটুসিকে নিয়ে একসাথে পেরোলেই হবে। কিন্তু পার হতে হবে নিজেকেই আর কাকে সঙ্গে নেবে সেটা ঠিক করতে হবে রিতানকেই।"

রিতান ভাবতে থাকে। ভুল হয়ে গেলে আর উপায় নেই। বেণুমামার শেখানো চালগুলো ঝালাতে থাকে রিতান। ফটকটা পাহারা দিচ্ছে নৌকা আর হাতি, নৌকাটা সোজাসুজি যাচ্ছে, নৌকা পেরিয়ে গেলেই কোনাকুনি এসে যাচ্ছে হাতি। নাহ্ কিচ্ছু মাথায় আসছে না রিতানের। কী করে পেরোবে সে? সোজাসুজি পেরোতে গেলেই নৌকা আর কোনাকুনি গেলেই হাতি!

কাকে নেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না রিতান, তখন হঠাৎই বেণুমামার একটা কথা মনে পড়ে গেল তার, "শোন, এই দাবা খেলায় আসল খেলাটা খেলে ঘোড়া... দেখ একটা ঘোড়া রাখলাম একটা ঘরে... এবার বোঝাচ্ছি এটা কত দিকে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ... পেয়েছি!!" রিতান লাফিয়ে উঠল, "রাজামশাই, আমাকে একটা ঘোড়া দিন।"

"ঠিক আছে। তাই হোক," এই বলে রাজা হাততালি দিতেই ফুটফুটে সাদা একখানা ঘোড়া এসে হাজির হল। মাটির ফুলটুসিকে তুলে নিয়ে চেপে বসে রিতান তার পিঠে। তারপর তীরের বেগে ছুটে গেল ফটকের দিকে।

ঘোড়া আস্তে দেখেই কালো নৌকা সোজাসুজি আর কালো হাতি কোনাকুনি ওদের আটকাতে এগিয়ে এল। রিতান ঘোড়ার লাগাম টেনে প্রথমে বাঁ দিকে একটা আড়াই ঝাঁপ তারপর ডানদিকে একটা আড়াই ঝাঁপ মেরে সোজা সামনে আড়াই ঝাঁপ, কালো হাতি আর নৌকার নাগালের বাইরে।

ওমনি ঘোড়ার উপর ফুলটুসি আবার মানুষ হয়ে গেল। তারা এসে পৌঁছে গেল এক্কেবারে ঘরের বারান্দায়। রি কে গলা জড়িয়ে ধরে ফুলটুসি বলল, "ভাই সোনা আমি আর কোনদিন তোর সাথে ঝগড়া করব না।"

তারপর থেকে রি আর ফুলটুসি সব খেলনা ভাগ করে খেলে আর কোনোদিনও ঝগড়া করে না। ওদের বাবা মাও আর বকে না। রি আর ফুলটুসি এখন অপেক্ষা করে আছে পরেরবার বেণুমামা কী নিয়ে আসে তার জন্য।

ছবিঃ দীপংকর

ভীষণমামা সিঁড়ি দিয়ে উঠলে আমরা দোতলার ঘর থেকেই টের পেয়ে যাই ও আসছে। প্রত্যেকটা সিঁড়ির ধাপে দুপায়ে দাঁড়িয়ে তারপর নেক্সট স্টেপে পা ফেলে। ওর ভারী শ্বাস- প্রশ্বাসের এবং পায়েরও ভারী আওয়াজ সহজেই কানে আসে। মামা ১৫৭. ৬ সেমি লম্বা। ওজন পঞ্চাশ- পঞ্চান্ন কেজির বেশি হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু আপাতত সেঞ্চুরি পার করে একটু থিতু হয়েছে ১০৩. ৫ কেজিতে। তার মানে ওর বডি মাস ইনডেক্স ৪১. ১। ওবেসিটির চূড়ান্ত।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি আমার ঘরে লাইফ সায়েন্স পড়ছিলাম। মা আমার ঘরেই বসে ছিলেন। পুজোর রেকাবি ঢাকা দেওয়ার খঞ্চপোশ বানাচ্ছিলেন মা –কাঁটা আর সাদা সুতো দিয়ে। মায়ের হাতের টানাপোড়েনে সুতোর লাচিটা মেঝের এধার থেকে ওধার গড়াচ্ছিল –হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ওটা জ্যান্ত। মা বুনতে বুনতেই আমাকে বললেন, "কি ব্যাপার বল তো? সাগর আজ একটা করে স্টেপ জাম্প করে সিঁড়ি উঠছে...! কোনদিন এমন করে না তো। মনে হচ্ছে খুব টেনশনে আছে...।"

ভীষণমামার নাম কিন্তু মোটেই ভীষণ নয়, তাঁর নাম ভবসাগর সেন –সংক্ষেপে বি. এস সেন, সেখান থেকে আরও সংক্ষেপে –ভীষণ –অবিশ্যি এর পিছনে তাঁর মেদবহুল শরীরটিও অনেকাংশে দায়ী। ভোলাভালা, সরল সজ্জন এই মানুষটি আমার মায়ের সত্যি সত্যি ভাইও নন। বিয়ের পর আমার মা যখন এ পাড়ায় আসেন তখন বাবার চেয়ে বয়সে ছোট পাড়া- প্রতিবেশীরা মাকে স্বাভাবিকভাবেই বৌদি বলতেন। ভীষণমামার নাকি সেটা পছন্দ হয় নি, মাকে বলেছিল, "আমি সকলের মতো আপনাকে বৌদি ডাকব না...।" বয়সে অনেকটাই ছোট গুবলু- গাবলু লাজুক ছেলেটির কথায় মা হেসে ফেলে বলেছিল, "ওমা, তাই নাকি? তা হলে কি বলে ডাকবে?"

"তুমি আমার দিদি হলে বেশ হত, আমি তোমাকে দিদি ডাকব, ব্যস।"

"বাঃ, সে তো বেশ মজা হবে। আমরাও তো দুই বোন –কোন ভাই নেই। সেই ভালো, আজ থেকে তুমি আমার ভাই হলে...।"

এসব ঘটনা তো হয়ে গেছে আমার জন্মের অনেক আগে। ভীষণমামাকে আমরা তাই আমাদের সত্যিকার মামা বলেই জানি।

"দিদি, কী করছ? প্রতিমা বলল তুমি ওপরের ঘরে রয়েছ।"

বলতে বলতে ভীষণমামা ঘরে ঢুকলেন। মা মুখ না তুলেই বললেন, "এতক্ষণ তোর পায়ের শব্দ শুনছিলাম, এখন তোর গলা শুনলাম। বহুদিন ধরে বলছি ওয়েটটা এবার কমা, সাগর। এই বয়সেই বড়ো অসুখে পড়ে নিজেও ভুগবি –সব্বাইকে ভোগাবি।"

"চেষ্টা কম করছি ভাবছ? অনেক চেষ্টা করছি। খাওয়া- দাওয়া তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। রাত্রে মাত্র চোদ্দটা রুটি খাই। তার ওপর আলু খাওয়া অলমোস্ট ছেড়ে দিয়েছি বলতে পারো। তরকারির আলু তো খাইই না, ভাতের সঙ্গে শুদ্ধু আলুভাতে আর লুচি বা পরোটা হলে আলু চচ্চড়ি। ব্যস আর নো আলু। দ্যাখো না, কদিনের মধ্যে কেমন চিমসে মেরে যাই। তখন আমাকে চিনতেও পারবে না দিদি।"

"এই তোর খাওয়া- দাওয়া ছেড়ে দেওয়ার নমুনা? বললে কথা শুনবি না, সে আমি জানি। কারণ আমি তো আর তোর সত্যি সত্যি দিদি নই, শুনবি কেন? নিজের দিদি হলে ঠিক শুনতিস।"

"এই দ্যাখো, কী কথায় যে কী কথা তুমি এনে ফেলো না, দিদি...।"

"থাক ওসব আর আমায় শুনিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বল কী হয়েছে? মনে হচ্ছে খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছিস?"

মায়ের এই কথায় আমিও ঘাড় ঘুরিয়ে ভীষণমামাকে দেখলাম। কোথাও দুশ্চিন্তার কোন লক্ষণ ধরতে পারলাম না। কিন্তু ভীষণমামার অবাক হওয়া মুখ দেখে বুঝলাম মা ঠিকই বলেছেন। মা কিন্তু একমনেই হাতের কাজ করছিলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণমামা বললেন, "তোর মা কী করে সব ধরে ফেলে বল তো? কিছুই বললাম না, কিছুই করলাম না –কিন্তু ঠিক ধরে ফেলল আমি ঝামেলায় পড়েছি?" আমি হেসে ঘাড় নেড়ে বললাম, "কার মা সেটা দেখ। আমারই তো মা।"

মা কিছু বললেন না। খুব মন দিয়ে খঞ্চপোশ বুনছিলেন –কাঁটা আর সুতোর দ্রুত ওঠানামায় সুন্দর নকশা বেড়ে উঠছিল মায়ের হাতে। গম্ভীর মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ভীষণমামা বললেন, "জানো দিদি, পরপর দুদিন আমাদের দোকানে চুরি হয়ে গেল।"

"সে কি? কবে?"

"কাল আর আজ।"

"কি করে?"

"সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।"

"তোদের দোকানে তো সিসিটিভি ইনস্টলড রয়েছে, না ? তাতেও ধরা পড়ে নি?"

"সেখানেই তো রহস্য। কালকে এবং আজকেও –দুবার মিনিট পনের কুড়ির জন্য কারেন্ট ছিল না। মনে হচ্ছে সেই সময়েই ঘটেছে ব্যাপারটা।"

"তোদের জেনারেটর নেই?"

"না। ইনভার্টার আছে। তাতে কিছু লাইট জ্বলে। এসি আর সিসিটিভি চলে না। আজকাল লোডশেডিং তো তেমন হয় না।"

"যে জিনিসগুলো হারিয়েছে তার কিরকম দাম হতে পারে?"

"কাল একটা হীরে বসানো পেন্ডেন্ট আর আজ একটা হীরের আংটি। দুটো মিলিয়ে মোটামুটি সাড়ে তিনতো হবেই।"

"সাড়ে তিন হাজার?" আমি জিগ্যেস করলাম। মা খুব চিন্তান্বিত মুখে উত্তর দিলেন, "দূর বোকা, লাখ।" একটু পরে মা আবার বললেন, "আচ্ছা, তোরা কি সিইএসসিতে ফোন করেছিলি? ওইসময় ওপাড়ায় লোডশেডিং হয়েছিল কি?"

"না। সিইএসসিতে ফোন করিনি। তবে আশেপাশে কোন দোকানেই কারেন্ট যায় নি, আমাদেরটা ছাড়া।"

"শিয়োর?"

"হ্যাঁ গো, দিদি, শিয়োর।"

"হুঁ। তার মানে লোডশেডিং নয়।"

'না।"

"আচ্ছা, দুদিন কি একই সময়ে কারেন্ট চলে গিয়েছিল?"

"না। কালকে এই ধরো সাড়ে বারোটা নাগাদ। আর আজ তিনটের একটু পরে।"

"কী করে রেস্টোরড হল?"

"মানে?"

"মানে, কী করে আবার কারেন্ট এলো?"

"মেন সুইচের দুটো কিটক্যাট মিসিং ছিল।"

"কাল এবং আজ – দুদিনই?"

"দুদিনই। আমাদের দোকানের আট দশটা দোকান পরেই "বিজলি" – ইলেক্ট্রিক্যালসের দোকান আছে – সেখান থেকে নতুন কিনে লাগাতে হয়েছে। আমাদের দোকানের সজল কিনতে গিয়েছিল, তাকে "বিজলি"র একজন সেলসম্যান বলেছে, "কীরে, রোজ দুটো করে কিটক্যাট কিনছিস – তোরাও ইলেক্ট্রিকের দোকান খুলবি নাকি?"

মা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলেন। তারপর আবার জিগ্যেস করলেন, "পুলিশে খবর দিয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কিছু বলল?"

"কী আর বলবে? দোকানের সবাইকে এক এক করে জেরা করল। বিশেষ করে পাঁচজন কর্মচারি, দুজন সিকিউরিটি আর সজল – চা- টা দেয় ফাই ফরমাস খাটে। আমাদেরও সকলকে।

"তোদের সকলকে মানে? কে কে?"

"বাবা, জেঠু, বড়দা, মেজদা আর আমি।"

"আর কর্মচারি পাঁচজন?"

"তিনজন বহুদিনের পুরোনো – আমি জ্ঞান হয়ে থেকে দেখে আসছি - খুব বিশ্বাসী লোক। আর অন্য দুজন মেয়ে। দুজনেই বছর দুয়েক হল জয়েন করেছে কাউন্টার সামলানোর জন্য।"

"তোরা পাঁচজনই কি রোজ সারাদিন দোকানে থাকিস?"

"না, না। আমি আর বাবা রোজ প্রায় সারাদিনই থাকি। বাবা ক্যাশে বসেন। তবে কার্ড দিয়ে কিনতে হলে আমাকেই দেখতে হয়। কার্ড পাঞ্চ করার ব্যাপারটা বাবা ঠিক পারেন না। অন্যরা মাঝে মাঝে আসে। কাল বড়দা – মেজদা এসেছিল। আজ ওরা তো ছিলই – জেঠুও এসেছিলেন।

"কারেন্ট চলে যাওয়ার সময় কি ওঁনারা ছিলেন?"

একটু চিন্তা করে ভীষণমামা বললেন, "হুঁ ... কাল যখন কারেন্ট যায়,বড়দা মেজদা দুজনেই ছিল। কারেন্ট ফিরে আসার আগেই দুজনে একইসঙ্গে বেড়িয়ে গেল...।"

"এক মিনিট, কালকে ঠিক কখন প্রথম ধরা পড়ল যে নেকলেসটা খোয়া গেছে?"

"তা ধরো প্রায় সাড়ে চারটের সময়। তুমি তো জানো, দিদি, আমাদের শোরুমের বেশ সুনাম আছে, তার ওপর এখন বিয়ের সময় চলছে। এগারোটা সাড়ে এগারোটা থেকেই ভিড় বেশ জমে ওঠে। দুপুরের দিকে তো বটেই। আমাদের নানান আইটেম, ডিসপ্লে বক্সে বা ট্রেতে সাবধানে সাজিয়ে রাখা থাকে। ভিড়ের সময় তাড়াতাড়িতে, লোকজনের চাহিদা অনুযায়ী জিনিস দেখাতে গিয়ে ওই বাক্স আর ট্রেগুলো একটু এলোমেলো হয়ে যায় আর কি। ভিড়ের চাপ একটু কমলেই আবার আগের মতো সাজিয়ে ফেলি ঠিক ঠিক বাক্সে বা ট্রেতে। কাল সাড়ে চারটে নাগাদ দোকানে ভিড়টা একটু হালকা হতে ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ল নেকলেসটা নেই।"

"আর আজ?"

"কালকের মতো আজও কারেন্ট চলে যাওয়ায় আমাদের মনে একটা সন্দেহ হচ্ছিলই। কাজেই আজ কারেন্ট আসার পরই আমরা সব খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করি এবং তখনই ধরা পড়ে যে একটা হীরের আংটি মিসিং– তা ধরো প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ।"

"নেকলেস খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা কালকে যখন ধরা পড়ল,কে কে জানত?"

"কেন? দোকানের সবাই। এমনকি দুজন – না, তিনজন কাস্টমার ছিল তখন শোরুমে – তারাও।"

"তোর বড়দা, মেজদা, জেঠু?"

"না ওঁদেরকে জানানো হয় নি। আসলে কাল তো আমারাও ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না। অনেক সময় কি হয় নেকলেসের বাক্সের মধ্যে মখমলের যে আস্তরণ থাকে, তার তলায় চলে গেলে চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। কালকে আমরা সেটাই ভেবেছিলাম। প্রায় পঞ্চান্ন বছরের পুরোনো ব্যাবসা। আগে ছিল দোকান, এখন শোরুম – কিন্তু এমন তো কোনদিন হয় নি। তবে- "

"আজ যখন কারেন্ট চলে যায়,ওঁনারা কেউ ছিলেন না?"

"হুঁ, মেজদা ছিল। দুটো নাগাদ এসেছিল। আজও কারেন্ট চলে যাওয়ার পরপরই বেরিয়ে গেল। তারপর জেঠু, বড়দা আর মেজদা মিলে এসেছিল। আমিই ফোন করে ডেকেছিলাম। সাড়ে তিনটের সময় – যখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে ব্যাপারটা সিরিয়াস। ওঁনারা এলেন, এই ধরো, চারটে নাগাদ।"

"তারপর পুলিশকে কখন খবর দিলি?"

"জেঠুই সব শুনে বাবাকে বললেন পুলিশকে খবর দিতে। বড়দার সঙ্গে থানার ওসির চেনাশোনা আছে। বড়দাই ফোন করেছিল।"

"পুলিশ কখন এল?"

"প্রায় পৌনে পাঁচটা নাগাদ।"

"এসে কী কী করল?"

"বললাম না, সক্কলকে জেরা করল,কাউকে ছাড়ে নি।"

"সার্চ করে নি?"

"হুঁ, করল তো। সবাইকে। মেয়েদেরকেও। মেয়ে পুলিশও ছিল একজন। কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া গেল না।"

"তোদেরকেও করেছিল?"

"আমাদেরকে? না, না। আমাদেরকে করে নি।"

"কেন?"

"যাঃ! কী যে বলো না তুমি দিদি! আমাদের দোকান আর আমাদেরকেই সার্চ করবে? নিজের দোকান থেকে কেউ মাল সরায় নাকি?"

"হতেই পারে। বলা যায় না।"

"কী বলছো, তুমি?"

মা কোন উত্তর দিলেন না। মুখ নীচু করে হাতের বোনাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "ওই দ্যাখ, তোর কথা শুনতে শুনতে এক্কেবারে ভুলেই গেছিলাম। তুই সোজা দোকান থেকেই এসেছিস না? ছি ছি...নিশ্চয়ই তোর খিদে পেয়েছে। ভুটকু, প্রতিমাকে বলে আয় তো – সাগরের জন্যে দুটো পরোটা আর বেগুন চটপট ভেজে দিতে। একটু পরে চা। আমিও খাব এককাপ। নাঃ থাক, চা আর বলতে হবে না, এই অসময়ে। আর হ্যাঁ, পরোটাদুটো কড়া করে ভাজতে বলিসতো।"

আমি মায়ের কথা শেষ হবার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে মায়ের কথাগুলো প্রতিমাদিকে ইকো করে দিলাম অবিকল। কারণ ঘর ছেড়ে বেরনোর ইচ্ছে আমার একটুও ছিল না। মায়ের কথাবার্তার ধরণটা ঠিক ফেলুদার মতো লাগছিল – জানিনা কেন মনে হচ্ছিল, মা ঠিক ধরে ফেলবেন এবং সেটা পুলিশের অনেক আগেই। আমি ঘরে ঢুকতেই ভীষণমামা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁরে, জ্যোতি, মোটে দুটো বললি?" আমি কিছু বলার আগেই মা বললেন –

"হ্যাঁ, মোটে দুটোই। এখন সওয়া আটটা বাজছে, তোরা আবার দশটার মধ্যে খেয়ে নিস- তখন আবার চোদ্দটা রুটি..."

"ঠিক আছে, দিদি, ঠিক আছে।"

"পরোটা আসতে আসতে আমার কয়েকটা ব্যাপার জানার আছে। তোদের এই জুয়েলারির শো রুম কি শুধু তোরাই চালাস, না তোর জেঠুরও অংশ আছে?"

"নাগো দিদি। বাবা আর আমিই চালাই। বাবারা দুভাই। আর দাদুর মোটা চারটে ব্যবসা ছিল। বাবাদের দুভাইকে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন। দুটো জুয়েলারি,একটা বস্ত্রালয় আর একটা ফার্মেসি। আমাদের ভাগে একটা জুয়েলারি আর ফার্মেসি, জেঠুর ভাগে আরেকটা জুয়েলারি আর বস্ত্রালয়।"

"তার মানে তোদের জুয়েলারি বা ফার্মেসির দোকানের লাভ লোকসানের দায়িত্ব তোর জেঠুদের নেই?"

"না।"

"হুঁ। আচ্ছা, দিনকয়েক আগে তোর মেজদা সম্পর্কে কী যেন বলছিলি..."

"মেজদা সম্পর্কে? কী বলেছিলাম বলো তো?"

"আরে বাবা, বলেছিলি না, মাধুরী মানে তোর বউদি মারা যাবার পর মেজদা কেমন যেন হয়ে গেছে...কী হয়েছে?"

"সে আর কী বলব, দিদি, ঘরের কথা। মেজদা আর আগের মতো নেই। বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে। অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। মানে কুসঙ্গে পড়লে যা হয় আর কি...।"

"তোর জেঠু কিংবা বড়দা নিশ্চই তোর মেজদাকে এসব ব্যাপারে প্রশ্রয় দেন না।"

"মোটেই না। তাই কেউ দেয় নাকি? জেঠু তো ভীষণ রাগারাগি করেন প্রায় রোজই। বড়দা-বড়বৌদিও কি কম বোঝাচ্ছেন? কিন্তু মেজদার কি মতিভ্রম হয়ে গেল... কারো কথাই শুনছেই না।"

"বদলোকের পাল্লায় পড়ে এইসব যে করে বেড়াচ্ছে, তার তো ভালোই খরচ- খরচা আছে নাকি? তা এতো টাকা পয়সা দিচ্ছে কে?"

মা যে কথাটা ভীষণমামাকে জিগ্যেস করলেন তা নয়। মাথা নীচু করে চিন্তা করতে করতে নিজের মনেই বললেন কথাটা। কিন্তু মায়ের কথাটা শুনে আমি তো বটেই, ভীষণমামাও হতভম্ব হয়ে গেলাম। তার মানে ভীষণমামার মেজদার কীর্তি এটা! তাঁর বদখেয়ালের খরচ মেটানোর জন্যে – কি সর্বনাশ! তাহলে কী হবে? ঘরের মধ্যেই আসামী!

এই সময়েই প্রতিমাদি ঘরে ঢুকল রেকাবিতে পরোটা, বেগুনভাজা আর জলভরা গ্লাস নিয়ে। ভীষণমামা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল উত্তেজিত হয়ে । কিন্তু সে কথা বলার আগেই মা বলে উঠলেন, "এখন ওসব কথা থাক, সাগর। আগে খেয়ে নে।" তারপর মা প্রতিমাকে ইশারায় কিছু বললেন, প্রতিমাদি মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মা বললেন, "হ্যাঁ, সাগর, কী বলতে যাচ্ছিলি বল। তখন তোকে থামিয়ে দিলাম, কারণ আমি চাই না প্রতিমার কানে এসব কথা যাক।"

ভীষণমামা গরম পরোটার বড়ো একটা টুকরো ছিঁড়ে বেগুনভাজার সঙ্গে মুখে পুরে নিয়ে ভরা গলায় বলল, "ঠিক কথা, দিদি, এসব কথা বাইরের কেউ শুনলে আমাদের কি বদনামটাই না হবে! কিন্তু দিদি, তুমি একদম শিয়োর, মেজদাই করেছে এটা**?"**

"মোটেই না। আমি একবারও বলিনি। আমি শুধু সম্ভাবনার কথা ভাবছি। দ্যাখ, পরপর দুদিন দুটো আইটেম যেভাবে হারিয়ে গেল তাতে বাইরের লোক যে কেউ করেনি, সেটা মোটামুটি নিশ্চিত। তার মানে করার মধ্যে তোরা - আর নয়তো তোদের কর্মচারীদের কেউ। তাই না**?"**

"ওরে বাবা, তাহলে তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে!" ভীষণমামা একখানা পরোটা শেষ করে দ্বিতীয়টাকে আক্রমণ করল।

"এবার তোর কর্মচারীদের কথা বলতো এক এক করে...।"

"কর্মচারী ? দাঁড়াও, বলছি... সলিলকাকা – সলিল মজুমদার। সবচেয়ে সিনিয়ার লোক। মুর্শিদাবাদে গ্রামের বাড়ি। মাসে একবার বাড়ি যান, মাইনের পর। আর তাছাড়া পুজোয় কি বাড়িতে বিয়েটিয়ে থাকলে বাড়ি যান। সূর্য সেন স্ট্রিটের একটি মেসে থাকেন। দোকানে উনিই প্রথম আসেন – সন্ধ্যেয় সবার পড়ে মেসে ফেরেন। ভীষণ চাপা, নির্বিবাদী, কিন্তু খুব সিনসিয়ার, পরিপাটি মানুষ। কাজে কোনদিন গাফিলতি করেন না।"

"দাঁড়া। ভুটকু, সংক্ষেপে লিখে রাখ তো, সাগর যা বলছে। একদম নাম ধরে লিখবি। ভুল করিস না যেন।"

মায়ের কথার মধ্যেই প্রতিমাদি আবার ঘরে ঢোকে – আলাদা প্লেটে আরো দুটো পরোটা আর কাচের বাটি ভরা সুজির পায়েস – কিসমিস, কাজুর কুচি বিছানো। ভীষণমামা মুখে পরোটা নিয়ে আনন্দে একগাল হাসল। বলল, "আরো দুটো পরোটা, দিদি? তার সঙ্গে আবার পায়েসও? বা, বা। প্রতিমা তোমার রান্নার কিন্ত কোন জবাব নেই। প্রতিমাদি পরোটাদুটো ভীষণমামার প্লেটে ট্রান্সফার করে দিল আর পায়েসের বাটিটা রেখে দিল প্লেটের পাশে।

"নে, নে, বকিস না বেশি। এই শেষ কিন্তু। আর কিছু পাবি না এই বলে দিলাম।" মায়ের কথা শুনে প্রতিমাদি ফিক করে হেসে চলে গেল নীচেয়। মা আমাকে জিগ্যেস করলেন -

"লিখেছিস। ভুটকু?"

"হুঁ। হয়ে গেছে...।" আমি উত্তর দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, ভীষণমামা আর কী বলে সেটা শোনা আর লেখার জন্যে। মা ভীষণমামাকে বললেন –

"আবার শুরু কর, সাগর, সলিলবাবুর সম্বন্ধে আর কী জানিস?"

"সলিলকাকার? ব্যস এই ত... আর কী জানবো?"

"সে কী রে? সলিলবাবু তোদের সবচেয়ে পুরোনো লোক। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানিস না? তাঁর কটা ছেলে মেয়ে? তারা কী করে? ওঁর স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য কেমন – কিচ্ছু জানিস না?"

"দাঁড়াও, দিদি, দাঁড়াও। তোমার একদম হাঁড়ির খবর চাই? তাহলে বলছি শোন। বছর চারেক আগে ওঁর মেয়ের বিয়ে হল। একটাই মেয়ে। আর এক ছেলে আছে – সেই বড়ো। ওই মেয়ের বিয়ের পরে আমাদের সকলকে মুর্শিদাবাদের মনোহরা আর ছানাবড়া এনে খাইয়েছিলেন। দারুণ মিষ্টি – দিদি, তুমি খেয়েছ কোনোদিন?"

"না। তারপর বল।"

"হ্যাঁ, ওঁর ছেলে বিএসসি পাশ করে অনেকদিন বসেই আছে। তেমন কোন কাজকর্ম জোটেনি। টুকটাক টিউশনি করে হাতখরচ চালায়। মাঝে কি একটা ব্যবসা শুরু করার ঝোঁক হয়েছিল। বাবার থেকে সলিলবাবু লাখদেড়েক টাকাও চেয়েছিলেন ধার হিসেবে। কিন্তু বাবা প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাদের ফার্মেসিতে চাকরি করার জন্যে। সলিলবাবু রাজি হননি। তারপরে ওই টাকা ধারের প্রসঙ্গটাও চাপা পড়ে গিয়েছিল।

"তারপর আছেন বংশীবাবু। বংশীধর দে – বংশীধর না ধারী মনে করতে পারছি না। আগে ভীষণ খিটখিটে ছিলেন, কিন্তু মানুষটা ভালো। পান থেকে চুন খসলেই খুব রাগারাগি করতেন। তবে বাবাকে খুব ভয় করেন আর সম্মানও করেন। ইদানীং অবিশ্যি ওঁর খিটখিটে ভাবটা বেশ কমে গেছে, জানি না কেন, বেশ কিছুদিন হল শান্তভাবেই কাজকর্ম করছেন। এঁড়েদায় বাড়ি। দুই মেয়ে। একমেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বছর তিনেক হল। আর ছোট মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে – এই সামনের বোশেখে।"

"মেয়ের বিয়েতে টাকা পয়সা নিয়ে সমস্যা আছে – জানিস?"

ভীষণমামা তিন নম্বর পরোটা শেষ করে চারে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়েসও তুলছে চামচে করে। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে আওয়াজ করছে পায়েস খাওয়ার সময়। আর আমি দ্রুত হাতে লিখে চলেছি ভীষণমামার দোকানের কর্মচারীদের বায়োডেটা। মায়ের প্রশ্নে খাওয়া থামিয়ে ভীষণমামা বলল, "তুমি ঠিক ধরেছ, দিদি। এই তো দিন পনের আগে বংশীবাবু আমাকে বলছিল লাখখানেক মতো টাকা ধার দেবার জন্যে। আমি বলেছিলাম বাবার সঙ্গে কথা বলতে। কারণ দশ- বিশ হাজার হত, সে আমি করে দিতে পারতাম, কিন্তু অত টাকা ধার দিতে গেলে বাবাকে জানাতেই হবে।"

"বংশীবাবু তোর বাবার সঙ্গে কথা বলেছিলেন কিনা জানিস?"

"জানি না। বাবা আমাকে তো কিছু বলেন নি। আর আমিও ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি জিজ্ঞেস করাতে মনে পড়ল। তোমার কি মনে হয়, দিদি, তবে কি বংশীবাবুই...?"

"আমার কিচ্ছু মনে হচ্ছে না, সাগর। আমি এখন শুধু শুনছি। আর কী কী জানিস, বল।

"হুঁ, বলছি। বংশীবাবুর বাপ- মা মরা ভাইঝি, কণা, আমাদের দোকানেই জয়েন করেছে বছর দুয়েক হল। যখন আমাদের দোকান রেনোভেট করে, নতুন শোরুম বানিয়ে তোলা হল – তার পরপরই। ছোটবেলাতেই অ্যাক্সিডেন্টে ওর বাপ- মা মরে গিয়েছিল। সেই থেকে বেচারি কাকার কাছেই মানুষ। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে বসেছিল। কাউন্টারের জন্যে মেয়ে খোঁজা হচ্ছে শুনে বংশীবাবু বাবা আর জেঠুকে বলে- কয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। শান্ত- শিষ্ট ভালো মেয়ে – কেমন যেন ভিতু ভিতু টাইপের, খুব আস্তে কথা বলে, আর এমনিতে খুব চুপচাপ থাকে। তবে এটা বোঝা যায় কণা, কাকাকে খুব ভালোবাসে এবং কাকাও ভাইঝিকে।"

"ও কে। এবার নেক্সট, বল।"

"নেক্সট, হচ্ছেন, কুন্তল চ্যাটার্জি। ইনিও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রায় বছর বিশেক তো হবেই। ব্যাচেলার, খুব শৌখিন লোক। একটু মেয়েলি টাইপ। সারাক্ষণ চুল আর মুখের প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন। জামা কাপড়ের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর – সর্বদা ফিটফাট ধোপদুরস্ত থাকতে পছন্দ করেন। আর ওঁর ভীষণ শখ পারফিউমের – রোজই নতুন নতুন গন্ধ মেখে শোরুমে আসেন। এসবের মধ্যেও উনি নিজের কাজটা কিন্তু ভালই করেন। উনি অবিশ্যি কাউন্টারে বসেন না। আমাদের হিসেব- পত্র মানে অ্যাকাউন্টসটা উনিই সামলান। আমাদের কনসালটিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট ফার্মের সঙ্গে উনিই যোগাযোগ করেন এবং যাবতীয় ট্যাক্সের ঝামেলা, আইনকানুন উনিই সামলান। উনি থাকেন বিকেপাল- হাটখোলায় নিমু গোঁসাই লেনে।"

"ঠিক আছে। কুন্তলবাবুর ব্যাপারটা পরে না হয় আবার জানব, নেক্সট বল।"

"নেক্সট হচ্ছে, মেয়ে দুটি। কণা, যার কথা তোমাকে আগেই বললাম, বংশীবাবুর ভাইঝি। আর আছে শিঞ্জিনী সাঁতরা। মা আর প্যারালাইসড বাবাকে নিয়ে থাকে গড়িয়ার বোড়ালের কাছে। আসলে শিঞ্জিনী হচ্ছে মেজবৌদির মাসীর মেয়ে। বছর আটেক আগে ওর বাবা সেরিব্রাল হয়ে পঙ্গু হয়ে যান। তখন ও সবে উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। চিকিৎসার খরচা সামলাতে সামলাতে মোটামুটি নিঃশেষ হয়ে যায় ওর বাবার জমানো টাকাপয়সা। পাশ করে বিএসসিতে ভর্তিও হয়েছিল, কিন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে নি। শেষমেষ বৌদির সুপারিশে আমরা ওকে চাকরি দিতে সত্যি ওর খুব সুরাহা হয়েছিল। খুব ভালো মেয়ে। এই বয়সেই খুব পরিণত। খাটিয়ে এবং ভীষণ খাঁটি। বাড়িতে এত দুর্যোগের মধ্যেও ভেঙে পড়ে নি – লড়ে যাচ্ছে রীতিমত। শুনেছি শিঞ্জিনীর বাজারে লাখ দুয়েকের মতো দেনা আছে। শোধ করছে আস্তে আস্তে।"

"শিঞ্জিনীর বয়েস কত হবে – চব্বিশ- পঁচিশ, না? দেখতে কেমন রে?"

"এই এপ্রিলে পঁচিশ হবে। দেখতে বেশ – মানে ভালই...আর কি। কিন্তু, তুমি দেখলে বুঝতে পারবে দিদি, মেয়েটা সত্যি আর পাঁচজনের মতো নয়...।"

"হুঁ। বুঝেছি। নেক্সট বল।"

"ব্যস, পাঁচজনই তো কর্মচারি আমাদের – হয়ে গেল তো!"

"বাঃ, সিকিউরিটি দুজন? তারপরে সজল?"

"ওদেরও শুনবে? সিকিউরিটিদের মধ্যে একজন রামপ্রীত মিশির। আমরা মিশিরজি বলি। জ্ঞান হয়ে থেকে ওকে দেখছি। আরা জেলায় বাড়ি। বছরে একবার মাসখানেকের জন্য বাড়ি যায় ওই সময়টা আমাদের ভীষণ অসুবিধে হয়। হাট্টাকাট্টা চেহারা। দেখলে বোঝার জো নেই যে ওর বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। ওর কাছে বন্দুক থাকে। সারাটা দিন ও শোরুমের ভিতরে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে – ভেতর, বাইরে দুদিকেই লক্ষ্য রাখে। ওর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমাদের কারোর কোন দ্বিধা নেই দিদি, এটুকু বলতে পারি।"

"খুব ভালো কথা, নেক্সট?"।

"নেক্সট হচ্ছে জনার্দন মাজি। মেদিনীপুরের কোথাও বাড়ি। মেজদার সুপারিশে ওকে কাজে লাগানো হয়েছে মাস ছয়েক হল। আমি, বাবা বা জেঠু কেউই রাজি ছিলাম না। মেজদার জোরাজুরিতে বাবা নিমরাজি হয়ে ওকে রেখেছেন। জেঠু বাবাকে মানাও করেছিলেন অনেকবার। ওকে শোরুমের ভেতর ঢুকতেই দেওয়া হয় না। বাইরেই থাকে। কাস্টমার এলে কাচের পাল্লা খুলে দেওয়া আর সেলাম দেওয়াই ওর আসল ডিউটি।

"শেষমেষ সজলের কথা। সজল আমাদের বাড়িতে রান্না করে যে বিভামাসী – তার ছেলে। হুগলীর আদিসপ্তগ্রামে বাড়ি ছিল। বিভামাসীর সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। আমরাই ওকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম, তারপর আর পড়তে চাইল না। বছরখানেক হলো ওকে শোরুমে লাগিয়ে দিয়েছি। ফাইফরমাশ খাটে। সকলকে জল দেওয়া, চা দেওয়া – বড় কাস্টমার এলে কোল্ড ড্রিঙ্কস দেওয়া, দুপুরে লাঞ্চের সময় সকলের টিফিন এনে দেওয়া এই সব করে আর কি। বেশ ফুর্তিবাজ ভাল

ছেলে, সর্বদা হাসিমুখ। সবার সঙ্গে জেঠু , কাকু, দিদিভাই সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে এবং সকলেই ওকে বেশ পছন্দ করে।"

"ঠিক হ্যায়। আপাতত এই অব্দিই থাক। তুই বাড়ি গিয়ে রেস্ট নে। তোরা রাত্রে মোটামুটি কটার সময় ঘুমোতে যাস?"

"এই ধরো এগারোটা, কেন বলোতো?"

"যদি দরকার পড়ে, আরো কিছু জানতে তোকে ফোন করব আরকি। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার বলতো...পুলিশের সার্চিং আর ইনভেস্টিগেশন কটা অব্দি চলেছিল, পুলিশ যাওয়া পর্যন্ত সকলেই কি শোরুমে ছিল?"

"না, না, সব্বাই চলে গিয়েছিল, জেঠু, বাবা আর আমি ছিলাম শেষ অবধি। পুলিশ বেরিয়ে যেতে, বাবা ক্যাশ নিয়ে বেরিয়ে এলেন – আমরাও চলে এসেছি।"

"সকালে কটার সময় তোদের শোরুম খোলা হয়?"

"এই ধরো সাড়ে নটার মধ্যে আমি আর সজল চলে যাই। ঝাড়পোঁছ সাফসাফাই করার জন্যে এক মাসী আসে, তারপর দশটা – সোয়া দশটা থেকে শোরুম পুরো খুলে যায়।"

"গুড, কাল আমাকেও তুলে নিবি যাওয়ার সময়, আমি যাব তোদের সঙ্গে।"

২

মায়ের সুতোর গোলা গড়িয়ে গড়িয়ে চেয়ারের পা আর আমার পড়ার টেবিলের পায়ের সঙ্গে পাকিয়ে জড়িয়েমড়িয়ে বিচ্ছিরি জট পড়ে গিয়েছিল। ভীষণমামা চলে যাবার পর মা আমাকে সুতোর জট ছাড়িয়ে আবার গোলা পাকাতে বলে, আমার নোটগুলো নিয়ে বসলেন।

সুতোর জট ছাড়িয়ে গোলা পাকিয়ে আমি যখন সবে মায়ের পাশে বসে বুঝতে গেছি কতখানি রহস্যভেদ হল, মা বললেন,"দশটা কুড়ি হয়ে গেছে! চ, চ, খেয়ে নিই। বেচারা প্রতিমা খাবার কোলে বসে আছে।"

কাজেই রহস্য নিয়ে কথা আর হল না। নিচে খাবারের টেবিলে তো কোন কথাই সম্ভব নয়। কারণ মা তো আগেই বলে দিয়েছিলেন প্রতিমাদির সামনে এসব নিয়ে কোন আলোচনা না করতে। আমি ভীষণ টেনশনে চটপট খেয়ে নিলাম। কিন্তু মা প্রতিমাদির সঙ্গে কালকে কী রান্না হবে সেই নিয়ে আলোচনা করলেন খুব শান্তভাবে। সে সব সেরে ওপরে চলে এলাম। মা নিজের ঘরে গিয়ে ফোন করলেন ভীষণমামাকে।

"হ্যালো, সাগর, শোভাদিদি বলছি রে।"

"....."।

"একটা কথা, তোরা এবং পুলিশ শোরুমের সব জায়াগাই তো খুঁজেছিলি, না"?

"....."।

"টয়লেটে?"

"....."।

“ঠিক আছে। আমি কিন্তু কাল সকালে তোর জন্য ওয়েট করবো। শুয়ে পড়, গুড নাইট।”
“.....”।

ফোনটা রেখে মা আবার আমার ঘরে এলেন। আমার বিছানা থেকে খাতাটা নিতে নিতে বললেন, “জানি রে সোন্টু, তোর পেট ফেটে যাচ্ছে সবকিছু শুনতে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বলার মতো কিছু মাথায় আসছে না। রাতটা একটু ভাবতে দে। তাছাড়া প্রতিমাও এখুনি শুতে চলে আসবে। আজকের রাতটা একটু টেনশানে কাটা। কাল কিছু একটা হয়ে যাবে। তাছাড়া কাল তোর স্কুল ছুটি যখন, আমার সঙ্গে চল, অনেক কিছু দেখতেও পাবি হয়তো। গুডনাইট ভুটকু”।

মা চলে গেলেন আমার খাতাটা নিয়ে।

মায়ের ওপর বেশ রাগ হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু মায়ের যুক্তি না মেনে উপায়ও নেই। কাজেই টেনশন নিয়ে গোমড়া মুখ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। অন্যদিন রাত সাড়ে এগারোটা বারোটা অবধি পড়ি, আজ ইচ্ছে হল না। শুয়ে শুয়ে ঘরের সিলিংএর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম ভীষণমামার লোকজনের জীবন বৃত্তান্ত।

ভীষণমামাদের পরিবারটা খুব ভালো। বনেদি পরিবার। বাড়ি গাড়ি সবই আছে কিন্তু এতোটুকু অহংকার নেই। ছোটবড় সকলের সঙ্গেই দারুণ সম্পর্ক রেখে চলেন। তবে ওঁদের সকলের নামগুলো শুনলে মনে হয় মান্ধাতার আমলের কলকাতার ইতিহাস থেকে নেওয়া। ভীষণমামার জেঠুর নাম ভবতারণ সেন, আর বাবার নাম ভবশরণ সেন। ওঁনারা অবিশ্যি আমার দাদু হন, আর আমাকে খুব ভালোও বাসেন। আমার নাম যদিও জ্যোতিষ আর ডাকনাম জ্যোতি, ওঁরা আমাকে ডাকেন নন্দকিশোর বলে। ওঁরা রাধাকৃষ্ণের ভক্ত। বাড়ির একতলায় বিশাল ঠাকুরঘরে সোনার মুকুট মাথায় পড়ানো রাধা- কৃষ্ণের যুগলমূর্তি আছে- সেও দেখার মতো।

ভবতারণবাবুর দুই ছেলে- ভবনিধি আর ভবধারা। আর ভবসাগর মানে ভীষণমামা ভবশরণবাবুর একমাত্র ছেলে। জয়েন্ট ফ্যামেলিতে একসঙ্গে বড় হয়েছেন বলে ভীষণমামা ওঁদের বড়দা, মেজদা বলে। ভীষণমামার শোরুমে বার কয়েক গিয়েছি। নববর্ষের দিনতো বটেই। ওঁরা অবিশ্যি বলেন হালখাতা। লাল শালুমোড়া ভাঁজ করা একটা মোটা খাতা সকাল সকাল চলে আসে কালীঘাটে মাকালীর চরণ স্পর্শ নিয়ে। তার প্রথম পাতায় থাকে লাল আলতায় ডোবানো টাকার ছাপ, তার নিচে আলতায় লেখা থাকে “শুভ লাভ” আর স্বস্তিক চিহ্ন।

সন্ধেবেলা ভীষণমামার দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী লোকগুলোর বায়ো- ডেটা মনে করার চেষ্টা করলাম। ভীষণমামার মেজদা, সলিল মজুমদার, বংশীনাথ দে আর তাঁর ভাইঝি কণা দে,কুন্তল চ্যাটার্জী, শিঞ্জিনী সাঁতরা, রামপ্রীত মিশির , জনার্দন মাজি আর বিভা মাসীর ছেলে সজল। মেজদার কুসঙ্গের খরচের টাকা। সলিলবাবুর ছেলের ব্যবসার জন্য টাকা, বংশীবাবুর মেয়ের ও ভাইঝির বিয়ের টাকা। শিঞ্জিনীর বাবার অসুখের দেনা। টাকার দরকার তো সবারই।

মেজদা- যতই কুসঙ্গে মিশুক, নিজের কাকা এবং নিজের ভাইএর দোকান থেকে গয়না সরিয়ে নেবে, অন্তত আমার এটা মনে হচ্ছে না। যদিও “কুসঙ্গ” ব্যাপারটা ঠিক কী সে ব্যাপারে আমার পরিষ্কার ধারণা নেই।

সলিল মজুমদার- ছেলেকে একটা কিছু করে দাঁড় করাবার চিন্তা, তার পক্ষে স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তাঁর ছেলের ব্যবসার টাকা জোগানের জন্য হাত সাফাই করা খুব অসম্ভব নয়।

বংশীবাবু আর কণা দে- মনে হয় ভাইঝির দায়িত্ব নেবার জন্য তাঁর বাড়িতে অশান্তি ছিল। ইদানিং কণার চাকরি হওয়াতে তিনি অনেক নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাঁর মাথায় আছে নিজের ছোট মেয়ে আর তারপরে ভাইঝিরও বিয়ে দেওয়ার দুশ্চিন্তা। কারণ তাঁর এই অসহায় ভাইঝিটিকেও তিনি নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন। কাজেই তাঁর পক্ষেও গয়না সরিয়ে টাকা জোগাড়ের এই ফন্দি অসম্ভব নয়।

কুন্তল চ্যাটার্জী- আপাতত কোন উদ্দেশ্য তাঁর পাওয়া যাচ্ছে না এবং তাঁর পক্ষে গয়না সরানোর সুযোগও নেই বললেই চলে।

শিঞ্জিনী সাঁতরা- বাবার অসুখের দেনায় বেচারা ডুবে আছে। তার পক্ষেও এমন কাজ করে ফেলা কিছু অসম্ভব নয়।

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই জানিনা কোথা থেকে নাকে ভীষণ কড়া পারফিউমের গন্ধ পেলাম। একজন লোক- মুখটা দেখা যাচ্ছে না, পিছন ফিরে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়েই চলেছে আর হাত দিয়ে চুল সেট করে চলেছে। গন্ধটা মনে হয় ওই লোকটার গা থেকে আসছে। ওদিকে খুব তীক্ষ্ণ গলায় কেউ চিৎকার করে বলছে, "হিরেগুলো কে সরাল শুনি? আমি জানতে চাই কে সরাল? যত সব আহাম্মকের দল। এই ভাবে কেউ হীরে সরায়?"

হঠাৎ ভীষণমামা সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, " হীরেগুলো কে সরিয়েছে আমি জানি। হীরে সরিয়েছে জ্যোতি, কারণ আমার বাবাকে বহুবার বলতে শুনেছি জ্যোতি হীরের টুকরো ছেলে।"

সেই শুনে লাগাতার চুল আঁচড়ানো লোকটা পেছন ফিরে থেকেই বলে উঠল,"ওমা তাই ? তাহলে তো আমাদের জ্যোতি ভীষণ অসভ্য আর দুষ্টু..."

আমি বলে উঠলাম "মোটেই না, আমি মোটেই হীরে সরাই নি।" আর তক্ষুণি একটা মেয়ের গলা পেলাম, "ঠিক আছে, আগে তো ওঠ...ওঠ...ওঠ...ওঠ না! উঠে পড়। সেই থেকে ডাকছি! কি ঘুম রে বাবা তোর। এখনো উঠলি না? "

ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বুঝলাম আমি এতক্ষণ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম, আর বাস্তবটা হল মায়ের ডাক। স্নান- টান সেরে মা আমার ঘরে এসেছেন- আমার টেবিলের বইপত্রগুলো গোছাচ্ছেন আর আমাকে ডেকে চলেছেন- আমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে।

৪

নটা বেজে আট মিনিটে ভীষণমামার সাদা স্কর্পিও গাড়িটা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। মা আর আমি তৈরিই ছিলাম। প্রতিমাদিকে বলে আমরা বেড়িয়ে পড়ে গাড়িতে উঠলাম। সজল বসেছিল সামনে। আমি মাঝখানে ঢুকে বসতে মা উঠে এলেন বাঁদিকে, আর আমার ডানদিকে ভীষণমামা। আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভীষণমামার শোরুমে পৌছাতে পাক্কা আঠেরো মিনিট লাগল। আমরা দোকানে পৌঁছলাম নটা ছাব্বিশে।

দোকানের কোলাপসিবল গেট বন্ধ। তিনটে তালা ঝুলছে। ভীষণমামা মিশিরজিকে ডাকতে, ভিতরের কাঁচের ভারী দরজা খুলে , হাতে চাবির বিশাল বোঝা নিয়ে বেরিয়ে এল মিশিরজি। হরেক রকমের – অন্তত পঞ্চাশটা চাবি আছে মস্ত রিংটায়। সেখান থেকে ঠিকঠাক চাবি বের করে তিনটে তালাই চটপট খুলে দিয়ে মিশিরজি গেট খুলে দিল। গেটটা পুরোটা খুলবে না কারণ মাথার একটু ওপরে লোহার চেন দিয়ে কোলাপসিবল গেটটা বাঁধা এবং তালা দেওয়া। একজন লোকের বেশি একবারে ঢোকা সম্ভব নয়।

ভারী দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে মিটার রুম। মা মিটার রুমের দরজাটা খুললেন। দরজাটা খুলেই সামনের দেওয়ালে দুটো মিটার লাগানো, তার সঙ্গে মেন সুইচ। নিচে –ওপরে ইলেক্ট্রিকের অনেক তার

এলোমেলো ঝুলে আছে। মা গলা বাড়িয়ে ভিতরে দেখলেন , আমিও দেখলাম। তিনটে ভাঙা প্লাস্টিকের চেয়ার, অনেকগুলো বাতিল গয়নার বাক্স, খালি ভাঙাচোরা পেটি, একটা কমপিউটার কিবোর্ড। একচিলতে ঘরটা আবর্জনার ঘর হিসেবেও ব্যবহার হয় বোঝা গেল। মা ভীষণমামাকে বললেন,"ওই জঞ্জালের মধ্যে চারটে কিটক্যাটই পাওয়া যাবে। বেশি খুঁজতেও হবে না। "

"থাক ,থাক, তোমাকে আর ওই জঞ্জালের মধ্যে কিটক্যাট খুঁজতে হবে না। বেরিয়ে এসো দিদি। হীরে খুঁজতে এসে তুমি কিটক্যাট খুঁজছ?" ভীষণমামার গলায় কেমন যেন বিরক্তির সুর। আমরা মিটার রুমের দরজা ছেড়ে সরে আসতেই , ভীষণমামা খুব তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল, ভীষণমামাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। মায়ের সঙ্গে এভাবে কথা বলতেও কোনদিন শুনিনি আমি। মা কি ভীষণমামার এই ব্যবহার লক্ষ করলেন না? বুঝতে পারলাম না , কারণ এরপরই মা জিজ্ঞেসা করলেন, "হ্যাঁরে, তোদের টয়লেটটা কোথায় রে? "

"ওই তো সামনের বাঁদিকের কোণায় । কেন তুমি যাবে নাকি এখন?"

"হ্যাঁ। যাবো।জ্যোতি আমার সঙ্গে আয় তো...",

মা টয়লেটের দিকে এগোলেন। সঙ্গে আমিও। হঠাৎ ভীষণমামা অদ্ভুত এক কান্ড করে বসল। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "দিদি তুমি এখন টয়লেটে যাবে না। আগে আমি যাবো তারপর। আগে আমি যাবই।"

আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম টয়লেট যাওয়া নিয়ে ভীষণমামার এই জেদ দেখে। মায়ের দেখলাম কোনও কোন তাপ উত্তাপ নেই। অনেকক্ষণ ভীষণমামার দিকে তাকিয়ে থেকে স্মিতমুখেই বলেলেন, "আমাকে তুই দিদি বলে মোটেই ভাবিস না সাগর। ভাবলে এতদূর নীচে তুই নামতে পারিতস না। পথ ছাড়, আমাকে যেতে দে। আমাকে আমার কাজ করতে দে। আমি বলছি তোর ভালই হবে। তুই আমাকে যাই ভাবিস, আমি কিন্তু তোকে নিজের ভাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না।

মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ভীষণমামা। তারপর কী বুঝল কে জানে, হাত নামিয়ে সরে দাঁড়াল।

মা আর আমি টয়লেটে ঢুকলাম। একটা কমোড আর একটা ওয়াশ বেসিন। ওয়াশ বেসিনের ওপর লিকুইড সোপ কন্টেনার। দেওয়ালে আয়না। বেশ পরিষ্কার – পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে ন্যাপথলিন আর ডিজইনফেক্ট্যান্টের গন্ধ। টয়লেটের ভিতর ঢুকে মা চারিদিকটা চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর কমোডের সামনে গিয়ে সিস্টার্নের ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। তারপর নিচু হয়ে সিস্টার্ন ভরা জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলেন। একটু পরে ভেজা মুঠি তুলে আনলেন জলের বাইরে। তারপর ঢাকাটা আবার লাগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "স্যানিটারি- প্লাম্বিং ব্যাপারটাও ভাগ্যিস অল্পবিস্তর জানা ছিল, কাজে লেগে গেল, কী বলিস সাগর?"

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ভীষণমামা দাঁড়িয়ে আছে। তার বিষণ্ন ম্লান মুখ কাগজের মতো সাদা। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে মা কী তুলে আনলেন তাও জানি না। কিন্তু টয়লেট থেকে বেরিয়ে মা ভীষণমামাকে ডেকে বললেন, "আয় আমার সঙ্গে, কিছু কথা আছে, কোন ঘরে বসা যায় বল তো , সাগর? ভুটকু আয়।"

আগেই বলেছি আমার ডাক নাম জ্যোতি। মা ভালো মুডে থাকলে আমাকে অবিশ্যি ভুটকু, সন্টু, মান্টু যা খুশি নামে ডাকেন। আর আমার ওপর রেগে গেলে বা কোন টেনশনে থাকলে জ্যোতি ডাকেন। একটু আগে আমাকে জ্যোতি বলে ডেকেছিলেন, এখন আবার ভুটকু। তার মানে মা এখন ভাল মুডে আছেন। পুরোটা না বুঝলেও এটুকু বুঝলাম, মা রহস্যের জট মোটামুটি খুলে ফেলেছেন- আর সেটা পুলিশরা ধরে ফেলার আগেই।

৫

বাবা , মা এবং আমি ভীষণমামার বাড়ি পৌঁছালাম সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ, ভীষণমামা নিচেই ছিল। বাবাকে গাড়ি রাখার জায়গা দেখিয়ে দিতে, বাবা গাড়ি লক করে বেরিয়ে এলেন। তারপর আমরা চারজনই বাড়িতে ঢুকলাম। নিচের ঠাকুরঘরে রাধা- কৃষ্ণ মন্দিরের সামনে বসে মা গড় হয়ে প্রণাম করলেন। বাবা হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম করলেন আর দেখাদেখি আমিও একইভাবে প্রণাম করলাম। একটু আগেই আরতি হয়ে গেছে। ধুপের আর নানান ফুলের সুবাসে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে এল। প্রণাম সেরে পিছন ফিরেই আমরা দেখলাম, ভীষণমামার বাবা ভবশরণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সৌম্য হাসি। আমাদের দেখে

বললেন, "এসো, মা এসো। আসুন আসুন সমরেশবাবু, আসুন। অনেকদিন পর আপনাদের আবির্ভাব হল।" তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "কীরে? দাদাকে আর মনেই পড়ে না নাকি? আয় আয় ওপরে চল।"

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বাঁদিকের প্রথম ঘরটাই বসার ঘর। বেশ বড়। সোফা,ডিভান, টিভি। কাচের দেওয়াল আলমারিতে শো পিস। দেওয়ালে রাধা- কৃষ্ণের রাস লীলার ছবি। ব্যাকগ্রাউন্ডে জ্যোৎস্নাসহ পূর্ণিমার চাঁদ এবং কদম গাছ, কাছে দূরে কয়েকটা ময়ূর আর হরিণ। আর কদমগাছের ডালে বাঁধা দোলনা থেকে দুলছেন কৃষ্ণকিশোর আর রাইকিশোরী। তেল রঙে আঁকা ছবিটার এমনি প্রভাব গোটা ঘরটাকেই খুব উজ্জ্বল আর আনন্দময় লাগে। আমি যতবার এসেছি ছবিটা দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

আমরা সবাই বসার পর ভবশরণবাবু বসলেন একটা সিঙ্গল সোফায়। ভীষণমামা বসল ওঁর পেছনে একটা কুশন আঁটা চেয়ারে। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ভবশরণবাবু বললেন, "প্রথমে একটু নাতি শীতল সরবৎ সেবা হোক। তারপর সামান্য মিষ্টিমুখ। দাদা আসছেন। দাদা এলেই আমাদের কথাবার্তা শুরু হবে। কিন্তু যে বদনাম থেকে তুমি আমাদের পরিবারকে বাঁচালে শোভামা, তার কোন মূল্য হয় না। মেধা, বিশ্লেষণী শক্তি আর তার সঙ্গে পরিমিত মূল্যবোধ- খুব ভালো, মা। তুমি ভাবছ বুড়ো উচ্ছ্বাসিত হয়ে গেছে – তা নয় মা – বরং ভেবে নিশ্চিন্ত লাগছে- আমার চোখ বুজলেও সাগরের মাথার ওপর সর্বদা তার দিদির মমতার হাত রাখা থাকবে।"

ভীষণমামার মা এলেন ঘরে, সঙ্গে কাজের মেয়ের হাতের ট্রেতে সুদৃশ্য মার্বেলের গ্লাসে শরবৎ। ভীষণমামার মায়ের পরণে চওড়া লাল আর মেরুনের ডোরা পাড় সাদা খোলের শাড়ি। পায়ে আলতা। কপালে – সিঁথির সিঁদুর – স্মিত , শান্ত মুখ। দুই হাতেই অনেকগুলি চুরি আর শাঁখা পলা। নিজে হাতে সবাইকে শরবতের গ্লাস পরিবেশন করলেন। পরিবেশনের শেষে মায়ের পাশে এসে বসলেন। মায়ের একটি হাত টেনে নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "কতদিন পরে এলি বল দেখি,শোভা। ভুলেই গেছিলি মনে হয়?"

"না, না, মাসীমা , ভুলব কেন? আসলে ও বাইরে থাকে, জ্যোতির স্কুল, টিউশন, লেখাপড়া, সব সামলেসুমলে আর হয়ে ওঠে না।"

"তা ঠিক , আজকাল সকলে এত ব্যস্ত, কারুর হাতে সময় নেই তবু ভাল সাগর এই কেলেঙ্কারি করল বলে তোর সময় হল... মাসীমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হল।"

মা কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন , কিন্তু তার আগেই ভীষণমামার জেঠু ঘরে ঢুকলেন। সকলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আমার একটু দেরি হয়ে গেল দোকান থেকে ফিরতে। অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম আপনাদের।"

মা বললেন, "না না জেঠু, আমরা এই একটু আগেই এসেছি। মাসীমার সঙ্গে আলাপ করছিলাম। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই- ইনি আমার স্বামী সমরেশ সান্যাল, আর এটি আমার পুত্র জ্যোতিষ্ক সান্যাল।" বাবা আর আমি ভদ্রলোককে নমস্কার করলাম, উনিও প্রতি নমস্কার করলেন।

"ভেরি গুড। আলাপ হয়ে ভাল লাগল। খাঁদুর মুখে যা শুনলাম আপনার কথা- আপনি তো মির‍্যাকল করে দিয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন থানা পুলিশের হ্যাপা হুজ্জোত আর বদনাম থেকে।"

শেষ কথাগুলো উনি মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন। "খাঁদু" নামটা কার আমি বুঝতে পারলাম না, ভীষণমামার নয় জানি। ভীষণমামার বাবার কি? হতেই পারে। মায়ের মুখে শুনেছি আগেকার দিনে এমন নাকি হত- যার ভাল নাম হয়তো সমরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি, তাঁর ডাকনাম হল "ন্যাপা।"

ভীষণমামার জেঠু সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "আমরা তো সবাই রেডি। তাহলে শোভামা, শুরু কর তোমার কথা। আর দেরি করার কোন কারণ নেই। কী বলিস রে খাঁদু?"

ভীষণমামার বাবা ভবশরণবাবু মাথা নেড়ে জেঠুর কথায় সায় দিলেন। তার মানে আমার অনুমান ঠিক। ভীষণমামার বাবা ভবশরণ সেনের ডাকনাম খাঁদু।

ঘরের সকলের দৃষ্টি এবার মায়ের দিকে। মা বাবার দিকে একবার তাকালেন তারপর শুরু করলেন-

"কাল সাগর এসে যখন বলল আপনাদের দোকান থেকে পরপর দুদিন হীরের গয়না চুরি গিয়েছে, শুনে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। পরপর দুদিন কীভাবে চুরি হওয়া সম্ভব? একই লোক দুদিন চুরি করল? নাকি দুদিন আলাদা দুজন লোক? তারপর সাগরের থেকে জিজ্ঞাসা করে সবটা শুনে আবার আশ্চর্য হলাম। চুরির পদ্ধতিটাও এক। খালি সময়ের হেরফের। অর্থাৎ যে কাজটা করেছে সে সিসিটিভি অফ রাখতে চাইছে এবং তার সঙ্গে আচমকা লাইট চলে যাওয়াতে সকলের অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে। তখন একটা ব্যাপার আমার মাথায় এলো- মেন সুইচ থেকে কিটক্যাট সরানো আর কাউন্টার থেকে গয়না সরানো একজনের কাজ হতে পারে না। অন্তত দুজন থাকতেই হবে।"

"দুজন থাকার কথাটা যখন আমার মাথায় এলো, তখন আমি জুটি খুঁজতে শুরু করলাম। এমন জুটি যাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস আর ভাল তালমিল থাকা জরুরি। সাগরের বর্ণনা অনুযায়ী দেখলাম তিনটে জুটি দাঁড়াচ্ছে। প্রথম বংশীধরবাবু আর তাঁর ভাইঝি কণা। সাগরের মেজদা আর শিঞ্জিনী – কারণ ওরা পুর্ব পরিচিত। শালি- জামাইবাবু। অথবা মেজদা আর জনার্দন, কারণ জনার্দনকে মেজদাই একরকম জোর করে ঢুকিয়েছেন।"

এই অবধি বলে মা একটু থামলেন। সকলেই আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। কেউ কিছু বললেন না- অপেক্ষা করতে লাগলেন কতক্ষণে মা আবার শুরু করবেন। আমি ভাবছিলাম এই সহজ যুক্তিগুলো কেন আমার মাথায় আসে নি? যাই হোক মা আবার শুরু করলেন-

"এরপর সাগরের বর্ণনা শুনে বুঝলাম বংশীধরবাবু, কণা, শিঞ্জিনী, মেজদা সকলেরই বেশ কিছু টাকার দরকার। বংশীধরবাবুর মেয়ের এবং ভাইঝি কণার বিয়ের গুরুদায়িত্ব, শিঞ্জিনীর মাথায় বাবার চিকিৎসার অনেক দেনা, মেজদার বাজে খরচের বোঝা । জনার্দন এখানে খুব বড়ো ফ্যাক্টর নয়- গরিব ছেলে। দশ বিশ হাজারই তার কাছে অনেক ।

এরপর আমার মাথায় এলো কাজটা সুন্দর করে সমাধা করার সুযোগ কার বেশি। এখানে দেখলাম জনার্দনের কোন ভুমিকা থাকতেই পারছে না। গেটের ভেতরে তার ঢোকার অনুমতি নেই। তার পক্ষে

কিটক্যাট খুলে ফেলা বা ভিতরে ঢুকে গয়না সরানো সম্ভব নয়। মেজদার পক্ষে কিটক্যাট সরানো হয়তো সম্ভব কিন্তু গয়না সরানো অসম্ভব। তিনি কাউন্টারের ওপারে গিয়ে গয়নার বাক্সে হাত দিলে সবার চোখে পড়ে যাবেন। কারণ কোনদিনই মেজদা আপনার দোকানের কাউন্টারে বসেন না, বা গয়না ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। কাজেই রইল বাকি তিনজন। বংশীধর, কণা আর শিঞ্জিনী।

এইখানে আমার আবার একটা ব্যাপার মাথায় এলো- সাহস। কার পক্ষে কতটা সাহসী হওয়া সম্ভব? চুরি কে করল- এটা নিয়ে হইচই হবেই। আমি চুরি করলাম অথচ আমাকে ধরা যাবে না তখনই, যখন আমি অন্য কারুর ঘাড়ে চুরির দায়টাকে গছাতে পারব। আর যদি সেটা আমি না পারি, ধরা পড়তেই হবে। সেক্ষেত্রে আমার বা আমাদের চাকরিটি যাবে। এইবার আরেকটা দিক ভাবার কথা, এই বাজারে বংশীবাবু ও কণার পক্ষে একসঙ্গে সেই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব কি ? সাগরের মুখে যা শুনেছি একেবারেই সম্ভব নয়। ওঁদের এতদিনের চাকরিটা গেলে ওঁরা আক্ষরিক অর্থেই পথে বসবেন। কাজেই রইল বাকি শিঞ্জিনী আর মেজদা।

এইখানেই সাগর আমাকে বেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়ে তুলেছিল। শিঞ্জিনী মেজবৌদির মাসতুতো বোন। কাজেই মেজদার শালী। কাজেই সন্দেহটা মেজদার ওপরে যেতেই পারত। কিন্তু হঠাৎ করেই খেয়াল হল, শিঞ্জিনীর পরিচয় দেবার সময় সাগরের গলায় খুব একটা আবেগ ছিল- যেটা অন্য কারোর ক্ষেত্রে আমি পাই নি। জিনিসটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলল। সাগর শিঞ্জিনীর জন্মদিন জানে, বয়েস জানে, যেটা যথেষ্ট ঘনিষ্ট না হলে জানার কথা নয়। এতগুলো লোকের এবং কণারও পরিচয় দিল খুব স্বাভাবিক নির্লিপ্ত স্বরে, কিন্তু শুধুমাত্র শিঞ্জিনীর ক্ষেত্রেই সেটা পাল্টে গেল। কেন? সেটা তখনই সম্ভব যখন শিঞ্জিনীর ওপরে ওর একটা গভীর টান থাকে। কাজেই তার বিপদে সাগর

চাইতেই পারে তাকে যেকোনভাবে সাহায্য করতে। ভেবেছিল এতগুলো লোকের মধ্যে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা রহস্য হিসাবেই থেকে যাবে। সকলেই সকলকে সন্দেহ করবে – কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাউকেই নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত করা যাবে না। দু- ছমাস পরে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যাবে দুঃস্বপ্নের মত।"

একটানা কথা বলার পর মা একটু থামলেন। টেবিলে রাখা গ্লাস তুলে এক চুমুকে বাকি শরবৎটুকু খেয়ে গ্লাসটা আস্তে আস্তে টেবিলে রাখলেন, যাতে কোন শব্দ না হয়। ঘরে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ভীষণমামার বাবা ও জেঠু মুখ নীচু করে গভীর চিন্তায় মগ্ন । ভীষণমামার মা প্রথম কথা বললেন কান্নাভেজা স্বরে, "কী বিপদের হাত থেকে যে, তুই আমাদের বাঁচালি, শোভা! গয়না যেত সে তো যেতই। তার চেয়েও বড়ো ক্ষতি হতো এই পরিবারে। আমাদের নিজেরদের সংসারেও ঢুকে পড়তে পারত অবিশ্বাস, সন্দেহ আর অশান্তি। এ বাড়ির তিন ছেলেকে আমরা কেউই আলাদা করে দেখিনি কোনদিন। আমি মুখ দেখাতে পারতাম না রে, তোর জেঠু আর জেঠিমার কাছে । নিধি আর ধারার কাছেও লজ্জা রাখার জায়গা থাকতো? তুই গত জন্মে নির্ঘাৎ আমার মেয়ে ছিলি রে শোভা।"

"বারে, আর এই জন্মে আমি কেউ নই বুঝি?" মায়ের এই কথা শুনে ভীষণমামার মা কান্না ভেজা চোখেও হেসে ফেললেন। বললেন, "তোর সঙ্গে কথায় আমি পারব না রে, পাগলি।" বলে মাকে টেনে নিলেন আরো কাছে। তারপর ভীষণমামাকে বললেন, "কীরে? সেই থেকে বসে বসে নিজের কুকম্মের বৃত্তান্ত গিলছিস, যা না বামুনদিকে গিয়ে বলে সবার জলখাবারটা এখানে পাঠিয়ে দে।"

ভীষণমামা বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে, ভীষণমামার বাবা জেঠুকে বললেন, "কী করা যায় বলতো, দাদা? সব তো শুনলি। আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। ভীষণটা শেষে এমন একটা কাজ করে বসল যে-- "

হঠাৎ মা মাঝখানে বলে উঠলেন, "যদি অনুমতি দেন তাহলে একটা কথা বলি। সাগর সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা আপনারা প্লিজ রাখবেন না। শিঞ্জিনীর পাওনাদারের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়াটা ও চুপ করে সইতে পারে নি। তাকে ও সাহায্যই করতে চেয়েছিল। সেই অসহায়তা থেকেই ওর এমন মতিভ্রম। কাজটা ও ভালোই করতে চেয়েছিল। পথটা ভুল নিয়েছিল এই যা। কাজেই আমাদের সকলেরই উচিৎ ওর পাশে দাঁড়ানো।"

৬

গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে মাকে জিগ্যেস করলাম,"মা তোমার যুক্তি সব তো বুঝলাম। কিন্তু টয়লেটের সিস্টার্নের ভেতর হীরের আংটি আছে তা তুমি কী করে জানলে?"

মা বললেন, "ওটা একটা ক্যালকুলেটেড গেস ছিল, খেটে গেছে। ভেবে দ্যাখ, আগের দিন ওরা বের হবার আগে পর্যন্ত পুলিশ ছিল , আর সকলকে সার্চ করেছিল। কাজেই আংটিটা নিজের কাছে কেউই রাখবে না, বা নিশ্চয় বাইরে পাচার করতেও পারে নি। মোটামুটি নিরাপদ, আর সাধারণত কেউ ওই জায়গার কথা ভাববেও না , তাই ওই জায়গাটাই আমার মনে হয়েছিল।"

গাড়ি চালাতে চালাতে বাবা বললেন, "গোয়েন্দা মিসেস সান্যাল, ভবিষ্যতে বহুলোকের বদ মতলব বানচাল করে দেবে মনে হচ্ছে"।

“কিন্তু বাবা দেখেছো , ফেলুদা যেমন পারিশ্রমিক পেতে, মাকে কিন্তু একটা সন্দেশ খাইয়ে ছেড়ে দিল, কোন পারিশ্রমিকই দিল না।”আমার কথা বাবা উড়িয়ে দিয়ে বললেন-

“ধুস, কটা টাকায় কী আসে যায়? স্যাটিসফ্যাকশানটা চিন্তা কর।”

কিন্তু এই কথার দুদিন পরে ভীষণমামার মা ভীষণমামার সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, আর মায়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন সরু চেনের সোনার হার- তাতে চারটে ছোট্ট হীরে বসানো একটা পেন্ডেন্ট।

ছবিঃ সোমা চক্রবর্তী

চন্দ্রকলা রহস্য

অনন্যা দাশ

"বুবাই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে – এখুনি বেরোতে হবে, দারুণ হবে জরুরি ব্যাপার", লিমা ঘরে ঢুকেই বুবাইকে বলল।

"কী ব্যাপার বলবি তো!"

"চল না যেতে যেতে বলছি – তুই তৈরি হ, আমি জেঠিমাকে বলে আসছি, " বলে লিমা সাঁ করে রান্না ঘরে চলে গেল।

লিমা গজা খেতে খেতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বুবাই রেডি।

"আসছি মা" আর "আসছি জেঠিমা" বলে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। তার আগে অবশ্য বুবাইয়ের ভাই টুবাইকে আটকাতে কিছুটা সময় গেল। টুবাই ক্লাস ফোরে পড়ে – পরদিন ওর ক্লাস টেস্ট বলে জেঠিমা কিছুতেই ওকে যেতে দিলেন না।

নিচে নেমে লিমা বলল, "চল মামার গাড়িতে বসে তোকে সব বলছি। চাবিটা নিয়ে এসেছি, দেখি খুলতে পারি কিনা – মামা একটু পরেই এসে পড়বে, মার সাথে কথা বলছে।"

গাড়িতে বসে লিমা বলল, "রাধাদি, যে আমাদের বাড়িতে কাজ করে, তার বরকে আজ পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? কেন?"

"রাধাদির বর বুধনদা আমার মামার অফিসের একটা গোডাউনের চৌকিদার ছিল এক সময়। পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিল বলে ওকে চাকরি থেকে বার করে দেয় চারমাস আগে। আসলে গোডাউনের ইনচার্জ তার নিজের লোককে ঢোকাবে বলে ওর নামে কাজ ফাঁকি দেয় এই অজুহাত দিয়ে ওর পা ভাঙা অবস্থায় ওকে বার করে দেয়। যাই হোক তারপর তিনমাস ভাঙা পা নিয়ে বুধনদা বাড়িতে বসে ছিল। কিন্তু অন্য একটা কম্পানিতে কাজ পেয়ে গেছে, তবে এই কাজটা দিনের বেলার। এখন হয়েছে কি, মামাদের গুদামে চুরি হয়েছে। গারমেন্টসের চারটে বাক্সে প্রায় ২০০টা এক্সপোর্ট কোয়ালিটির মাল বোঝাই ছিল – সব হাওয়া হয়ে গেছে। নতুন দারোয়ান বলেছে যে সে নাকি কাল রাতে বুধনদাকে দেখেছে। মামা তাই পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে মার আর রাধাদির সাথে কথা বলতে এসেছিল। রাধাদি বলেছে বুধনদা কাল বাড়িতেই ছিল। কিন্তু ওর কথা কি কেউ শুনবে? মামা বলছিল এখান থেকে প্রথমে গোডাউনে যাবে তারপর পুলিশের কাছে তাই আমি ভাবলাম আমরাও না হয় দেখে আসি, কি বল?"

"হ্যাঁ, তুই বা ন্যান্সি ড্রিউ হবার চান্স ছাড়বি কেন?" বুবাই ফোড়ন কাটল।

"তোকেও তো ফেলুদা হবার সুযোগ দিচ্ছি! দেখ যদি কিছু করতে পারিস! " তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "না রে! রাধাদি খুব কান্নাকাটি করছে আর ও তো আমাদের বাড়িতে অনেক দিন কাজ করছে তাই বুধনদাকেও আমরা ভাল করেই চিনি। ও চুরি করবে বলে তো আমার মনে হয় না।"

গোডাউনটা শহর থেকে একটু দূরে ফাঁকা একটা জায়গায়। মামার গাড়িতে করে লিমা আর বুবাই যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছল তখন বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। অন্য লোকজন সব বাড়ি চলে গেছে। শুধু নতুন চৌকিদার রামদীন বসেছিল। মামাকে দেখেই সেলাম করে ছুটে এল।

"সিংজি কোথায় রামদীন? ওনার তো থাকবার কথা ছিল। পুলিশের কাছে যাব বলেছিলাম।"

“সিং সাব একটু বাড়ি গেছেন, বলেছেন এখুনি চলে আসবেন। পুলিশের ওখানে কত দেরি হবে জানা নেই তাই একটু চা- পানি, হেঁ হেঁ- ”

“আচ্ছা ঠিক আছে। কী কী গেছে তার লিস্ট হয়েছে কিনা জানো? আমাকে যা বলা হয়েছিল তা ছাড়া আরো কিছু গেছে কিনা জানো? পুলিশ তো লিস্ট চেয়েছিল, ওদের দেওয়া হয়েছে?”

“হ্যাঁ, গুপ্তা সাব আর সিং সাব মিলে লিস্ট তৈরি করেছেন – উরা কে সাহেব আপনার সাথে?”

“ও, এই আমার ভাগ্নি লিমা আর এটা বুবাই।”

“বহুত আচ্ছা! ” বলে রামদীন মাথা নাড়ল।

রামদীনের হাবভাব লিমার একটুও ভাল লাগছিল না। কেমন একটা হেঁ: , হেঁ: ভাব সব সময়, হাসিটা কিন্তু একেবারে নকল।

বুবাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, “রামদীনদা, তুমি চোরকে দেখেছো?”

রামদীন তো গল্প বলার সুযোগ পেয়ে ভীষণ খুশি। বলল, “কাল রাত তখন একটা হবে, আমার একটু ঘুম চলে আসছিল বলে আমি গোসলখানায় গিয়ে চোখে মুখে একটু জল দিয়ে আসতে গেছিলাম। ফিরে এসে যেই বসেছি, অমনি কি সব ধুপধাপ শব্দ শুনলাম। কৌন হ্যায়, কে কে বলে ছুটে গিয়ে দেখি দুটো লোক বাস্কো নিয়ে পালাচ্ছে – আমি ধরতে ধরতে পালিয়ে গেল! একটা লোককে তো আমি চিনি না, কিন্তু বুধনের মুখ আমি ঠিক দেখতে পেয়েছি চাঁদের আলোয়। আমি তখন সিংজিকে ফোন করলাম, কিন্তু উনি মনে হয় ঘুমোচ্ছিলেন তাই ফোন ধরলেন না। সকালবেলা যখন সবাই এলো তখন উদেরকে বলে আমি শুতে গেলাম। এখন শুনছি চারটে বাস্কো গেছে! ওই বুধন ব্যাটাই নিয়েছে আমি জানি।”

বুবাই মামাকে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, “মামা ও মিথ্যে কথা বলছে! কালকে রাতে তো অমাবস্যা ছিল – টুবাইকে ফেজেস অফ দা মুন পড়াচ্ছিল বাবা কাল। তখন মা পাঁজি দেখে বলে অমাবস্যা নাকি গতকালই ছিল – তাহলে ও চাঁদের আলোয় বুধনদাকে দেখল কী করে?”

“কাল তো অমাবস্যা ছিল তাহলে তুমি চাঁদের আলোয় বুধনকে দেখলে কী করে?” মামা রামদীনকে কথাটা বলতেই রামদীন এক লাফে চেয়ার উলটে ফেলে দৌড়ে পালাল। ওরা তিনজনেই হতবাক!

মামা তক্ষুনি পুলিশ স্টেশানে গিয়ে রামদীনের নামে কমপ্লেন লেখাল আর বুধনকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করল। থানার ও সি বুবাইয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করে মামাকে শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করলেন, "সকালে যখন আমরা বুধনকে অ্যারেস্ট করলাম তখন আপনারা কোথায় ছিলেন?"

মামা বলল, "সিংজী আমাকে খবর দেওয়ার আগেই আপনাদের কাছে বুধনের নামে নালিশ করেছে। আমি সকালে একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে তিনটে নাগাদ জানতে পেরেছি। তখনি আমি লিমা বুবাইকে তুলে গোডাউন থেকে রামদীন আর সিংজীকে নিয়ে আপনাদের কাছে আসছিলাম তদন্ত কতদূর এগোল জানতে।"

ও সি কথা দিলেন বুধনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দেবেন।

* * *

রাত নটার সময় মামার ফোন এলো যে রামদীন আর সিংজিকে পুলিশ ধরে ফেলেছে। চোরাই মাল সব ওদের বাড়িতেই পাওয়া গেছে। চারটে বাক্স ওরা দু তিনদিন আগেই সরিয়েছিল। আজ সকালে গুপ্তাজি মান্থলি স্টক চেক করছেন দেখে ওদের মাথায় বাজ পড়ে। নিজেদের গা বাঁচাতে ওরা বুধনের নামে চুরির দোষ চাপায়। গুপ্তাজি মাল শর্ট পান এবং তখন সিংজি বুধনের নামে পুলিশে রিপোর্ট করে দেন। পুলিশ এসে বুধনকে ওর কাজের জায়গা থেকে ধরে নিয়ে যায়। সিংজি ভাবতে পারেননি যে রামদীনের রঙ চড়ানোর অভ্যাসটাই ওদের ধরিয়ে দেবে! আসলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

লিমা বুবাইকে খবরটা দিতে বুবাইদের বাড়ি গেল। খবরটা বুবাইকে দিয়ে বলল, "জানিস মামা জিজ্ঞেস করছিল তোর কী ভাল লাগে?"

"তুই কী বললি?"

"আমি বললাম ক্রিকেট, আবার কি! মামা বলেছে এবার ইডেনে যে ওয়ান ডে ম্যাচটা আছে তার টিকিট যোগাড় করবে আমাদের জন্যে – দারুণ হবে তাই না? আমরা মাঠে গিয়ে ম্যাচ দেখব! "

পিছন থেকে টুবাই বলে উঠল, "আমাকে নিয়ে যাবে তো?"

"নিশ্চয়ই নিয়ে যাব – তোর ওই ফেজেস অফ দা মুনের জন্যেই তো আসল চোর ধরা পড়ল, " লিমা হাসতে হাসতে বলল।

ছবিঃ সংঘমিত্রা

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

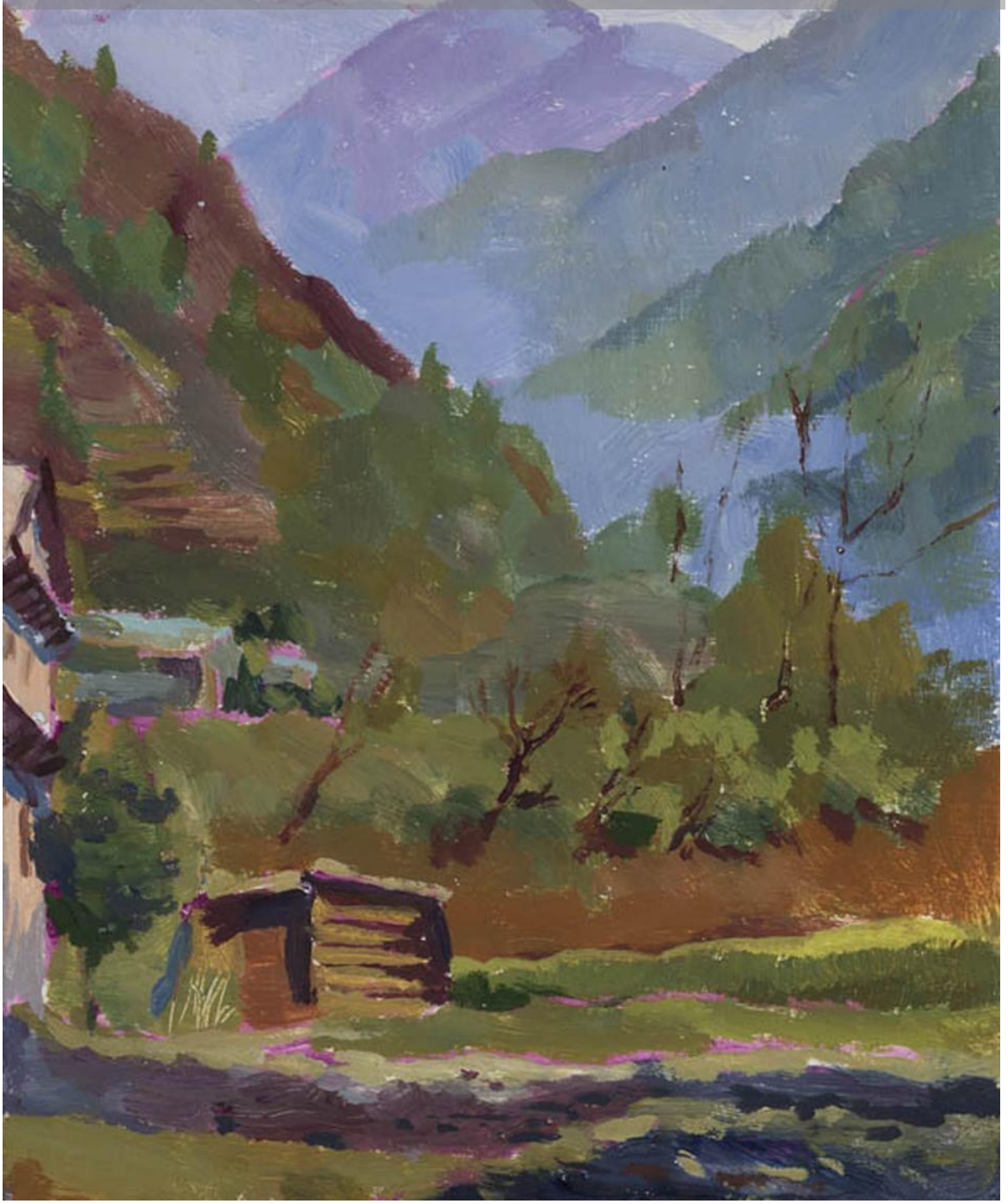

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, '' জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর.....''

ওয়ান

গাড়োয়াল কুমায়ুনের পাহাড়ে অন্যতম দেবী নন্দা। তিনি হলেন হিমালয়ের মেয়ে। শিবঠাকুরের বউ। কিন্তু শিবঠাকুর তো খ্যাপা, তাই মাঝে মাঝেই তার মনের নাগাল পেতে ভক্তদের তো বটেই দেবী নন্দাকেও যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হত। আর শিবঠাকুর তো থাকেন একেবারে হিমালয়ের নির্জন স্থানে। ফলে সে জায়গা বেশ দুর্গম আর সেখানে যাওয়াও বেশ কষ্টকর। তো দেবী নন্দা ঠিক করলেন সেখানে গিয়েই শিবের তপস্যা করবেন। যদি শিবঠাকুর দেখা দেন, অনেকদিন তার দেখা নেই কি না! যেই ভাবা সেই কাজ। নন্দা তো চললেন। সঙ্গে রইল তার সাঙ্গোপাঙ্গো পাখপাখালি জন্তুজানোয়ার সাপ

বাঘ যাবতীয়। চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে বাঘেরা বলল আর পারছি না। তারা ওইখানেই থামল। সে জায়গার নাম হল বগুয়াবাসা। তারপর এক জায়গায় পৌঁছে সাপেরা বলল আর পারছি না, সে জায়গার নাম হল চিরিনাগ। তারপর জিউনার গলি, অর্থাৎ মৃত্যু গলি, সেসব পেরিয়ে দোদাং, দুই বিশাল পাথরের অবস্থান। তারপর হোমকুণ্ড। সেখানে গিয়ে নন্দা উপাসনা করে শেষে শিবের দেখা তো পেলেন।

বহু বহু বছর আগে রাজা যশোদয়াল নামে এক রাজা আর তার রানি, লোক-লশকর, পাইক- পেয়াদা, গাইয়ে- বাজিয়ে, রসুইকর, হালুইকর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঠিক করলেন ওই পথেই যাবেন পুণ্য সঞ্চয় করতে। তো চললেন রাজা। পৌছলেন বৈদিনি বুগিয়ালে। রাজারাজড়ার ব্যাপার। হই- হট্টগোল আমোদপ্রমোদ হল খুব। এমনি করে

রাজা পৌঁছলেন কৈলু বিনায়কের নিচে। কৈলু বিনায়ক গণেশের জায়গা। উনি হলেন প্রহরী। তাঁকে পার হয়ে তবেই না তার মা বাবার রাজত্বে ঢুকবে! তো কৈলু বিনায়ক পাহাড়ের নিচে তাঁবু ফেললেন রাজা। রাজার তো আমোদপ্রমোদের শেষ নেই। তাই বিশ্রামের সময়ে রাজার নর্তকীরা নাচ দেখাতে শুরু করলেন। সে নাচ রাজার পছন্দ হল না। তিন নর্তকীকে নিষ্ঠুর রাজা তিনটে গর্ত করে পুঁতে ফেলবার আদেশ দিলেন। সেইখানে পাথরচাপা হয়ে রইলো বেচারারা। সেই থেকে জায়গাটার নাম হল পাথরনাচুনি। এসব দেখে দেবী নন্দা একটু রুষ্টই হলেন। তবু তিনি কিছু বললেন না। রাজা বগুয়াবাসা পৌঁছলেন। সেখানে রানি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাজা পাথরের ঘর তৈরি করে লোক-

লশকর সেখানে রাখলেন রানির দেখভালের জন্য। কয়েকদিনের মধ্যে রাজার ফুটফুটে ছেলে হল। দেবী এবারে বিষম রেগে গেলেন। রাজা ততক্ষণে কিছু সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে চননিয়াকোট পাহাড় ডিঙিয়ে রূপকুন্ডে পৌঁছেছেন। হিমালয়ের অত উঁচুতে অপরূপ হ্রদ। হাতছোঁয়া দূরত্বে ত্রিশূল পর্বত। কিন্তু দেবী তো রাগ করেছেন। তিনি তার খুব কাছের এক লৌকিক দেবতা লাটু মহারাজকে ডেকে বললেন তুমি ঝড়বৃষ্টি আনো। আর অমনি শুরু হল প্রচণ্ড জলঝড় , তুষারপাত। কেউই রেহাই পেল না। সকলেই মারা পড়ল। বরফচাপা হয়ে পড়ে রইল অনন্তকালের জন্য। আজও তাদের হাড়গোড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেখানে।

এই লাটু দেবতার একটা মন্দির আছে ওয়ান গ্রামে। প্রতি বছর দেবী নন্দার শিবের বাড়ির যাত্রা স্মরণ করে গ্রামের লোকেরা নন্দামায়ের মূর্তি নিয়ে হুবহু ওই যাত্রা সম্পন্ন করেন, আজও। তাকে বলে নন্দাজাত। বারো বছর অন্তর অন্তর হয় বড়ি নন্দাজাত। সবচেয়ে বড়ো নন্দাজাতটি শুরু হয় ওয়ান গ্রাম থেকেই। কুমায়ুনের গোয়ালদাম থেকে উত্তরে দেবল। সেখান থেকে মান্দানি লোহাজং হয়ে ওয়ান। আমরা যে বারে ওয়ান গ্রামে যাই তখন লোহাজং অবধি ছোট গাড়ি যেত। এখন অবশ্য ওয়ান গ্রাম অবধিই গাড়ি চলে যায়।

দেবলে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন নাথুজি। নাথু সিং বিশ্‌ত। এলাকার নামকরা গাইড। সেখান থেকে লোহাজং পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুটো। পড়ন্ত বেলায় হাঁটার ইচ্ছে না থাকলেও একরকম জোর করেই সকলে বলল চলো। তো আমরাও চললাম। সবুজের সমারোহ চারপাশে। তারই মাঝখান দিয়ে হাঁটা। সেবার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হল। এমনটা কখোনো হয়নি তার আগে। লোহাজং থেকে ওয়ান গ্রাম অনেকখানি পথ । আমরা কয়েকজন ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম। যেতে যেতে সন্ধে নেমে এল। আকাশজুড়ে চাঁদ উঠল। পূর্ণিমার চাঁদ। একদম নিঁখুত গোল। মেঘ নেই আকাশে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। রাস্তার পাশ দিয়ে যে ঝরনা বয়ে গেছে সেই বয়ে যাওয়া জলের ওপর রুপোলি জ্যোৎস্না পড়ে এক আশ্চর্য দৃশ্যের জন্ম দিয়েছে। চাঁদের মায়াবি

আলোয় আমরা একে অন্যকে দেখতে পাচ্ছিলাম স্পষ্ট। কেমন নরম, হালকা আর ঘুম ঘুম। পথের ধারে পাথরের ওপর অনেকবার বসলাম আমরা বিশ্রাম নেবার জন্য। আমাদের শরীর জুড়িয়ে এল, চোখে লেগে রইল চাঁদের আলো।

গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছলাম একটা দোকানঘরের সামনে। তখন

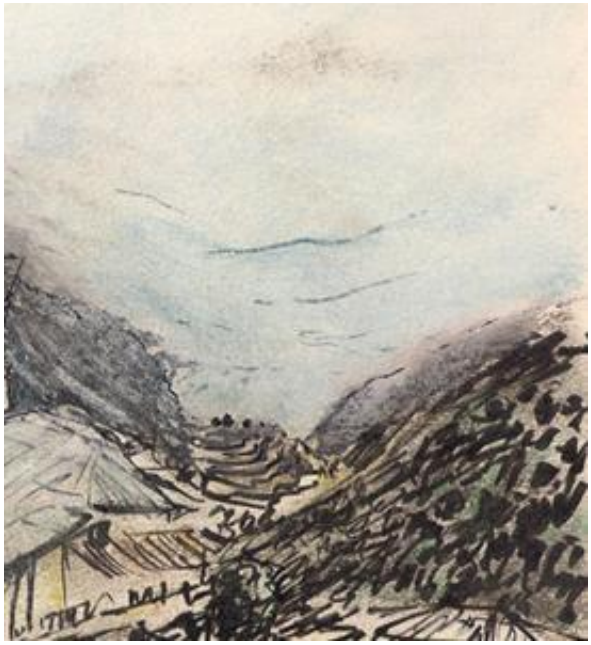

সাড়ে সাতটা। নিচে দোকানঘর আর ওপরে একটা থাকবার জায়গা। সারি সারি খাট পাতা তাতে। ওখানেই থাকার ব্যবস্থা হল সে রাতে। আমাদের খাইয়েদাইয়ে নটার মধ্যেই দোকানি দোকানঘরে তালা দিয়ে বাড়ি চলে গেল। গ্রাম নিঃঝুম। মনে হচ্ছে গভীর রাত। দোকানঘরের ওপরে আমাদের থাকবার ঘরের লাগোয়া একটা খোলা বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি অসংখ্য তারা। ফুটফুট করছে। কলকাতার আকাশে আমরা অত তারা দেখতেই পাই না। ধোঁয়া ধুলো আর শহরের জোরালো আলোয় ঢাকা পড়ে থাকে আকাশের তারাদের দল। ওয়ান গ্রামের আকাশের অত তারা দেখে আমাদের মুগ্ধতার সীমা রইল না।

রাতে ঠান্ডা পড়েছিল বেশ। ভোর ভোর দোকানি এসে ডেকে তুলল আমাদের। ভোরবেলার রোদ্দুর গায়ে লাগিয়ে আমরা বাইরে এলাম। ওয়ান বেশ বড়ো আর সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামের ভেতরে পায়ে হাঁটার জন্য কংক্রিট অথবা পাথরফেলা রাস্তা। পাহাড়ের কোলে অনেকটা জায়গা ছড়ানো গ্রাম। তার পূর্ব দিকে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে বৈদিনি বুগিয়ালে যাবার রাস্তা। ওইদিকে একটু উঠে লম্বা লম্বা পাইন গাছের সারি ঘেরা ব্রিটিশ আমলের বনবাংলো। অত সুন্দর বাংলো দেখে ভেতরে যাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। ভিজিটর বুকে বাঘা বাঘা পর্বতারোহী, অভিযাত্রীদের নাম ও মন্তব্য। আরও খানিক এগিয়ে গেলে লাটু দেবতার মন্দির। নন্দা মাতাজির কাছের লোক। তাঁর ইচ্ছেতেই মেঘ ঝড় জল বৃষ্টি। গ্রামের লোকেরা লাটুমহারাজকে দারুণ মানে। না মেনে উপায়ই বা কী। আর পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের মতোই ওয়ান গ্রাম। শুধু নন্দা যাত্রার আলাদা মহিমা তাকে বিশিষ্ট করেছে। প্রতিবছর বর্ষাকালে নন্দাজাত- এর সময় মেলা বসে। সরকারি তত্ত্বাবধানে নানারকম কর্মকাণ্ড চলে। এলাকার মানুষজন সেই সব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। উৎসবে মেতে ওঠে পাহাড়।

আমাদের বেশ কয়েকজন মালবাহকের প্রয়োজন ছিল। নাথুজিকে সেকথা জানাতে উনি গ্রামে বেরিয়ে পড়লেন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে জনা পাঁচেক লোক এসে হাজির হল। সকলেই যেতে রাজি। হাসিমুখ। যেন এর অপেক্ষাতেই বসেছিলেন তারা। এদের মধ্যেই একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখে আমরা বললাম, "এও যাবে?"

বড়জোর তেরো চোদ্দ বছর বয়েস। নাম জিজ্ঞেস করাতে একগাল হেসে বল নাথু সিং বিশ্‌ত। মানে আমাদের গাইড সাহেবের নামেই তার নাম। তো আমরা তাকে ছোটু নামেই ডাকতে থাকলাম। বাড়ির বড় ছেলে সে। অভাবের সংসারে রোজগারের ফিকির খুঁজতেই হয়। সুযোগ পেয়ে সেও এসেছে গায়ে খেটে যদি কিছু রোজগার হয়। সুতরাং সে আমাদের সঙ্গী হল।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ছোটু অসম্ভব কাজের এবং কষ্টসহিষ্ণু। খুব তাড়াতাড়ি সে আমাদের সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। জল এনে দেওয়া, রান্নার কাজে সাহায্য, ব্যাগ গুছিয়ে দেওয়া, থাকার জায়গা গুছিয়ে রাখা, হেন কাজ নেই সে আগ বাড়িয়ে করছে না। মাল বওয়া তো আছেই। তড়তড় করে বোঝা পিঠে সকলের আগে আগে চলেছে সে। কিন্তু মুখে কথা বিশেষ নেই। লাজুক প্রকৃতির। কেবল হাসি। আমাদের হাঁটার পর্ব শেষ হলে যেদিন বাড়ি ফেরার পালা, সেদিন দেখি, আশ্চর্যজনকভাবে শিস দিতে দিতে চলেছে ছোটু। ব্যাপার কী? জানা গেল বাড়ি যাবার খুশিতে।

"কী নিয়ে যাবি বাড়িতে?"

"ভাইয়ের জন্য জামা, বোনের জন্য চিরুনি, মায়ের জন্য চাদর।"

"আর তোর জন্য?"

"আপ লোগো কি তসবির। আপনাদের ছবি।"

ছেড়ে আসার সময় খুব কষ্ট হচ্ছিল ওয়ান গ্রামের ছোটুর জন্য। ওকে বললাম, "আয় তোর একটা ছবি তুলে নিই।"

সে বেশ গুছিয়ে একটা টিলার মাথায় বসল। পেছনে নন্দাঘুন্টির চূড়া। ছবি তুলে নিয়ে কলকাতায় ফেরার পর সে ছবি দেখে "ছোট্ট বুদ্ধ" ছাড়া আমার আর কিছু মনে হয়নি। সে ছবি এখনও আছে আমার কাছে। এর বছর সাতেক বাদে ওই অঞ্চলে একবার যাবার সুযোগ হয়। তখন ছোটুর খোঁজ নিয়েছিলাম। শুনি সে দিল্লি চলে গেছে। সেখানে কোথাও কোনো কারখানায় চাকরি করে। বাড়ির বড়ো ছেলে, তাকেই সংসারের জোয়াল ঘাড়ে নিতে হয়েছে। ভালো কথা হল ভাই বোনকে সে ইস্কুলে ভর্তি করেছে। তাদের লেখাপড়া শেখার দায়িত্বও যে তারই।

ছবিঃ সংগৃহীত

শলকেনের ছবি

জোসেফ শেরিডান লে ফানু

অনুবাদঃ মহাশ্বেতা

দ্বিতীয় পর্ব

"মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেন!" সারাদিন ধরে জেরার্ড ডাউ নিজের মনেই নামটা বারবার আওড়াতে লাগলেন। "রটারড্যামের মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেন! গতকালই প্রথম লোকটার নাম শুনলাম। কী চান তিনি? আমায় দিয়ে ছবি আঁকাবেন, না কোন গরীব আত্মীয়কে কাজ শিখতে পাঠাবেন আমার কাছে, নাকি নিজের কোন সংগ্রহের মূল্য ঠিক করাতে চান আমায় দিয়ে, নাকি-- ধ্যাৎ! না, রটারড্যামে আমার নামে সম্পত্তি রেখে যাওয়ার কেউ নেই। যাই হোক, সন্ধ্যেবেলাই জানা যাবে।"

অবশেষে দিন শেষ হয়ে এল। অন্ধকার নামতে লাগল ধীরে ধীরে। আঁকার ঘরটা আবার আগের দিনের মতই শুনশান হয়ে উঠেছিল। তাতে তখন শুধুই শলকেন ও জেরার্ড ডাউ। তিনি অবশ্য অস্থির ভাবে পায়চারী করছিলেন। মনে তার দুশ্চিন্তা ও প্রতীক্ষার অধিরতা। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে কোন অনুপস্থিত ছাত্রের কাজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। আর ঘন ঘন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার স্টুডিওর পাশের ঘিঞ্জি গলিতে মানুষের চলাচল দেখছিলেন চিন্তিত মুখে।

বেশ কিছুক্ষণ টানা তাকিয়ে থাকবার পর ডাউ শলকেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "গডফ্রে, তুমি আমায় ঠিক কী বলেছিলে যেন? স্ট্যাডহাউসের ঘড়িতে ঠিক সাতটা বাজলে ভদ্রলোক আসবেন বলেছেন, তাই তো?"

"না, সেরকম কিছু নয়, স্যার। আসলে গতকাল ঠিক ওই সময়ই উনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আরকি।" শলকেন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল।

"তাহলে তার আসার সময় তো প্রায় হয়ে এল দেখছি।" পকেট থেকে একটা কমলালেবুর মত বড় ঘড়ি বের করে সময় দেখে বললেন তিনি, "নামটা কী বললে যেন- মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"বয়স্ক ভদ্রলোক, পরণে মূল্যবান পোশাক?" ডাউ চিন্তামগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করে চললেন।

"হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম। খুব বয়স্ক নন আবার একেবারে তরুণও নন। প্রৌঢ় বলা চলে। আর তাঁর পোশাক বেশ ধনী ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ত বলেই মনে হল দেখে।"

ঠিক সেইসময় বাইরে থেকে স্ট্যাডহাউজের ঘড়িতে সাতটা বেজে উঠল ঢং ঢং করে। শিক্ষক ও ছাত্র দুজনেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সদর দরজার ওপর। ঘন্টার শেষ ঘায়ের শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়ার পরই ডাউ বলে উঠলেন, "বেশ, তাহলে তাঁর আসার সময় হল, অবশ্য যদি তিনি আদৌ সময়মত আসতে মনস্থ করেন। যদি না করেন, তাহলে

গডফ্রে, তুমি তাঁর জন্য অপেক্ষা কোরো। কিন্তু যদি এটা ভ্যাঙ্কার্প বা ওরকম কোন ফক্কড়বাজের ঠাট্টা হয়? ইস! গডফ্রে, তোমার না একটু সাহস করে কালকেই তাকে ভালভাবে যাচাই করে দেখে নেওয়া উচিৎ ছিল, সে আসলেই সেই ব্যক্তি কিনা। আমি এক ডজন রেনিশ বাজি রেখে বলতে পারি যে একটু টানাটানি করলেই লোকটির স্বরূপ বেরিয়ে পড়ত। দেখতে ঠিক ওই পরিচিত কেউ বোকা বানাতে চলে এসেছে আমাদের। আমরা গরিব শিল্পী, আমাদের বোকা বানিয়ে যে কী আনন্দ এরা পায় তা ঈশ্বর--- ”

“ওই, উনি আসছেন স্যার।” শলকেন নিচু গলায় বলল। সেই মুহূর্তে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জেরার্ড ডাউ দেখলেন সেই রহস্যময় মূর্তিটিকে, যে আগের দিন আচমকাই শলকেনকে দেখা দিয়েছিল।

মূর্তিটি কেমন যেন একটা অস্বস্তিকারক আভাস দিচ্ছিল যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিজ্ঞ শিল্পীকে বুঝিয়ে দিল যে ব্যাপারটা ঠাট্টা বা তামাশা নয়, একেবারেই গুরুতর। সে ব্যক্তিকে ভয় না করলেও অন্তত সম্ভ্রম করে চলা উচিৎ। অতএব ডাউ ভদ্রতার খাতিরে তার টুপিটা নামিয়ে রেখে বিনীতভাবে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বসতে বললেন। অতিথি অবজ্ঞার সাথে হাত নাড়িয়ে সেসব স্বীকার করলেন কিন্তু বসলেন না, সেই একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

“আমার সৌভাগ্য যে হুজুর আমার বাড়িতে পায়ে ধুলো দিয়েছেন। আপনিই রটারড্যামের মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেন নিশ্চয়ই?” জেরার্ড ডাউ আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন অতিথিকে।

“হ্যাঁ। আমিই।”

“শুনলাম, হুজুর আমার সাথে কথা বলতে চান।” ডাউ বিনীতভাবে বলে চললেন, “আমি কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষায়—”

তাকে কথাটা শেষ না করতে দিয়েই আগন্তুক শলকেনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই ছেলেটি কি বিশ্বাসযোগ্য?”

“নিশ্চয়ই!”

“তাহলে ওকে এই বাক্সটা কাছাকাছি কোন গয়নার দোকানে অথবা স্যাকরার কাছে নিয়ে গিয়ে এর ভিতরের যাবতীয় সামগ্রীর দাম যাচাই করে নিয়ে আসতে বল। যাচাই করা দামের একটা লিখিত প্রমাণপত্রও যেন ও নিয়ে আসে।”

এই বলে সে একটা ছোট্ট চৌকো বাক্স জেরার্ড ডাউয়ের হাতে দিল। বাক্সটার এরকম আচমকা আগমন আর অত ছোট্ট বাক্সের ভারী ওজন দেখে ডাউ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিন্তু বেশি উচ্চবাচ্য না করে তিনি শলকেনের হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল।

শলকেন ক্লোকের তলায় বাক্সটাকে সেঁধিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর জোর পায়ে দুটো সরু গলি ছাড়িয়ে অবশেষে একটা বাড়ির সামনে থামল। বাড়িটার একতলায় এক ইহুদি স্যাকরার দোকান। সে দোকানে ঢুকে সেই ইহুদি স্যাকরার নাম ধরে ডাকল।

দোকানের পেছনদিকে অন্ধকার একটা কোণা থেকে খচমচ করে বেরিয়ে এলেন ছোটখাটো একজন ভদ্রলোক। শলকেন ক্লোকের তলা থেকে ভ্যান্ডারহাউজেনের দেওয়া সেই বাক্সটা বের করে তার সামনে রাখল। লন্ঠনের উজ্জ্বল আলোয়ে দেখা গেল গোটা বাক্সটাই সীসের পাতে মোড়া। বাইরের দিকটা বেশ ময়লা। ঘষা খাওয়ার চোটে সাদাটে হয়ে গেছে। সীসের পরতটাকে কিছুটা সরাবার পর তার নিচে একটা শক্ত কাঠের বাক্স পাওয়া গেল। সেটাকে বেশ

জোর দিয়ে খোলা হল, তারপর তার মধ্যে কাপড়ের ভাঁজ খুলতে খুলতে শেষ পর্যন্ত যা দেখা গেল তা দেখে দুজনেই চমকে উঠল। বেশ কয়েকটা চকচকে সোনার বাট, আঁটোসাঁটোভাবে সাজানো। স্যাকরা প্রত্যেকটা বাঁটকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিয়ে বলেন, ‘‘একেবারে খাঁটি, উৎকৃষ্ট মানের সোনা।’’

ভদ্রলোক সোনার পিন্ডগুলোকে ছুঁয়ে, ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটা অদ্ভুত সুখ পাচ্ছিলেন, আর বারংবার বলে উঠছিলেন, “মেইন গট! মেইন গট! কি নিখুঁত! একফোঁটা ভেজাল নেই! আহ—কি সুন্দর! কি সুন্দর!” কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর পরীক্ষা শেষ হল, তারপর নিজের হাতে একটা প্রমাণপত্র তৈরি করে তাতে সোনাটার দাম তিনি লিখলেন প্রায় বেশ কয়েক হাজার রিক্স-ডলার।

প্রমাণপত্রটা পকেটে পুড়ে, দুর্মূল্য সোনার বাক্সটা বগলে রেখে ক্লোক দিয়ে ঢেকেঢুকে নিয়ে শলকেন ফের স্টুডিয়োয় ফিরে এল। ঘরে ঢুকে দেখে তার শিক্ষক ও আগন্তুকটি ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে জরুরি আলোচনা করছেন। শলকেন ঘর থেকে বাক্স নিয়ে বেরোনো মাত্রই ভ্যান্ডারহাউজেন ডাউকে কয়েকটি কথা বলেছিলেনঃ

“আমি তোমার সাথে কয়েক মিনিটের বেশি আজ সময় কাটাতে পারবো না, অতএব আমি কী কাজে এসেছি সেটা সংক্ষেপে বলে দিই। তুমি রটারড্যাম শহরে কয়েক মাস আগে গিয়েছিলে। তখন সেইন্ট লরেন্স গির্জায় তোমার ভাইঝি, রোজ ভেল্ডারকস্টকে আমি দেখেছিলাম। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আর আমি যদি তোমায় বিশ্বাস করাতে পারি যে তার জন্য তোমার জোটানো যেকোন পাত্রের চেয়ে আমি বেশি ধনী, তাহলে আশা করছি তুমি আমার এই প্রস্তাব তোমার ভাইঝিকে অভিভাবক হিসেবে জানাবে, ও অনুমোদন করবে। তুমি যদি রাজি থাকো, তাহলে আমাদের আলোচনা এখনই শেষ করবো। আমি হিসেব- নিকেশের জন্য অপেক্ষা করতে পারবো না।”

জেরার্ড ডাউ এই কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন, কিন্তু তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করার সাহস পেলেন না। এই ভয়টা শুধু সাধারণ বিচক্ষণতা বা ভদ্রতা থেকে নয়। আগন্তুকের সান্নিধ্যে ডাউয়ের একটা অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি হতে লাগল, যা সাধারণত অজান্তে সহজাত ভীতির বস্তুর উপস্থিতিতে মানুষ অনুভব করে থাকে। একটি অনির্দিষ্ট অথচ শক্তিশালী অনুভূতি।

সেই বিচিত্র আগন্তুকের সঙ্গে সেই টিমটিমে আলোয় একা বসে ডাউ তাঁকে ঠিক চটাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। বেশ কয়েকবার উত্তর দিতে গলা খাঁকারি দিয়েও থেমে গেলেন ডাউ। তারপর কিছুক্ষণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বললেন, “আপনি যে প্রস্তাবটি দিলেন, সেটা যে আমার ভাইঝির পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের ও সম্মানজনক, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার একটা কথা ভাবা উচিৎঃ তার নিজেরও একটা মত আছে এ বিষয়ে। আমরা যেটা তার পক্ষে শুভ মনে করি সেটা তার ইচ্ছে নাও হতে পারে।“

“আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করো না, শিল্পীমশায়,” ভ্যান্ডারহাউজেন বলল, “তুমি ওর অভিভাবক, তোমার সন্তানতুল্য সে—তুমি তাকে যা বলবে সেটা তার পক্ষে অপরিহার্য। অতএব বিয়ে সে আমায় করবেই, তুমি যদি তাকে জোর দিয়ে বল। বলতে বলতে আগন্তুক ডাউয়ের দিকে এগিয়ে এল, তার চকচকে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে ডাউ মনে মনে কামনা করতে লাগল

শলকেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক।

“আমি তোমার হাতে আমার ধন- সম্পদের একটা প্রমান দিতে চাই, ও তোমার ভাইঝির সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করার জন্য তার কিছুটা জামিন হিসেবেও রেখে দিতে চাই। তুমি ও সেই মেয়েটা উপযুক্ত পাত্রের কাছে কত ধন আশা কর? আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রায় পাঁচগুণ মূল্যের সম্পদ নিয়ে ওই ছোকরা ফিরে আসবে। এর পুরোটা আমি কন্যাপণের সাথে তোমার হাতে তুলে দেব, আর তুমি সেই গোটা টাকাটা দিয়ে তোমার রোজের পক্ষে যা ভাল মনে হয় তাই করবে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন সেটা তার নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে থাকবে। এবার কী মনে হয়, শিল্পী মশায়? আমি কি অত্যাধিক উদারতা দেখাচ্ছি না?”

ডাউ মাথা নাড়ল ও মনে মনে স্বীকার করল যে তার ভাইঝির ভাগ্য সত্যিই খুব ভাল, আগন্তুক শুধু ধনীই নয়, যথেষ্ট উদারহস্তও বটে আর এমন প্রস্তাব রোজ রোজ আসে না, অতএব একে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করাটা তাদের পক্ষে বোকামোর কাজ হবে। রোজের বিশেষ নাক- উঁচুমি

ছিল না কোন কালেই। তার নিজের নিজস্ব টাকাও ছিল খুব কম, আর তার পুরোটাই তার ভালমানুষ কাকার দেয়া। তাছাড়া তার বাছবিচার করারও বিশেষ কোন অধিকার ছিল না, কারণ পারিবারিক দিক থেকে অভিজাত কোনরকম রক্ত ছিল না তার মধ্যে। আর যে কটা আপত্তির কারণ হতে পারত, সেই যুগের ধর্মানুসারে সেগুলোর কথা জেরার্ড ভেবেও ভাবল না। তবে ভাইঝির কথা ভেবে সে শেষবারের মত আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল, "মহাশয়, আপনার প্রস্তাবটি খুবই উদার, কিন্তু আপনার বংশপরিচয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা এ বিষয়ে কিছুই তো আমি জানিনা, তাই মনে একটা দ্বিধা। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন আমায়?"

আগন্তুক হাল্কা বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিল, "আমার সম্মান নিয়ে তুমি বেশি মাথা ঘামিও না এখন। নিজের যা ইচ্ছে ভেবে নাও। বেশি প্রশ্ন করে আমায় জ্বালিও না। আমি যেটুকু প্রকাশ করতে চাই তার চেয়ে একচুলও বেশি তথ্য তুমি পাবে না। আপাতত আমার কথাই আমার সম্মানের পরিচয় হিসেবে খাটবে। অবশ্য সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি যদি আদর্শবান হও তাহলে আমার কথাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তুমি যদি বৈষয়িক হয়ে থাক, তাহলে তোমাকে যে সোনা দেব তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।"

"বুড়ো বড়ই খিটখিটে", ডাউ ভাবল, যা মনে করেছে একে বারে নিয়েই ছাড়বে। "অথচ সব সত্ত্বেও তার প্রস্তাব প্রতাখ্যান করারও আমার কোন কারণ নেই। যাহোক, শুধু শুধু আমি কোন প্রতিশ্রুতি দেব না তাকে।"

"শুধু শুধু তুমি আমায় কোন প্রতিশ্রুতি দেবে না তো?" ভ্যান্ডারহাউজেন অপ্রত্যাশিত ভাবে ডাউয়ের মনের কথাটাই বর্ণে বর্ণে বলে দিল, "কিন্তু আমার মনে হয় যদি পরিস্থিতি সেরকম হয়ে দাঁড়ায় তুমি তা করতে বাধ্য হবে। ঠিক আছে, আমি তোমায় এখনি দেখিয়ে দেব যে পরিস্থিতি গুরুগম্ভীরই বটে। তোমার কাছে যে সোনাটা আমি রেখে যেতে চাইছি তা যদি যথেষ্ট হয়, আর তুমি যদি না চাও যে এই মুহূর্তে আমি আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিই, তাহলে আমার চলে যাওয়ার আগে তোমায় একটা চুক্তিতে সই করতে হবে।"

এই বলে সে শিল্পীর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল। তার শর্তের বিষয়বস্তু হল এইঃ "যদি জেরার্ড ডাউ এই চুক্তিতে সই করেন তাহলে তিনি রটারড্যামের উইলকেন ভ্যান্ডারহাউজেনকে তার ভাইঝিকে বিবাহসূত্রে দান করবেন এই দিনের ঠিক এক সপ্তাহ পরে।" ডাউ মন দিয়ে কথাগুলো বারবার পড়ছিল, এমন সময় শলকেন ঢুকে স্যাকরার লেখা প্রমাণপত্র ও বাক্সটা আগন্তুকের হাতে দিল। তারপর না দাঁড়িয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় ভ্যান্ডারহাউজেন গম্ভীর গলায় তাকে থামতে বলল। ডাউয়ের হাতে সে শলকেনের আনা জিনিসগুলো ধরিয়ে দিয়ে চুপ করে তাকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ভ্যান্ডারহাউজেনই বলে উঠল, "কি বুঝছো, শিল্পী মশায়, খুশি?"

ডাউ উত্তরে বললেন যে তিনি ভেবে দেখবার জন্য আরেকদিন সময় চান।

তার উত্তরে ভ্যান্ডারহাউজেন উদাসীনভাবে বলল, "আর এক ঘন্টাও তুমি পাবে না।"

"বেশ," ডাউ নিরুপায় ভাবে উত্তর দিলেন, "আমি রাজি। আপনার শর্ত আমি মেনে নিলাম।"

"তাহলে দেরি কিসের! এখনি সইটা করে দাও!" ভ্যান্ডারহাউজেন বলে উঠল, "আমি বড়ই ক্লান্ত।"

সে এবার একটা বাক্স থেকে লেখার সরঞ্জাম বের করে ডাউকে দিয়ে কাগজটাতে সই করিয়ে নিল।

"এই ছোকরা সাক্ষী থাকুক এই চুক্তির," ভ্যান্ডারহাউজেন গম্ভীর গলায় আদেশ করল, আর নিজের অজান্তেই শলকেন সাক্ষী হল এমন একটা ঘটনার যা তার থেকে চিরতরে ছিনিয়ে নিল তার প্রিয় রোজ ভেল্ডারকস্টকে।

সই শেষ হলে ভ্যান্ডারহাউজেন তার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে একটা ভেতরের পকেটে ভরে নিয়ে, বেরিয়ে যাওয়ার তোড়জোর শুরু করল। কিন্তু যাওয়ার আগে বলে গেল, "আমি কাল রাতে ঠিক নটার সময় তোমার সাথে আবার দেখা করতে আসব। তোমার বাড়িতে আসব, স্টূডিয়োয় নয়, আর রোজের সাথে দেখা করব।" বলে সে প্রায় হনহন করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এইবার শলকেন আগের দিনের রহস্যটাকে ভেদ করার জন্য আগেভাগেই জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, সদর দরজাটায় চোখ রাখবার জন্য। কিন্তু এবারও সে ধাঁধার সমাধান করতে পারল না। খালি তার সন্দেহই বাড়িয়ে তুলল, কারণ সে প্রায় আধঘন্টা একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও কাউকে বের হতে দেখলনা রাস্তায়। ব্যাপারটা শুধু চিন্তারই নয়, ভয়েরও বটে। সে আর তার শিক্ষক বাড়ি ফিরতে হাঁটা লাগালো, আর রাস্তায় বিশেষ কথাবার্তা হল না তাদের মধ্যে। দুজনের মাথাই নিজস্ব চিন্তায় ভরা, দুজনেরই অনেক দুশ্চিন্তা ও আশা। কিন্তু শলকেনের চিন্তার প্রিয় বিষয় সুন্দরী রোজ। তাকে ঘিরে তার যত আশা ও সুখের স্বপ্ন, সব যে ধুলিসাৎ হতে চলেছে তা সে ঘুণাক্ষরেও জানতো না। ওদিকে জেরার্ড ডাউও শলকেনের এই ইচ্ছার কথা জানতেন না। আর জেনে থাকলেও তা হয়তো মিনহির ভ্যান্ডারহাউজেনের আদেশের পথে বিশেষ কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতো না। সে গরীব ছাত্র, শিক্ষকের দয়ায় নিজেকে তৈরি করছে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য, আর কোথায় সেই ধনী অভিজাত লোক, যে অবহেলায় একগাদা সোনার বাঁট দিয়ে দিতে পারে এক অজানা লোকের হাতে!

ডাউ কিন্তু এই গোটা প্রস্তাব ও চুক্তির ব্যাপারে রোজকে কিছুই বললেন না। রোজ যে এতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল আপত্তি জানাবে তা তিনি আঁচ করেছিলেন মনে মনে। কিন্তু শুধু তাই নয়, তাঁর সংকোচের আরেকটা কারণও ছিল- ওই এক ঘন্টায় রোজের ভাবী স্বামীর মুখটাও ভাল করে দেখার সুযোগ পাননি তিনি। দিনের আলোয়ও তাকে চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। তার ওপর যদি রোজ তার জন্য ঠিক করা সেই পাত্রকে দেখতে চায়, তাহলেও তো চরম বিব্রত হতে হবে কাকাকে। অতএব পরদিন, দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে রোজকে ডেকে পাঠালেন ডাউ। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর তার হাতটা ধরে তার সন্দর, সরল মুখের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, "রোজ, মা, তোর এই সুন্দর মুখটাই তোকে অনেক সৌভাগ্য এনে দেবে, দেখিস।"

রোজ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল। কিন্তু ডাউ বলে চললেন, "ভাবতেই কেমন যেন লাগে, তোরও একদিন বিয়ে হবে। এই বুড়োকে ছেড়ে চলে যাবি তুই শ্বশুরবাড়ি। বড় একা হয়ে যাবো জানিস। যাই হোক এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এখন আর সময় নষ্ট করব না। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। তুই এক কাজ কর, বড় ঘরখানা সাজিয়ে রাখ তো দেখি মা! আজ রাত আটটার মধ্যে সব কিছু ফিটফাট চাই, বুঝলি তো। আমার এক বন্ধু আসবেন। আর শোন, সুন্দর সেজে গুজে আসবি কিন্তু তার সামনে, সে যেন একবারের জন্যও না ভেবে বসে আমরা কৃপণ বা গরিব। বাড়ির সম্মান রক্ষা করতে হবে তোকে আজ মা।"

এই কথা বলে ডাউ চলে গেলেন।

এরপর পরের সংখ্যায়

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

রাজারহাটের ভূতের বাড়ি

পিকলু

রাজারহাট থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার ভিতরে ছাপনার কাছে ছোট গ্রাম ভাতিন্ডা। গ্রাম ভেঙে শহর হওয়ার চল অনুসরণ করে এখানেও কাজ শুরু হয়েছে কিছুকাল ধরে। চারদিকে ফাঁকা মাঠ, দিগন্তে ছোট গ্রাম, আর বেশ ক'টা নবনির্মিত বাড়ি। বড়রাস্তার ধারে এইসব বাড়িগুলো আসলে বিভিন্ন এঞ্জিনিয়ারিং ও রিয়াল এস্টেট সংস্থার গোডাউন। দিনের বেলা কর্মচারীরা গোডাউনে কাজ করে আর রাতে বড় রাস্তার ট্রাকচালকদের বিশ্রামের ঠিকানা হয় এই গোডাউনগুলো।

এবারের ঘটনাটা এইরকমই একটা গোডাউনকে নিয়ে। গোডাউনটা একটা ইলেকট্রিকাল সংস্থার। এদের কাজ ছোট ট্রানস্‌ফর্মার, সুইচবোর্ড, মিটার ও বিভিন্ন ইলেকট্রিকাল যন্ত্রপাতির নির্মাণ ও সরবরাহ। এরা গোডাউনটা নিয়েছে প্রায় তিন- চার বছর হল। একটা দোতলা বাড়ি, মালিক সস্তায় বেচে পালায়। গোডাউনের কর্মচারী ও মালপত্রের দেখাশোনার জন্য আছেন একজন সশস্ত্র পাহারাদার, মালপত্র দেখাশোনার জন্য রাতেও থাকবার কথা তাঁর ওই বাড়িতে।

কদিন কাজের পরই কিন্তু পাহারাদার বেঁকে বসেন। "ইস ঘর মে ভূত হৈ" বলে চাকরি ছেড়ে পালান তিনি। কর্মচারীরা তখনও তেমন গায়ে মাখেনি ব্যাপারটা। তবে কদিনের মধ্যেই তাদের গলায়ও সেই একই সুর! বাড়িটাতে নাকি সন্ধের পর গা ছম ছম করে। পায়ের আওয়াজ আসে দোতলা থেকে, মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ যেন ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে।

কদিনের রাতের পাহারায় বিরতির পর আরেকজন পাহারাদার আসেন, শক্তপোক্ত চেহারা, নেশাভাঙ করেন না, ঘোর নাস্তিক আর বেশ মজার লোক। তাঁর নাম বিপ্লবদা। এ ঘটনাটা ওঁর থেকেই জানা।

কাজ চলতে থাকে, তবে কোনও কর্মচারীই সাতটার পর গোডাউনে থাকতে চায় না। দারোয়ানবাবুর রাতের সঙ্গী কিছু ট্রাকচালক। তারা বেশ রাত অবধি তাস খেলে, তারপর রান্না হয় আর খেয়ে রাতের ঘুম। ওপরের তলায় দুটো ঘর, আর নিচের তলায় একটা বড় প্যাসেজ, একটা হলঘর, একটা রান্নাঘর আর একটা ঠাকুরঘর। ড্রাইভাররা সবাই ওপরের একটা ঘরে, আর বিপ্লবদা অন্য একটা ঘরে ঘুমোন।

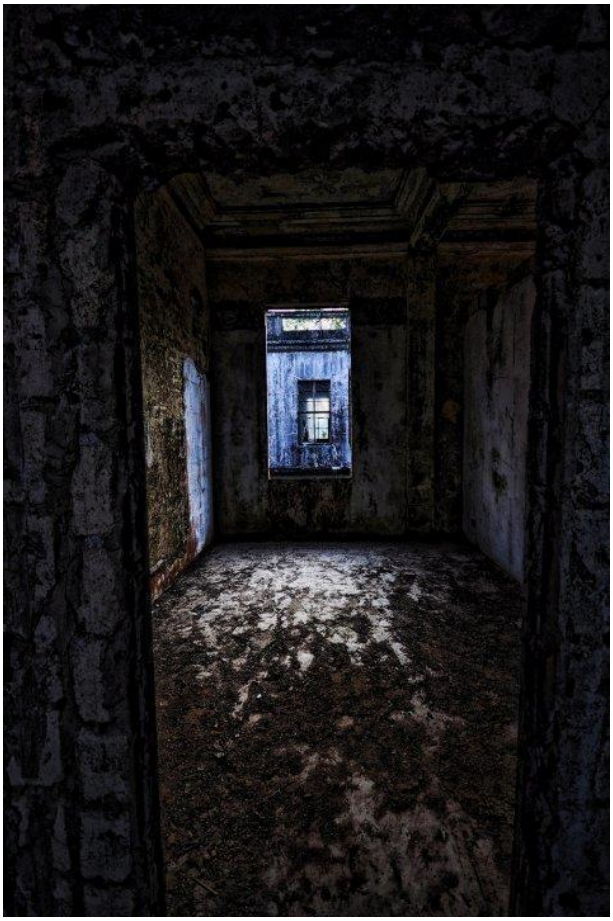

ইতিমধ্যেই আশপাশে খবর নিয়ে জানা গেছে এই বাড়িতে দুজন আত্মহত্যা করেছিলেন। বাড়ির মালিকের স্ত্রী আর পনেরো বছরের মেয়ে। একদিন মালিক বাড়ি এসে দেখেন রান্নাঘরে গায়ে আগুন দিয়ে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন,আর তার মেয়ে ঠাকুরঘরে গলায় দড়ি দিয়েছে। বাড়ি বেচে মালিক কোথায় পালান কেউ জানেনা।

বিপ্লবদা বলেন, তিনি নাকি রাতে প্রায়শই একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পান, একদিন রাতে জল খেতে নিচে নেমেছিলেন, দেখেন রান্নাঘরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। একদিন সন্ধেবেলা এক কর্মচারীর আওয়াজ পেয়ে একতলার প্যাসেজটায় ঢুকে মনে হয়েছিল যেন রক্ত হিম হয়ে গেছে, দৌড়ে পালিয়ে বাঁচেন, কর্মচারীটি ঐখানেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন অনেকক্ষণ।

এর পর একদিন রাতে নিচের বাথরুমে গিয়ে ফেরার পথে বিপ্লবদার অনুভুতি হল, কেউ তাঁর হাত ধরে টানছে।। প্যাসেজটা হঠাৎ যেন ভীষণ ঠান্ডা হয়ে গেছিল তখন। বেপরোয়া হয়ে হাতের বন্দুক থেকে এলোমেলো গুলি চালালেন তিনি। সেই শব্দ পেয়ে ওপর থেকে আলো নিয়ে ড্রাইভাররা নেমে এলে সেই যাত্রায় বেঁচে যান। তারপর থেকে রাতে একা কেউ নিচে নামত না।

এক তরূণ ড্রাইভার একদিন ক্লান্ত হয়ে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে নিচের ঠাকুরঘরে ঘুমোতে যান তাস খেলবেন না বলে। সেখান থেকে এমনিতেই নানারকম হব ভেসে আসত রোজ। ড্রাইভারটি নির্ভীক কারো কথা না শুনে নেমে গেলেন ঠাকুরঘরে শুতে। রাত বাড়লে অন্যরা নিচে নামে বেচারাকে ভয় দেখিয়ে তার ঘুম নষ্ট করতে। নিচে নামতেই শোনে ঠাকুরঘর থেকে গোঙানোর আওয়াজ আসছে। ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে তারা দেখে, ছেলেটা তার দুহাত বুকের কাছে এনে হাওয়ায় তীব্র ধাক্কা মারছে, আর চোখমুখ লাল হয়ে গিয়ে গোঙাচ্ছে। বাকিরা ধাক্কা মেরে ছেলেটাকে ওঠাতে চেষ্টা করে কিন্তু অদৃশ্য কিছু ভার যেন তা করতে দিচ্ছিল না। অনেক চেষ্টার পর যখন ছেলেটাকে জাগানো গেল তখনো সে গোঙাচ্ছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন, পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে, ভারী কিছু অনেকক্ষণ ধরে বুকের উপর রেখে দেওয়ায় ইন্টারনাল হেমারেজও হয়েছে। ছেলেটি এখন সুস্থ। বলে “ইস ঘর মে আত্মা হৈ, হামনে দেখা । এক জ্বলতা হুয়া শির হামারে ছাতিপর খাড়া হুয়া থা। হাম উসকো রোক না পায়ে।” ড্রাইভাররা এখন এই গোডাউন এড়িয়ে চলেন।

বিপ্লবদা অন্য আরেকজন পাহারাদারের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন তবে তা মেলেনি। অভিশপ্ত বাড়িটিতে তিনি প্রায় একলাই রয়ে গেছেন। জানা নেই আর কতদিন থাকতে পারবেন।

সম্পাদকীয় সংযোজনঃ *বাড়িটা সত্যিই আছে। কোন সাহসী চাইলে আমাদের মেল করলে ঠিকানা দেব। ঝুঁকি কিন্তু তোমার নিজের। আমাদের দোষ দিও না।*

দেশবিদেশের ভূত

ব্রহ্মদৈত্য আর ড্রুরি লেন থিয়েটারের ধূসর ভূত

সংহিতা

রূপকথার গল্পে ব্রহ্মদৈত্যকে সবাই ভয় পেত যদিও শেষ- মেস দেখা যেত সে বেশ দয়ালু। কিন্তু চলতি ধারণা হলো যে সব ব্রহ্মদৈত্যই ভূত হওয়ার আগে মানুষ জীবনে ব্রাহ্মণ থাকে। ব্রাহ্মণ মানে হোম- যজ্ঞ পুজো- পাঠে পৌরহিত্য করা ধার্মিক মানুষ। কিন্তু মরে গেলে তারা কেউ কেউ দানব হয়ে যায়। এবং এইসব দানব আবার নরমাংস ছাড়া কিছু খায় না।

ওয়েস্ট মিনিস্টারের লন্ডন বরার ড্রুরি লেনের থিয়েটার কুখ্যাত ভূতের জন্য। কথায় বলে সেখানে একদল ভূতের মধ্যে কয়েকটাই যদি কোনো শোতে উপস্থিত হয় তো অভিনেতার বরাত খুলে যায়। এইসব

ভূতেদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা ছিল ‘ধূসর রঙের ভূত’। এই ভূত আসত অভিজাত পুরুষের বেশে মাথায় ট্রাইকোন টুপি পড়ে। পরনে থাকত জ্যাকেট, ক্লোক আর স্কন্ধাবরণ, ঘোড়সওয়ারির হাঁটু ছোঁওয়া জুতো আর তলোয়ার। লোকে বলে এই ভূতটা সেই লোকটার যার কঙ্কাল দেওয়ালের গাঁথনির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল এবং সম্ভবতঃ আততায়ীর হাতে পিঠে ছুরির আঘাত পেয়ে মারা গিয়েছিল লোকটা। কোনো কোনো অভিনেতা আর ক্লাউনের ভূতও এখানে দেখা যায় বলে শোনা গেছে।

জুতা আবিষ্কার

কবে জুতা আবিষ্কার হয়েছিল বলা মুশকিল , কিন্তু জুতার ব্যবহার যে কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছে তাতে ভুল নেই । জুতার হরেক কাহিনীঃ

বলছেন অরিন্দম দেবনাথ

কহিলা হবু, ‘শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী-মাঝে চরণ-ফেলা মাত্র!
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি!
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।’
শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিকো চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়িমধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,
‘যদি না ধুলা লাগিবে তব পায়ে,
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!’
শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে, ‘কথাটা বটে সত্য—
কিন্তু আগে বিদায় করো ধুলি,
ভাবিয়ো পরে পদধুলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে?
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।’
আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।
অনেক ভেবে কহিল, ‘গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য?’
কহিল রাজা, ‘তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রয়েছ কেন তবে?’
সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়ে দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,

ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য।
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, ‘করিতে ধুলা দূর,
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর!’
তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা—
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, ‘এমনি সব গাধা
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা!’
আবার সবে ডাকিল পরামর্শে;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিক পায় অন্ত।
কহিল, ‘মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।’
কহিল কেহ, ‘রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন থাকে না কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।’
কহিল রাজা, ‘সে কথা বড়ো খাঁটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ।’
কহিল সবে, ‘চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।’
কহিল সবে, ‘হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে।’
রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিত-মতো চর্ম।

তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
‘বলিতে পারি করিলে অনুমতি,
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।’
কহিল রাজা, ‘এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম’ল সকল দেশ-শুদ্ধ!’
মন্ত্রী কহে, ‘বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।’
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, ‘আমারো ছিল মনে
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।’
সেদিন হতে চলিল জুতা পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

এইভাবেই রবি ঠাকুর আমাদের বলে গেছেন জুতো আবিষ্কারের এক মজাদার কাল্পনিক কাহিনী। তবে সত্যি কথা বলতে কি, জুতো ঠিক কবে এবং কীভাবে আবিষ্কার হয়েছিল বলা খুব মুশকিল। সেই আদিকাল থেকে মানুষ তার পা রক্ষা করার জন্যে জুতো ব্যবহার শুরু করেছিল। পরিবেশ এর সাথে তাল মিলিয়ে জুতো তৈরি করতে শিখেছিল মানুষ। তার কোনটা পা ঢাকা বুটের মত, কোনটা চপ্পল এর মত , কোনটা আবার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু। কিন্তু যাই তৈরি করুক না কেন সেটা ছিল একদম পেশা ও পরিবেশের উপযোগী।

অতি সম্প্রতি আর্মেনিয়ার এক গুহা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো চামড়ার জুতো পাওয়া গেছে। দড়িবাঁধা এই জুতোর ভিতরে খড়ের পুরু আস্তরণ দেওয়া। ইরান দেশের সীমানাঘেঁষা এই অঞ্চলের আবহাওয়ার গুণে জুতোটি দিব্যি টিকে ছিল। মহিলাদের পায়ের চারনম্বর জুতোর মাপের এই জুতোটি তৈরি হয়েছিল গরুর চামড়া থেকে, মিশরের পিরামিড তৈরির কয়েক হাজার বছর আগে। চামড়া এত সুন্দর ভাবে ট্যান করা হয়েছিল যে কয়েক হাজার বছরের ঝড়, তুষার, বৃষ্টি ও পরিবেশের তারতম্য সহ্য করে এই জুতোটা দিব্যি টিঁকে ছিল নির্জন গুহার মাঝে।

আয়ারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজ কর্ক এর পুরাতাত্ত্বিক ডঃ রন পিনহাসি এই গুহা অভিযানের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম এটা কয়েকশো বছরের পুরনো একটা জুতো হবে, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল এটার বয়েস সাড়ে পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি! জুতোর ভেতর খড়ের আস্তরণ আছে, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত নই এই খড়ের আস্তরণ পা গরম রাখার জন্যে না জুতোর আকার ঠিক রাখার জন্যে। এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচাইতে প্রাচীন জুতো এটি। গুহার অন্ধকারে ভেড়ার বিষ্ঠার নিচে দিব্যি টিঁকে ছিল এতদিন ধরে আমদেরই কোন পূর্বপুরুষের কীর্তি।”

মানোলো ব্লান্নিক নামের এক জুতোর ডিজাইনার জুতোটি দেখে মন্তব্য করেছেন, "ভাবাই যায়না! একদম অত্যাধুনিক ডিজাইনের জুতো! জোড়াবিহীন এক চামড়ায় তৈরি। সামনে পেছনে চামড়ার লেস... নিখুঁত আকার। যিনি বানিয়েছিলেন তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করে এই জুতো বানিয়েছিলেন। এত নিখুঁতভাবে চামড়া ট্যান করা হয়েছিল যে এত হাজার বছর পরেও টিকে আছে।"

রেডিও কার্বন ডেটিং বলছে জুতোটি ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। তখন আর্মেনিয়াতে তাম্রযুগ চলছে। যে গুহাটিতে জুতোটি পাওয়া গেছিলো তার আশপাশের অঞ্চল খুব দুর্গম। কাঁটাঝোপ আর ধারালো পাথরে বোঝাই। অথচ গুহাবাসীরা যে অনেক দূর পর্যন্ত যেতেন তার প্রমানও পাওয়া গেছে ওই গুহা থেকে। এমন কিছু জিনিসের নিদর্শন ওই গুহাতে ছিল যা ওই অঞ্চল থেকে অন্তত ১৫০ কিলোমিটার দূরে সেই সময় পাওয়া যেত বলে জানিয়েছেন অভিযানকারীরা। ফলে ভালো জুতোর দরকারটা তাঁদের ছিলই।

এর আগে যে প্রাচীন জুতোটি পাওয়া গেছিল সেটিও ছিল প্রায় ৫৩০০ বছরের পুরনো। অস্ট্রিয়ান আল্পসে ১৯৯১ সালে এক অভিযানে এই জুতোটি পাওয়া গেছিল। এটি ছিল বাদামি ভালুকের চামড়ায় তৈরি।

এ তো গেল জুতোর কথা। চপ্পল কিন্তু আরো পুরোনো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরিতে আর্নল্ড রিসার্চ গুহায় এক অভিযানে পাওয়া গেছিল একটি চপ্পল যেটির কার্বন ডেটিং বলছে তা ৭০০০ বছরের বেশি পুরনো। ওদিকে আবার ৪০০০০ বছরেরও পুরনো মানুষের পায়ের হাড়ের ক্ষয় ও গঠন দেখে পুরাতাত্ত্বিকরা বলছেন ওই মানুষরা জুতো ব্যবহার করতেন। তবে তার উদাহরণস্বরূপ কোন জুতো এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জুতো তৈরির শিল্পটি অতএব বেশ পুরনো। পাইনেসভিল হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়ামে অনেক জুতো প্রদর্শিত আছে। প্রায় সেই আদিকাল থেকে যে জুতো মানুষ পরে আসছে সেটা হল মোকাসিন। আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা এই জুতো পরত। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ২০০০ বছর আগে পূর্ব ইউরোপের মানুষরাও মোকাসিন ধরনের জুতো ব্যবহার করত। নর্থ আমেরিকানরা গাঢ় রঙের কাঠে তৈরি পাথরের পুঁতি দিয়ে

সাজানো জুতো পরতে ভালবাসত এবং এখনও তারা রংদার জুতো ও জামা পরতে ভালোবাসে। এই জুতোর ভেতর খুব নরম চামড়ার আস্তরণ থাকে, পরতেও আরামদায়ক হয় এবং পা ও গরম থাকে এই জুতোতে। সেইসময়েও বিভিন্ন ধরনের জুতো তৈরি হত পরিবেশের উপর নির্ভর করে। গরমের দেশে মানুষরা পরতেন চপ্পল আর শীতের দেশের মানুষরা পরতেন লোমওয়ালা চামড়ার গরম জুতো । পারসিয়ানরা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু দড়ি বাঁধা জুতো পরতেন।

এই জুতো কারা তৈরি করতেন সেটা সঠিক ভাবে বলা খুব মুশকিল। থমাস বেয়ারদ নামে একজন ব্রিটিশ ১৬২৯ সালে লন্ডন থেকে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটে পৌঁছলেন কিছু জুতো তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে এবং পেশাদার হিসেবে জুতো তৈরি শুরু করলেন। আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই প্রথম নথিবদ্ধ পেশাদার ‘মুচি’। কিন্তু সব জুতো তৈরি হত হাতে। তখনকার দিনে সাধারণত মুচি বা জুতো প্রস্তুতকারকরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে জুতো তৈরি করতেন। সাধারণত পুরো পরিবারের জন্য জুতো তৈরি করতেন এঁরা। ধনী আমেরিকানরা অনেক সময় আমদানি করা জুতো পরতেন। আমেরিকাতে সেরকম কোন নির্দিষ্ট জুতোর দোকান বা কারখানা ছিল না। মুচিরাই ছিল ভরসা।

এই মুচিরাই এক শহরের খবর অন্য শহরে নিয়ে যেত। এক অর্থে এরা এক ধরনের সংবাদপ্রচারকও ছিল। বিভিন্ন দেশের চালু ফ্যাশানের খবর এরা বয়ে বেড়াত।

১৭৫০ সালে জন আদামাস নামের মার্কিন এক ব্যবসায়ী বিদেশী কিছু জুতো কিনে সে গুলোর নকল তৈরি করে ‘আমেরিকায় তৈরি জুতো’ বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি করতে শুরু করলেন। জন আদামাস আমেরিকার প্রথম জুতো তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তখনও কিন্তু জুতো বানাবার যন্ত্র তৈরি হয়নি। জুতো তৈরি হত হাতে। মোটামুটি ১৮১৮ সালে প্রথম জুতো তৈরি করতে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া শুরু হয়। প্রথম প্রথম যে জুতো তৈরি হত, সেটা যে কোন পায়েই পরা যেত। কিন্তু এই জুতোগুলো অতটা

আরামদায়ক ছিল না। কিম্বলে লাস্ট নামক এক ভদ্রলোক প্রথম ডান এবং বাঁ পায়ের জন্য আলাদা আলাদা আকারের জুতো বানালেন। ১৮৪৫ সালে রোলিং মেশিন আবিষ্কৃত হয় এবং জুতোর প্রধান উপাদান চামড়াকে প্রচণ্ড চাপে পাতলা ও শক্ত করতে এই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হল। তার আগে পাথরের ওপর ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চামড়াকে পাতলা ও শক্ত করা হত। এখনও পাড়াতে ঘুরে ঘুরে যারা জুতো সেলাই বা সারাই করে তারা ছোট ছোট চামড়ার টুকরো হাতুড়ি বা ঠুকনি দিয়ে ঠুকে

পাতলা করে। ১৮৪৮ সালে এলিয়াস নামের এক ভদ্রলোক সেলাই মেশিন বানালেন। জন নিকোলাস এই মেশিনকে জুতো তৈরির কাজে লাগানোর জন্যে উঠেপড়ে লাগলেন। ইসসাক সিঙ্গার ঠিকঠাক করে সেলাই করার উপযুক্ত মেশিন বানিয়ে বাজারে আনলেন। বদলে গেল দুনিয়া। জামা কাপড় / জুতো ... সেলাই মেশিন এসে এদের নির্মাণের পুরো জগতটাকে পাল্টে দিল। নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হতে শুরু হল এরপর নতুন নতুন চিন্তাধারা থেকে। চামড়া পাতলা করা ও তার একই রকম ঘনত্ব (থিকনেস) বজায় রাখতে উদ্ভাবিত হল স্প্লিটিং মেশিন। ১৮৫৮ সালে এলো জুতোর সোল ও ওপরের অংশ এক সাথে সেলাই করার মেশিন। আর এখন তো ভাল ভাল জুতো তৈরি হয় রোবট দিয়ে। সে এক দেখবার মত কর্মকাণ্ড!

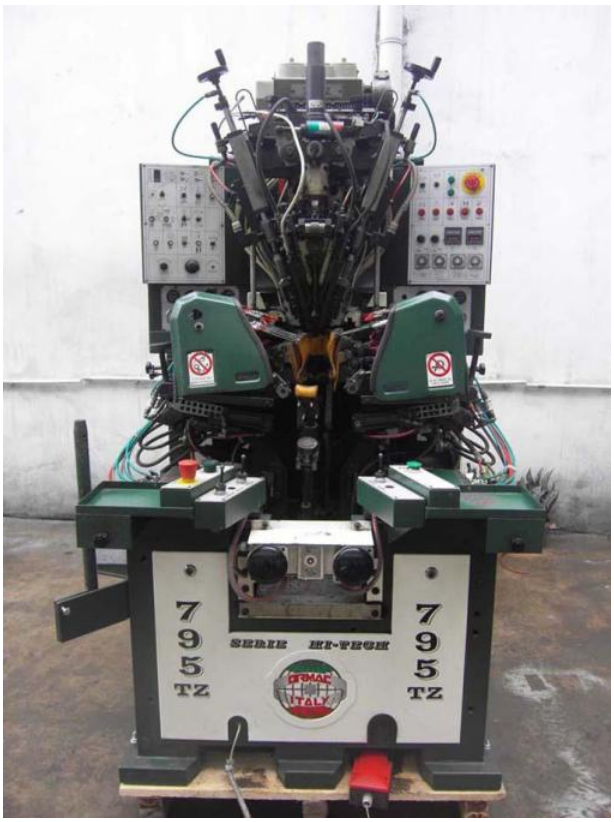

।৮।

বাকশালির পুঁথি

জৈনদের গণিতশাস্ত্রের কথা বলবার পর এইবারে বলব একটা অসাধারণ বইয়ের খবর। তার নাম বাকশালির পুঁথি।

১৮৮১ সালে পেশোয়ারের থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ইউসুফজাই এলাকার বাকশালি গাঁয়ে আনোয়াউদ্দিন মিঞাঁ নামে এক পুলিশ অফিসার থাকতেন। তাঁর ভাড়াটে এক চাষী একদিন একটা ভগ্নস্তুপের মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে ভুর্জপত্রের ওপর লেখা এই পুঁথিখানা খুঁজে পায়। বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় তার বেশি ছিল না। ফলে ওতে যে কী লেখা তার রহস্য উদ্ধার করা তার সাধ্যের বাইরে ছিল। মিঞাঁসাহেব সেটা হাতে পেয়ে সঙ্গেসঙ্গে সেটাকে পাঠিয়ে দিলেন লাহোর জাদুঘরে। তারপর পাঞ্জাবের লেফটানেন্ট গভর্নরের হাত ঘুরে তা এসে পৌঁছোল কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো- জার্মান প্রাচ্যবিদ রুডলফ হর্নলের হাতে। ১৮৮২ সালে হর্নলে বইটার ওপরে প্রথম গবেষণাপত্র ছাপলেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। বইটার অনুবাদ সেরে ১৯০২ সালে মূল পুঁথিটা হর্নলে তুলে দেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোদলেয়ান পুঁথিশালার হাতে।

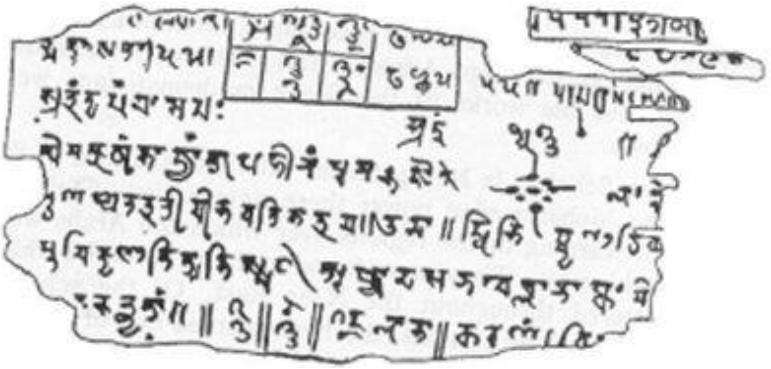

পুঁথিটার কিছু পাতা হারিয়ে গেছে। রয়েছে কুল্লে সত্তরখানা পাতা। আবিষ্কারের প্রায় দেড়শো বছর বাদে এখন তার ভারি জীর্ণ দশা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় তাকে সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

গবেষণায় জানা গিয়েছিল বইটা লেখা হয়েছে সারদা নামের হরফে। এ হরফ খ্রিস্টিয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক অবধি উত্তর পশ্চিম ভারতে চালু ছিল। পুঁথির ভাষা হল পুরনো সংস্কৃত আর প্রাকৃতের মিশেল দেয়া প্রাচীন উপভাষা "গাথা।"

বইটার একট পাতায় লেখা আছে, ছাজক- এর পুত্র গণিতসম্রাট , বশিষ্ঠর পুত্র হসিকা ও তাঁর বংশধরদের জন্য ঋতিকবতীতে বসে এই পুঁথি লিখলেন। এ জায়গাটার আরেক নাম ছিল মার্তিকাবতী। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা বইতেও তার নাম নজরে এসেছে গবেষকদের।

এ পুঁথির পাতা জুড়ে রয়েছে শুধু নানান জাতের অংক। সুন্দর সুন্দর কবিতা দিয়ে লেখা হয়েছে অংকের সূত্র, তারপর গদ্যভাষায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রত্যেকটা সূত্রের সঙ্গে আবার রয়েছে ধাপে ধাপে তার প্রয়োগ করে কষে দেয়া অংকের উদাহরণ। তাতে করে সূত্রটার সত্যতা দেখিয়ে দিয়ে শেষমেষ তাকে প্রমাণ করে দেয়া হচ্ছে। একদম আধুনিক উপপাদ্য সমাধানের পদ্ধতিতে।

একাধিক একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান, সমান্তর প্রগতির অংক, জ্যামিতিক শ্রেণী, বর্গমূল, ঋণাত্মক সংখ্যার ব্যবহার করে লাভক্ষতির অংক, সময় দূরত্বের অংক এই জাতীয় নানান জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধানসূত্র রয়েছে সেই পুঁথিতে। রয়েছে শূন্যের ব্যবহারও। এ পুঁথিতে ভগ্নাংশ লিখতে ওপরে লব(নিউমারেটর) আর নিচে হর (ডিনোমিনেটর) লেখা হত তবে তার মাঝখানে কোন রেখা টানা হত না। আর বিয়োগচিহ্ন বোঝাতে সংখ্যার পেছনে যোগচিহ্ন দেয়া হত। পাশে একটা উদাহরণ দেয়া রইল। সমীকরণে অজানা রাশি বোঝাতে এখন আমরা যেমন এক্স ব্যবহার করি, এ পুঁথিতে তার জায়গায় ব্যবহার করা হত একটা বড়োসড়ো কালো ফুটকি।

3 1+ 4 2	এর অর্থ ৩/৪-১/২ ?

এ পুঁথির একখানা অংক এইখানে দেয়া যাকঃ

তিনজন লোকের যথাক্রমে সাতখানা সাদা ঘোড়া, ন'খানা লাল ঘোড়া আর দশটা উট আছে। সাদা ঘোড়া, লাল ঘোড়া আর উটের দাম আলাদা আলাদা। প্রত্যেকে অন্য দুজনকে তার

থেকে একখানা করে প্রাণী দান করল। এইবারে দেখা গেল তিনজনের কাছে থাকা জন্তুদের মোট দাম সমান সমান। প্রতিটা জন্তুর দাম বের করো।

অষ্টম শতাব্দির হরফে লেখা এ পুঁথিটা আসলে খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দির অনেক আগে লেখা মূল বইটার একটা কপি। কারণ, হরফটা অষ্টম শতাব্দির হলেও যে ভাষায় তা লেখা সেই "গাথা" ভাষা কিন্তু খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকেই মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া যেসব মুদ্রার কথা এ পুঁথির নানান অংকে রয়েছে সেগুলো চালু ছিল খ্রিস্টজন্মের দু এক শতাব্দি আগে। এইরকম আরো অনেক তথ্যপ্রমাণ থেকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন এর মূল বইটা লেখা হয়েছিল খ্রিস্টজন্মের দুশো বছর আগে থেকে শুরু করে খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দির মধ্যেকার কোন এক সময়ে।

এ পুঁথি আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষের অংকে শূন্যের ব্যবহার যে কত পুরোনো তার একটা অকাট্য প্রমাণ মিলেছে।

ওপরের অংকটা করে রেখো তোমরা। পরের সংখ্যায় এ পুঁথির ওপরে আরো কিছুই মজার গল্প ও অংক নিয়ে গল্প করা যাবে।

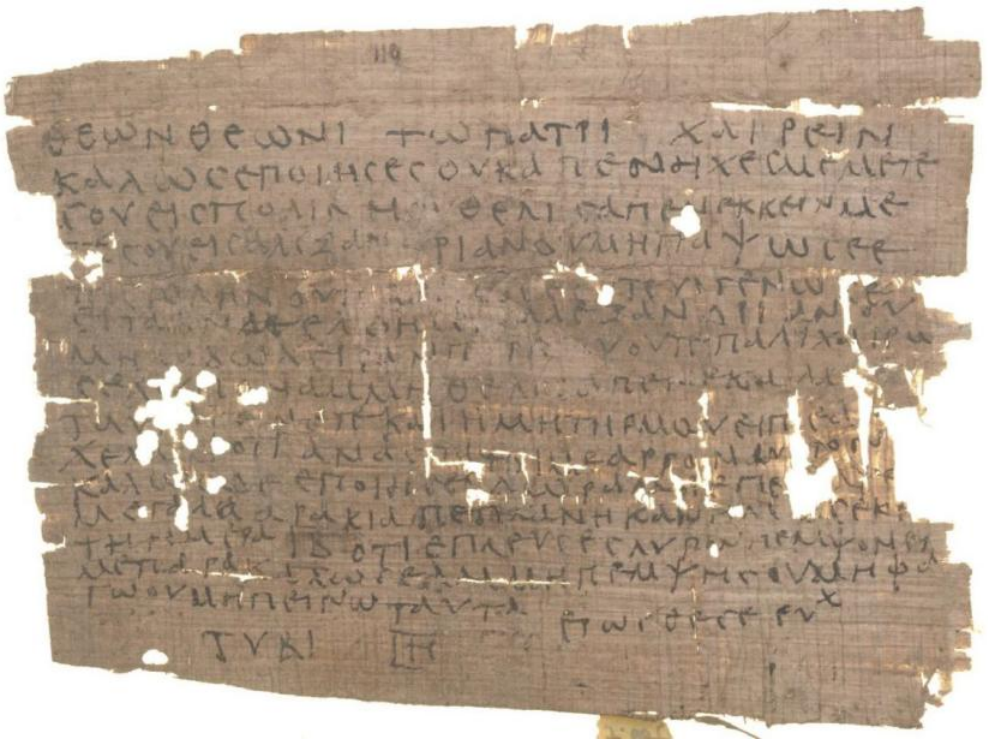

ক্রমশ

মাথে মে ট্রিকস

প্রফেসর ট্যানজেন্টের গল্প

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

প্রফেসর ট্যানজেন্টকে চেনো? মাথার মাঝে চুল সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, নাকের নিচে ঝাঁটা গোঁফ। চোখে গোল আদ্যিকালের চশমা আর সর্বদা চিন্তান্বিত মুখ। এইরকম কোনও লোককে যদি আকাশের দিকে চেয়ে গড়িয়াহাটের মোড় দিয়ে হনহন করে হেঁটে আসতে, কিংবা হাওড়া ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে গঙ্গার জলের ঢেউ গুনতে দেখো, জানবে তিনিই প্রফেসর ট্যানজেন্ট। অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন অত্যাশ্চর্য এক গণিতবিদ। বিজ্ঞান ও গণিতের বিশিষ্ট সব মৌলিক তত্ত্ব সর্বদা তাঁর মাথায় গজগজ করে। এ আলাদা কথা যে সেসবের বেশির ভাগই সাধারণ মানুষের মাথার ওপর ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। তাই তিনি প্রফেসর ট্যানজেন্ট নামে খ্যাত, আসল নাম তাঁর লোকে ভুলে গেছে।

এইরকম একটি প্রতিভাধর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া কিন্তু সহজ নয়। তাঁর সাথে দেখা করতে সেই হ-য-ব-র-ল এর গেছোদাদার মতো আগে দেখতে হয় তিনি কোথায় কোথায় নেই! তাঁকে তাঁর বাসস্থানের সন্ধান দিতে বললেও তিনি

বলবেন, আমার বাড়ি আর ডক্টর পাজলের বাড়ি বুড়োশিবতলার মন্দিরে ঠিক সাড়ে আটত্রিশ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে! আর ডিগ্রির কথায় মনে এলো, একবার এক পরীক্ষায় ফুটন্ত অশুদ্ধ জলের স্ফুটনাংক কত জিজ্ঞেস করায় প্রফেসর ট্যানজেন্ট বলেছিলেন, এক সমকোণ! দেখা গেল থার্মোমিটার দেখাচ্ছে নব্বই ডিগ্রি!

এই প্রফেসর ট্যানজেন্টের যে কতো মৌলিক গবেষণা আছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। মানুষের আয়ু নিয়ে যুগান্তকারী এক গবেষণায় তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, যে দেশের মানুষের গড় বয়স বেশি সেই দেশের লোক বেশিদিন বাঁচে! গবেষণাপত্রে তাঁর মন্তব্য, আপনারা আরও বেশি করে জন্মদিন পালন করুন, কারণ এটি প্রমাণিত হল যে জন্মদিন উদযাপনের সাথে দীর্ঘ জীবনের নিবিড় সম্পর্ক আছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যে সব মানুষ বেশি জন্মদিন পালন করেছেন, তারাই বেশিদিন বেঁচেছেন!

আর একটি গবেষণায় তিনি দেখিয়েছিলেন, পৃথিবীর যত চোর আছে, তাদের দশ শতাংশ বাঁহাতি! গবেষণার অন্তিম সিদ্ধান্তটি আরও চমকপ্রদ। সেখানে তিনি বলছেন, এও দেখা গেছে যে পৃথিবীর সব মেরুভল্লুকই বাঁহাতি। সুতরাং আপনার কিছু চুরি হলে জানবেন শতকরা দশ ভাগ সম্ভাবনা এটি কোনও মেরুভল্লুকের কাজ!

এই হলেন প্রফেসর ট্যানজেন্ট। তিনি বুদ্ধিমান, না বোকা, না ধূর্ত, না উন্মাদ তা তোমরাই বিচার কোরো। এসো প্রফেসর ট্যানজেন্টের আরও কিছু কথা শোনা যাক।

* * *

একবার এক জুলজির প্রফেসরের সঙ্গে কুমীরের সংখ্যার ওপর পরিসংখ্যানতত্ত্বের প্রভাব নিয়ে তুমুল তর্ক লেগেছিল। তিনি বললেন, "শুনুন বলি। আমার সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান গবেষণায় পাচ্ছি, পৃথিবীতে প্রতি বছর কুমীরেরা চার কোটি কুড়ি লাখ ডিম পাড়ে। এদের মধ্যে দু' ভাগের এক ভাগই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এই সব বাচ্চার পঁচাত্তর শতাংশই জন্মের ছত্রিশ দিনের মধ্যেই অন্যান্য প্রাণীর শিকার হয়। বাকি যা থাকে তার মাত্র পাঁচ শতাংশ পূর্ণ জীবন পায়। তাহলে বুঝেছেন পরিসংখ্যান মানবজাতির কত উপকার করছে?"

জুলজির অধ্যাপক কী বলবেন বুঝতে না পেরে বললেন, "আপনি যে কী বলেন মশায় বুঝি না! এর মধ্যে পরিসংখ্যান আবার কোথায়?"

"দূর মশায় আপনি তো কিসুই বোঝেন না," প্রফেসর ট্যানজেন্ট ধমক দিলেন, "পরিসংখ্যান যদি না থাকতো তাহলে যে আপনার পশ্চাদ্দেশটি এখন একটি কুমীরের ওপর থাকতো, সেটা ধরতে পারলেন না?"

* * *

প্রফেসর ট্যানজেন্ট ও ডক্টর পাজলের আলোচনা চলছে। দু' জনেই উচ্চস্তরের দার্শনিক। নিগুঢ় তত্ত্বের আলোচনায় জীবনের সত্য, আত্মার প্রকাশ, মহাকাশের ব্যপ্তি, অসীমের পরিমাপ ইত্যাদি অতিক্রম করে মর্ত্যলোকের আর একটু কাছাকাছি অভিকর্ষ ও আপেক্ষিকতার পথ ঘুরে বর্তমানে গতিজাড্যের এক সমস্যার সমাধান

করতে এসে ঠেকেছে চার গুণিতক দুই কত হয়। দুরূহ তত্ত্বসমুহের ধুম্রজালের মাঝে অর্ধনিমীলিত চক্ষে ডক্টর পাজল বললেন, "দেখুন এই মুহূর্তে চার গুণিতক দুইয়ের মান হয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তার একটা নির্দিষ্ট সসীম মান আছে।

প্রফেসর ট্যানজেন্ট চরম তত্ত্বজ্ঞানের নিকষে তাঁর বক্তব্যকে যাচাই করে বললেন, "নিঃসন্দেহে। আপনার এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি তো এইটাই যে ৪ গুণিত ২ মানেই ৪ গুণিত ১/(১-(১/২)), যা কিনা ১ দিয়ে শুরু একটা অসীম গুণোত্তর শ্রেণীর সমষ্টি যার সাধারণ অনুপাত ১/২, তাই নয় কি?"

"ঠিক। আর যেহেতু সাধারণ অনুপাতটি একের চেয়ে কম, সমষ্টিটি অবশ্যই সসীম। ধন্য আপনার প্রজ্ঞা।"

উভয়েই স্মিতহাস্যে চক্ষু মুদ্রিত করলেন। খানিকক্ষণ কাটল। অতঃপর প্রফেসর ট্যানজেন্ট পুনরায় বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হলেন। বললেন, "আচ্ছা, তাই যদি হয়, তাহলে আমরা হয়তো সেই মানের অন্তত কাছাকাছি একটা অনুমান করতে পারি। তাই না?"

ডক্টর পাজল নির্লিপ্ত জিজ্ঞাসায় চক্ষু মেললেন। প্রফেসর ট্যানজেন্ট বললেন, "যেমন ধরুন গুণোত্তর শ্রেণীটি তো ১+(১/২)+(১/৪)+(১/৮)+(১/১৬)+... এইভাবে চলবে। সুতরাং দুই-এর বর্গ ও তার বেশি সূচকের পদগুলি যদি অবজ্ঞা করা হয়, তাহলে সমষ্টিটি দাঁড়ায় প্রায় ১+(১/২) মানে ৩/২, তাই নয় কি? অর্থাৎ ৪ গুণিত ২ এর একটা নিকটবর্তী মান আমরা পেলাম ৪ গুণিত (৩/২), বা ৬। কী বলেন?"

ডক্টর পাজল সপ্রশংস অনুমোদনে মাথা দুলিয়ে আবার চিন্তাসাগরে তলিয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। তারপর তিনি আবার মুখ খুললেন, "এর চেয়ে আরও নিকটতর একটা অনুমানের পথ কিন্তু আমি পেয়েছি।"

"সেটা কি রকম?"

"ধরুন ২ এর অবস্থান তো ১.৯ আর ২.১ এর মাঝে। সেইরকমই ৪ এর স্থিতি ৩.৯ ও ৪.১ মাঝে কোথাও। সেক্ষেত্রে ৪ গুণিত ২ এর মান নিশ্চই ১.৯ গুণিত ৩.৯ এবং ২.১ গুণিত ৪.১ এর মাঝেই হতে হবে। কি ঠিক বলেছি?"
প্রফেসর ট্যানজেন্ট হর্ষোৎফুল্ল স্বরে বললেন, "অসাধারণ আপনার মেধা! এখন তো ব্যাপারটা অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। দেখাই যাক না।"

সাথে সাথে স্লাইড রুল বেরিয়ে এল। প্রফেসর ট্যানজেন্টের হাতে স্লাইডারটি ঘনঘন বেশ কয়েকবার ডাইনে-বাঁয়ে চলাচল করলো। তারপর তিনি সোল্লাসে ঘোষণা করলেন, "এই তো হয়েছে। আপনার প্রদর্শিত পন্থায় ৪ আর ২ এর গুণফলটি অবশ্যই ৭.৩৯ ও ৮.৬৫ এর মাঝে কোথাও হতেই হবে। আমরা অনেকটাই কাছাকাছি আসতে পেরেছি মনে হচ্ছে।"

উভয়ে পুনরায় স্বস্তিতে চক্ষু বুজলেন। কিন্তু অল্প পরেই প্রফেসর ট্যানজেন্টের কপালে দেখা দিল ভ্রুকুটি। চোখ মেলে তিনি বললেন, "আচ্ছা, স্লাইড রুল যখন রয়েইছে, আমরা তো সোজাসুজি গুণ অঙ্কটি কষেও তো দেখতে পারি!"

ডক্টর পাজল উত্তেজিত ভাবে স্লাইড রুল ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, "তাই তো, কি মূর্খ আমরা!"

আবার স্লাইডারের দোলাচল। তারপর তাঁর ঘোষণা, "হয়েছে। ৪ গুণিত ২ মানে এই ৭. ৯৮। অসাধারণ! "

কাছেই অষ্টমবর্ষীয় এক শিশু আপনমনে কাগজের নৌকা বানাচ্ছিল। কী বুঝেছিল কে জানে, হঠাৎ বলে উঠলো, "৪ গুণ ২ তো ৮। হি হি. . . "

দুই দার্শনিক একটু হতচকিত হয়ে এ ওর মুখে তাকালেন। তারপর সামলে নিয়ে প্রফেসর ট্যানজেন্ট বললেন, "আহা শিশু তো! অবোধ. . . তা তুমি কী করে বললে বাছা?"

"কেন, কালই তো টিচার ৪ এর নামতা শিখিয়েছে, চারেক্কে চার, চাদ্দুগুণে আট. . . । হি হি হি. . . "

প্রতিবেশী গাছ

শালুক

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশের গ্রাম গঞ্জের খাল, বিল, পুকুরে পদ্ম জাতীয় এক ধরণের ফুল দেখতে পাওয়া যায় যা শালুক নামে পরিচিত। চলতি বাংলায় একে শাপলা বলে। বিভিন্ন বর্ণের শালুক ফুল দেখা যায়। তবে এই গাছগুলি আলাদা আলাদা প্রজাতিভুক্ত। এক একটি প্রজাতিভুক্ত গাছের ফুলের রঙ আলাদা। লাল বর্ণের ফুল ফোটে নিমফিয়া পিউবেসেনস প্রজাতির গাছের। নীল রঙের ফুল ধরে নিমফিয়া জাগিন্টিয়াতে, সাদা ফুল নিমফিয়া লোটাসে। হালকা স্বর্ণাভ ফুল দেখতে পাওয়া যায় নিমফিয়া অ্যালবা প্রজাতির গাছে।

শালুক গাছটি জলের তলায় থাকে। প্লেটের গড়ণের বড় পাতাগুলো জলে ওপরে ভাসে। ডিম্বাকৃতি পাতার পিছনের অংশ খাঁজ কাটা। পাতার ধার(পরিধি)অমসৃণ,দন্ডযুক্ত। ফলগুলি জলের তলায় থাকে এবং অনেক বীজযুক্ত। ফলগুলি সবুজ, গোলাকার স্পঞ্জের মত।

নিমফিয়া শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ “নিমপায়া”থেকে। এর অর্থ নিম্ফ বা জলপরি।

কচি শালুক পাতা ও কুঁড়ি কোন কোন জায়গায় সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পদ্মের বীজের মত শালুকের বীজ শুকিয়ে গুঁড়ো করে ময়দার মত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শালুক অযত্নে বড় হওয়া গাছ। অর্থাৎ এই গাছের পরিচর্যা করা হয় না তবে শালুক ফুল, বীজ, ডাঁটা , মূল – এক কথায় সকল অংশই ঔষধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শুকনো ফুলের গুঁড়ো জ্বর, কলেরা, লিভার বা যকৃতের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। মূল চূর্ণ অর্শে এবং অজীর্ণে ব্যবহার করা হয়। আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য লিখেছেন বীজের বিষনাশক গুণ রয়েছে। গৃহে শোভাবর্ধন করা ছাড়াও শালুক খাদ্য, ভেষজ ইত্যাতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের জাতীয় ফুল হিসেবে স্বীকৃত এর ফুল।

পাখির জগত

এই পাখি, নেই পাখি

সৈকত মুখোপাধ্যায়

পাখির গায়ে তেমন জোর টোর নেই। লড়াই করবার মতন নোখ দাঁতও নেই। তাই হঠাৎ করে শত্রুর সামনে পড়ে গেলে তার হাতে দুটি মাত্র রাস্তা- হয় উড়ে যাওয়া, নয়তো আশেপাশের ঘাস লতাপাতা কিম্বা মাটির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে লুকিয়ে থাকা।

উড়ে যাওয়াটা যে সব সময় বাঁচার ভাল উপায় তা নাও হতে পারে। ধরো, আকাশে যখন একটি বাজপাখি শিকারে খোঁজে চক্কর কাটছে, তখন মাটিতে চরে বেড়াচ্ছে যে ছোট পাখিটা সে যদি উড়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে তক্ষুনি বাজপাখি তাকে দেখে ফেলবে আর পেটে পুড়বে। সেই ছোট পাখির পক্ষে তখন বাঁচবার সবচেয়ে ভাল উপায় মাটির সঙ্গে মিশে চুপ করে বসে থাকা।

পরিবেশের সঙ্গে এইভাবে শরীরের রঙ মিলিয়ে লুকিয়ে পড়ার কায়দাটা প্রকৃতির জগতে খুবই ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ওস্তাদ হল পোকামাকড়েরা। ইংরিজিতে এই রঙ মেলানোর কায়দাটাকে বলা হয় "ক্যামুফ্লেজ"(camouflage)। তুমি

দেখবে একটা গঙ্গাফড়িং যখন সবুজ ঘাসের ওপর বসে থাকে কিম্বা একটা ধূসর ডানার মথ শুকনো গাছের ডালের ওপর, তখন একদম কাছ থেকে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও অনেক প্রাণীর গায়ে এমন পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতন রঙ দেখা যায়। সাদা বরফের রাজ্যে যারা বাস করে, যেমন শ্বেতভাল্লুক, কিম্বা আর্কটিক শেয়াল, তাদের গায়ে ধবধবে সাদা লোম। আবার মরুভূমির প্রাণী উটের গায়ের লোম ঠিক বালির মতন হলুদ।

পাখিরাও কিন্তু এই ক্যামুফ্লেজিং- এর ব্যাপারে কম যায় না। তারা শুধু যে নিজেরা লুকোবার জন্যে ক্যামুফ্লেজের আশ্রয় নেয় তাই নয়, বহুক্ষেত্রে তাদের বাসা আর ডিমও পরিবেশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে লুকিয়ে থাকে। সে সব গল্পে আমরা পরে যাব। এখন পালকের রঙের কথা বলি।

সেই ছোট্ট পাখিটার কথাই ধর, বাজপাখিকে দেখে যে মাটির ওপর চুপ করে বসে পড়েছিল। তার পালকের রঙ যদি উজ্জ্বল লাল বা টুকটুকে নীল হত, তাহলে চারপাশের ধূসর

মাটির সঙ্গে সে মিশে যেত কেমন করে? তখন তাকে তো অনেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যেত, তাই না? তাই তার দরকার ছিল এমন পালক, যার রঙ চারপাশের মাটির রঙের কাছাকাছি। সেইজন্যই আমরা দেখি শস্য খুঁটে খাওয়ার জন্য মাটিতে চরে বেড়ায় যে পাখিরা, তাদের গায়ের পালক সবসময়ই ধূসর কিম্বা মেটে রঙের। যে কোনো বিপদের আঁচ পেলেই তারা চলাফেরা থামিয়ে চুপ করে মাটিতে বুক লাগিয়ে বসে পড়ে। তখন চারপাশে ছড়িয়ে থাকা মাটির ঢেলা বা নুড়ি কাঁকরের মধ্যে থেকে তাদের খুঁজে বার করা শিকারীদের কাছে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরকম কয়েকটা ধূসর পালকের পাখির নাম তিতির, বটের, তুলিকা, ভরত, ছাতারে এইসব। এরা সবাই মাটিতে চরে বেড়ায়।

একই কারণে যে পাখিরা নদী বা সমুদ্রের তীরে খোলা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে পোকামাকড় ধরে, তাদেরও দরকার পড়ে পরিবেশের সঙ্গে রঙ মেলানো পালকের। এরকম কয়েকটা পাখির নাম মিটুয়া(golden plover) , টিট্টিভ(spur winged plover), গুলিন্দা(curlew), কাদাখোঁজা(snipe)।

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে শুকনো ঘাস মাটিতে ঘুরে বেড়ায় বাস্টার্ড নামের এক বড়সড় পাখি। তারও পালকের রঙ ফিকে হলুদ- যাতে রুক্ষ মাটি আর শুকনো ঘাসের থেকে তাকে আলাদা করে চিনতে পারা না যায়। মোটকথা, নদীর তীর,মরুভুমি কিংবা ঘাসজমি যাহাই হোক না কেন, খোলা জায়গার পাখিদের দরকার পরিবেশের সঙ্গে মেলানো পালক।

রঙ মেলানো পালকের দরকার নিশাচর পাখিদেরও। কারণ,তারা দিনের বেলায় প্রায় নড়াচড়াই করতে পারেনা। কাজেই লুকিয়ে থাকতে না পারলে তারা খুব সহজেই শিকারীদের চোখে পড়ে যাবে। এই কারণেই দেখবে পেঁচা আর নাইটজার পাখিদের পালকের রঙে কি অসামান্য ক্যামুফ্লেজ! পেঁচা দিনের বেলায় বসে থাকে বড় গাছের ডালে কিম্বা কোটরে । তাই তার পালকের রঙ এমন যে, তা ওইরকম পুরনো গাছের বাকলের রঙের সঙ্গে অবিকল মিশে যায়। আবার নাইটজার পাখির স্বভাব হচ্ছে এরা দিনের বেলায় গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতার স্তুপের ওপর বসে বসে ঝিমোয়। তাই ওদের পালকের রঙ শুধু নয়, ডানার আকারটাও শুকনো পাতার মতন।

নাইটজার পাখির স্বভাবে আরো একটা মজার ব্যাপার আছে। যেহেতু এরা রাতচরা পাখি তাই এদের চোখগুলো মস্ত বড় বড়। পালকের রঙ নাহয় আশেপাশের সঙ্গে মিশে গেল, কিন্তু ওইরকম বড় বড় চকচকে দুটো চোখইতো শিকারীদের

কাছে ওদের উপস্থিতি ফাঁস করে দেবে। তাই ওরা কি করে কাছাকাছি কোনও প্রাণী এলেই চোখদুটোকে বন্ধ করে ফেলে। এই স্বভাবও নিশ্চই সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল। বহুযুগ আগে এখনকার নাইটজারের যে পূর্বপুরুষেরা শিকারীরা কাছে এলে চোখ বন্ধ করে ফেলত তারাই শুধু বেঁচে গিয়েছিল। বেঁচে গিয়েছিল তাদের ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিরাও। তাই আজ পৃথিবীর সমস্ত নাইটজারের জিনের মধ্যে চোখ বন্ধ করে ফেলার নির্দেশ ধরা আছে। ওরা না বুঝেই ওই কাজটা করে ফেলে, আর করে বলেই বেঁচে যায়।

ক্যামুফ্লাজিং- এর ভীষণ দরকার পড়ে সেইসব মা পাখিদের, যারা খোলা বাসায় ডিমে তা দেয়। সেইজন্যেই দেখবে পাখিদের বেশিরভাগ প্রজাতির মধ্যে পুরুষপাখির গায়ের পালক উজ্জ্বল রঙের, কিন্তু মেয়ে পাখিদের গায়ের রঙ ম্যাড়ম্যাড়ে। তোমার চোখের সামনেই এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ চড়াইপাখি। ছেলে চড়াই পাখি আর মেয়ে চড়াই পাখির রঙের তফাৎ খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই।

আর কাদের ক্যামুফ্লাজের দরকার বল তো? ঠিক ধরেছ। পাখির বাচ্চাদের। ওরা তো উড়তে পারে না, তাই ওদের গায়ের পালক উজ্জ্বল হলে ওরা ভারি মুশকিলে পড়ত। সেইরকম হয়না অবশ্য। সমস্ত পাখির ছানারই ছোটবেলার গায়ের পালক থাকে বিবর্ণ। এমনকি পুরুষ সন্তানদেরও গায়ের পালকের রঙ ছোটবেলায় থাকে মায়ের মতন অনুজ্জ্বল- বাবার জেল্লাদার পালকের মতন মোটেই নয়। তাই তারা যখন চুপ করে বাসার মধ্যে বসে থাকে, তখন খুব চেষ্টা না করলে আশেপাশের শুকনো ডালপালা থেকে ওদের আলাদা করে দেখতে পাওয়া ভারী কঠিন।

এ তো গেল খোলা জায়গার পাখিদের ক্যামুফ্লাজিং এর কথা। কিন্তু সেই সব পাখি, যারা ঘন সবুজ পাতায় ঢাকা অরণ্যের মধ্যে ওড়াউড়ি করে, তাদের ক্যামুফ্লাজিং কেমন হবে?

তাদের ক্ষেত্রে পালকের পোশাকটা হবে খোলা জায়গার ঠিক বিপরীত। হবে উজ্জ্বল রঙিন। প্রধানত সবুজ। উদাহরণ? হাতের কাছেই আছে তিনটে পাখি- টিয়া, বসন্তবৌরী আর হরিয়াল। এদের সকলেরই পালকে নানান শেডের সবুজ রঙ। হালকা সবুজ রঙের পায়রার মতন দেখতে হরিয়ালের ঝাঁক যতক্ষণ উঁচু গাছের ঘন পাতার চাঁদোয়ার মধ্যে চলাফেরা করে ততক্ষণ কার সাধ্য তাদের দেখতে পায়! টিয়ার ঝাঁকও একই ভাবে পলক না ফেলতেই মিশে যায় ভুট্টাখেতের সবুজ পাতার মধ্যে। চাষী বুঝতেও পারে না অতগুলো পাখি মিলে তাদের ভুট্টার ভুষ্টিনাশ করছে। অবশ্য ঘন বনের পাখিদের

পালকের রঙ যে শুধু সবুজই হতে হবে তার কোনো মানে নেই। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যখন টুকরো টুকরো রোদ্দুর এসে পড়ে, আর ঠিক সেই আলোছায়ার জায়গাটাতে চুপ করে বসে থাকে টকটকে লাল কিম্বা হলুদ পালকের কোনো পাখি, তখন ওই উজ্জ্বল রঙের জন্যই দর্শকের চোখে ধাঁধা লেগে যায়। এমনকি কোনো কোনো পক্ষীবিজ্ঞানী মনে করেন, নানান জাতের মৌটুসি আর হামিং- বার্ডের পালকে যে চুনিপান্নার মতন রঙের ঝলমলানি সেটারও উদ্দেশ্য ওই শিকারীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মানে , এক্ষেত্রে কায়দাটা ক্যামুফ্লাজিং এর ঠিক উল্টো।

আর কোনো পাখি যদি এমন কোনো জায়গায় বাস করে যেখানে পরিবেশের রঙ ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমূল বদলে যায়? সত্যিই এরকম জায়গা আছে, আর আছে সেখানকার বাসিন্দা এক পাখি যার রঙবদলের খেলার কথা আবাক হয়ে শোনার মত।

এশিয়া আর উত্তর আমেরিকার উত্তর দিকের ভূপ্রকৃতি আর পরিবেশকে বলা “আর্কটিক তুন্দ্রা”। বছরের বেশিরভাগ সময়ে সেখানে উত্তরমেরু থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসে আর বরফের সাদা চাদরে ঢেকে থাকে চারিদিক। কিন্তু তুন্দ্রাতেও আছে এক সংক্ষিপ্ত বসন্তকাল। সেই অল্পদিনের বসন্তে চারিপাশের বরফের সাদা চাদর গলে যায়, বেরিয়ে আসে ন্যাড়া পাথরের জমি আর শুকনো ঘাস। এই তুন্দ্রা অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে মাটিতে চরে বেড়ানো একরকমের গোলগাল পাখি, যার নাম টার্মিগান(Ptarmigan)। টার্মিগানের সারা শরীর শীতকালে ধবধবে সাদা পালকে ঢাকা থাকে। তখন তাকে বরফের মধ্যে থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। এরপরে তুন্দ্রায় একটা সময় আসে যেটাকে বলা যায় শীত আর বসন্তের মাঝামাঝি সময়। তুন্দ্রার জমিতে তখন ছোপ ছোপ বরফ আর মাটি পাথরের মেলানো মেশানো ডিজাইন। টার্মিগানের শরীরেও এই সময় সাদা পালকের মাঝেমাঝে খয়েরি পালক উঁকি মারতে শুরু করে। এই সময় টার্মিগান যদি মাটিতে বুক চেপে, চুপ করে বসে থাকে তাহলে একহাত দূর থেকেও তাকে দেখে মনে হবে এক খন্ড পাথরের পাশে একটু বরফ জমে আছে । আর তারপর যখন পুরো তুন্দ্রাই ন্যাড়া পাথরের খয়েরি রঙ ধরে ততক্ষণে টার্মিগানের শরীরও পুরোপুরি খয়েরি পালকে ঢাকে পড়ে গেছে। কিন্তু শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার শরীর সাদা পালকে ঢেকে যায়। অবাক হওয়ার মতন ব্যাপার নয়?

ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে এরকম রঙ বদলের খেলা আরো অনেক পাখির মধ্যে দেখা যায়, সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে। বেশিরভাগ পাখিই সারা বছর একলা ঘোরে , কিন্তু বাসা বাঁধবার ঋতু এলেই সঙ্গিনীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু শুধু বেরিয়ে পড়লেই তো হয় না, একটু

সাজগোজ করে বেরোতে হয় তো। না হলে মেয়ে পাখিরা তাকে পছন্দ করবে কেন? আর পাখিদের সাজগোজের উপায় কী বল, রঙচঙে পালক ছাড়া? তাই সারাবছর ক্যামুফ্লাজের যোগ্য পালকে দেহ ঢাকা থাকলেও অনেক পাখির শরীরই ওই জুড়ি বাঁধবার বেশ চোখ টানার মতন রঙিন পালকে ভরে যায়। ওই সময়টুকুতে পাখিরা একটু ঝুঁকি নেয় বলতে পার, কিন্তু সেটাও প্রকৃতি চায় বলেই। ওইটুকু ঝুঁকি না নিলে তো পাখিদের জুড়ি বাধা হবে না , সেটা না হলে বাচ্চাকাচ্চাও হত না, আর তখন তো এমনিতেই বংশ ধ্বংস হয়ে যেত । তাই না?

এবার অন্য একটা কথা বলি। ক্যামুফ্লাজিং ছাড়াও পালকের রঙের কিন্তু আরো অনেক কাজ আছে। যেমন , যে পাখিরা দল বেঁধে একসঙ্গে উড়ে যায় তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে পালকের রঙের সংকেত। সেই রঙ দলের অন্য বন্ধুদের চোখ টানবার মতন জোরালো না হলে চলে কেমন করে? আবার উল্টোদিকে জোরালো রঙের পালকে শিকারীর চোখে পড়ে যাবার ভয়ও আছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন তাই এই উভয়সঙ্কটের এক চমৎকার সমাধান বার করেছে—

—একটা কথা তো সহজেই বোঝা যায়। যখন কোনো পাখি খাবারের দিকে নজর রেখে মাটিতে ঘোরাঘুরি করে কিম্বা বাসার মধ্যে বসে ডিমে তা দেয়, তখন সে অনেক বেশি বিপদে থাকে। তাই অনেক পাখিরই বসে থাকার সময় যে

পালকগুলো দেখা যায় সেগুলো তার পিঠের দিকের পালক আর তাতে থাকে ক্যামুফ্লাজের ধূসর কিম্বা খয়েরি রঙ। ওড়বার সময় তাদের যে পালক দেখা যায়, যেমন পেট, বুক, কিম্বা ডানার নিচের পালক, সেগুলো ধবধবে সাদা কিম্বা ওইরকম কোনো উজ্জ্বল রঙে রঙিন। কোচবক যতক্ষণ পুকুরের পাড়ে বসে থাকে ততক্ষণ তার পিঠ আর ডানার বাইরের দিকের খয়েরি পালকগুলোই খালি দেখা যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে আকাশে উড়ল তখনই সে এক ধবধবে সাদা বক। ম্যাজিকের মতন, তাই না? তোমার ঘরের আশেপাশে যে অতি সাধারণ শালিকপাখিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরও কিন্তু এই ম্যাজিকটা জানা আছে। খেয়াল করে দেখো শালিকের ওড়ার সময় ডানার নিচে দুটো উজ্জ্বল সাদা ছোপ চোখে পড়ে, যেগুলো আর কোন সময়ে দেখা যায় না।

ক্যামুফ্লাজ রঙের জন্যে পাখিরা কখনো কখনো অন্য আরেকটা সমস্যায় পড়ে। আগেই বলেছি, ছোটবেলায় অনেক পাখির বাচ্চাই মায়ের মতন ক্যামুফ্লেজ পালকে ঢাকা থাকে। পাখিদের তো বেশি বুদ্ধি নেই, তাই তারা এমনিতে অমন বাচ্চাকে বাচ্চা বলে নিশ্চয় চিনতে পারত না। ভাবত একটা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে- পাখি বুঝি। আর চিনতে না পারলে বাবা মা তাদের সেরকম আগলে রাখত না, ভাল করে খাওয়াতোও না। তখন সেই পাখির পুরো প্রজাতিটাই হারিয়ে যেত। প্রকৃতি কক্ষণো চায় না কোনো প্রজাতি হারিয়ে যাক। তাই সে এরও একটা চমৎকার সমাধান বার করেছে। অমন মাতৃমুখী বাচ্চাদের শরীরে প্রকৃতি এমন সামান্য রঙের

সংকেত দিয়ে রেখেছে যাতে তার ক্যামুফ্লেজ ভেঙে না যায়, অথচ বাবা মা যাতে বুঝতে পারে এটা বাচ্চাই বটে। যেমন ফিঞ্চের বাচ্চারা জন্মের কদিনের মধ্যেই অন্য সবদিক দিয়ে মা-পাখির মতন দেখতে হয়ে যায়, কিন্তু একটুখানি তফাৎ থাকে।

পূর্ণবয়স্কা মা- পাখির ঠোঁট হয় লাল, আর শিশু ফিঞ্চের ঠোঁট কালো। ওই কালো ঠোঁট দেখলেই মা আর বাবা- পাখির সন্তানস্নেহ উথলে ওঠে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কোনো শিশু ফিঞ্চের ঠোঁটে যদি লাল রঙ করে দেওয়া হয় তাহলে বাবা মা তাকে আর খাবার খাওয়ান না। এর থেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছ, পাখিদের বেঁচে থাকার জন্যে তার শরীর আর স্বভাব দুটোই কি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

এই যে এতক্ষণ ধরে ক্যামুফ্লেজিং এর কথা বলছি, এও কিন্তু শুধু শরীর দিয়ে, শুধু পালকের রঙ দিয়ে সম্ভব নয়। তার সঙ্গে তাল মেলানো স্বভাবটাও জরুরি। যেমন , স্থির নিশ্চলভাবে বসে থাকাটা ক্যামুফ্লেজিং- এর একটা বড় শর্ত। পাখিরা জন্ম থেকেই সেটা জানে। তাই দেখবে সদ্য ডিম ফোটা বাচ্চারাও মা বাবা বাসায় না থাকলে চুপ করে শুয়ে থাকে। তখন তাদের নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু। মাটিতে চড়ে বেড়ানো পূর্ণ বয়স্ক পাখিরাও আকাশে বাজ কিম্বা ঈগলপাখি দেখলে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, যতক্ষণ সেই শিকারী পাখি চলে না যাচ্ছে। প্যাঁচা কিম্বা নাইটজাররা সারাদিন অমন চুপ করে বসে থাকতে পারে, অথচ সেই পাখিরাই রাতে শিকার ধরবার সময় কি অসম্ভব ক্ষিপ্র!

শরীর আর স্বভাবের যুগলবন্দীর একটা গল্প বলে ক্যামুফ্লেজিং এর কথা শেষ করব। আমাদের এই বাংলাদেশে দিঘী কিম্বা ঝিলের ধারে ঘন শরবনের মধ্যে বকের মতন একটা পাখি দেখা যায়—তার ইংরিজি নাম Chestnut Bittern । বাংলায় কেউ কেউ বলে থাকেন লাল বক যদিও বকের থেকে এর প্রজাতি ভিন্ন। এই পাখিটার গায়ের রঙ গাছের শুকনো ছালের মতন লালচে খয়েরি। লম্বাটে গলায় আর পেটে ডোরা ডোরা বাদামি দাগ আছে। খয়েরি পাতায় ভরা শরবনের মধ্যে এমনিতেই বিটার্নকে দেখতে পাওয়া মুশকিল, তার ওপর হঠাৎ কোনো বড়সড় প্রাণীর মুখোমুখি পড়ে গেলে এই পাখি গলাটাকে টানটান করে ওপরদিকে তুলে একদম স্ট্যাচু হয়ে যায়। এটাই তার জন্মগত প্রবৃত্তি। তখন চারপাশের লম্বা লম্বা শরডাঁটাগুলোর সঙ্গে বিটার্নের বুক পেটের ওই লম্বাটে ডোরাগুলো এমন সুন্দর মিশে যায় যে, কী বলব! মনে হয় পাখি নয়, ওখানে যেন একগোছা শরডাঁটাই মাথা উঁচু করে আছে।

কিন্তু এরপরেও যদি শত্রুকে বোকা বানানো না যায়? যদি সে এগিয়ে আসতেই থাকে?

শুধু বিটার্ন কেন? সব পাখিই তখন একটাই কাজ করে। লুকনোর জায়গা ছেড়ে , শিকারীকে হকচকিয়ে দিয়ে তীব্রবেগে উড়ে যায়।

শরীর বাঁচাতে না পারলে তখন স্বভাব তাদের বাঁচায়।

চেনা পাখির অচেনা পরিচয়
কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বউ কথা কও

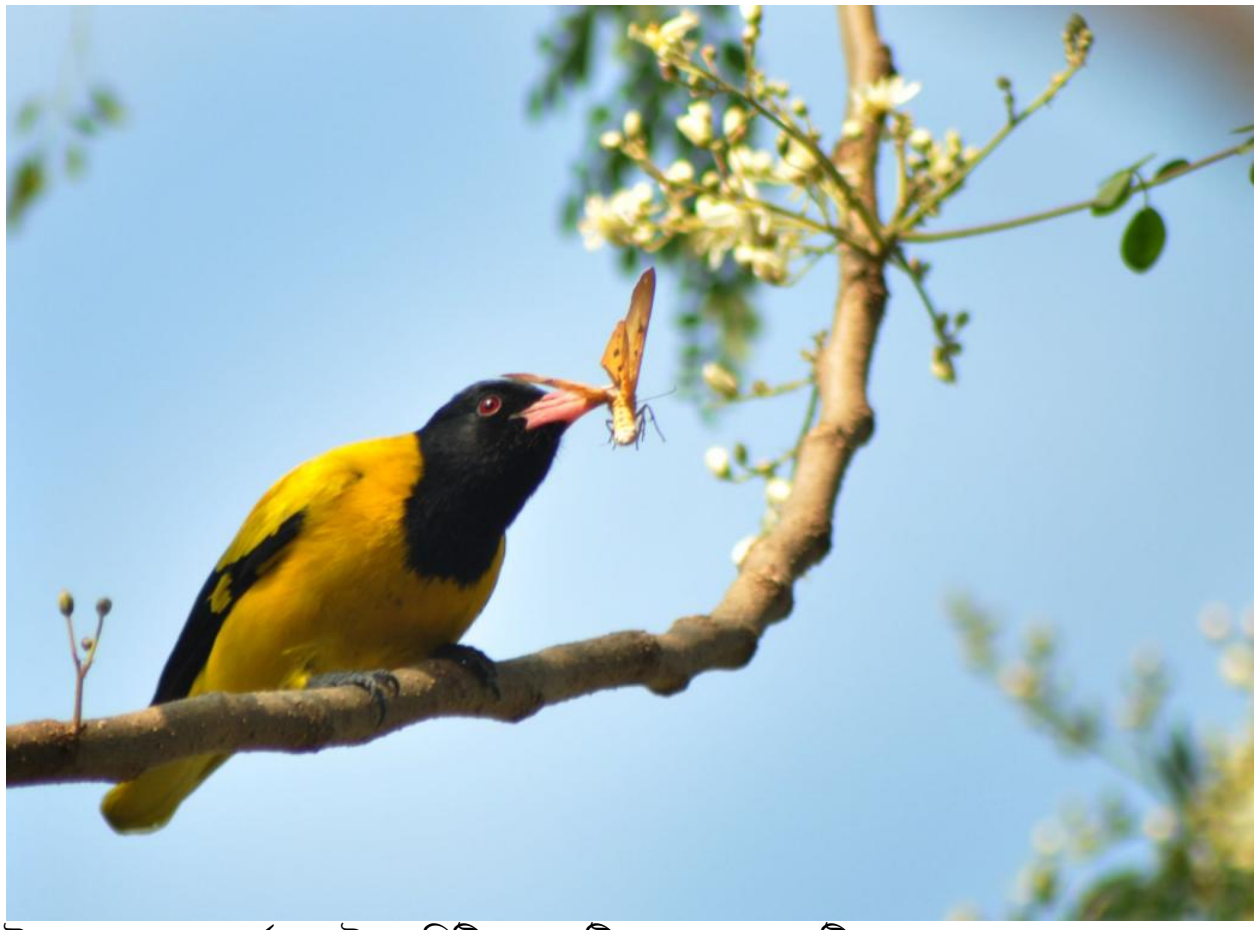

উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের এই পাখিটির মাথাটি কালো, লেজটিও কালো হয়। পোকামাকড় এবং ফলমূল খায়।কখনোসখনো এই পাখিটিকে জলে ডুব দিয়ে স্নান করতে দেখা যায়। দুটি ডালের ফাঁকে চায়ের কাপ-এর মতো বাসা বানায়। হালকা বনাঞ্চলে, জনবসতির মধ্যে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

টেকনো টুকটাক

স্ট্যাচু অব ইউনিটি

কিশোর ঘোষাল

সম্প্রতি ভারতের গুজরাট প্রদেশে বারুচ শহরের অনতিদূরে, সাধুবেট নামক নর্মদানদীর একটি ছোট্ট দ্বীপে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই মূর্তিটির নাম "একতা মূর্তি" বা "স্ট্যাচু অব ইউনিটি"। মূর্তিটি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের। তাঁর কঠোর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যে সারা দেশের মানুষ তাঁকে ভালবেসে "লৌহমানব" বলে ডাকত।

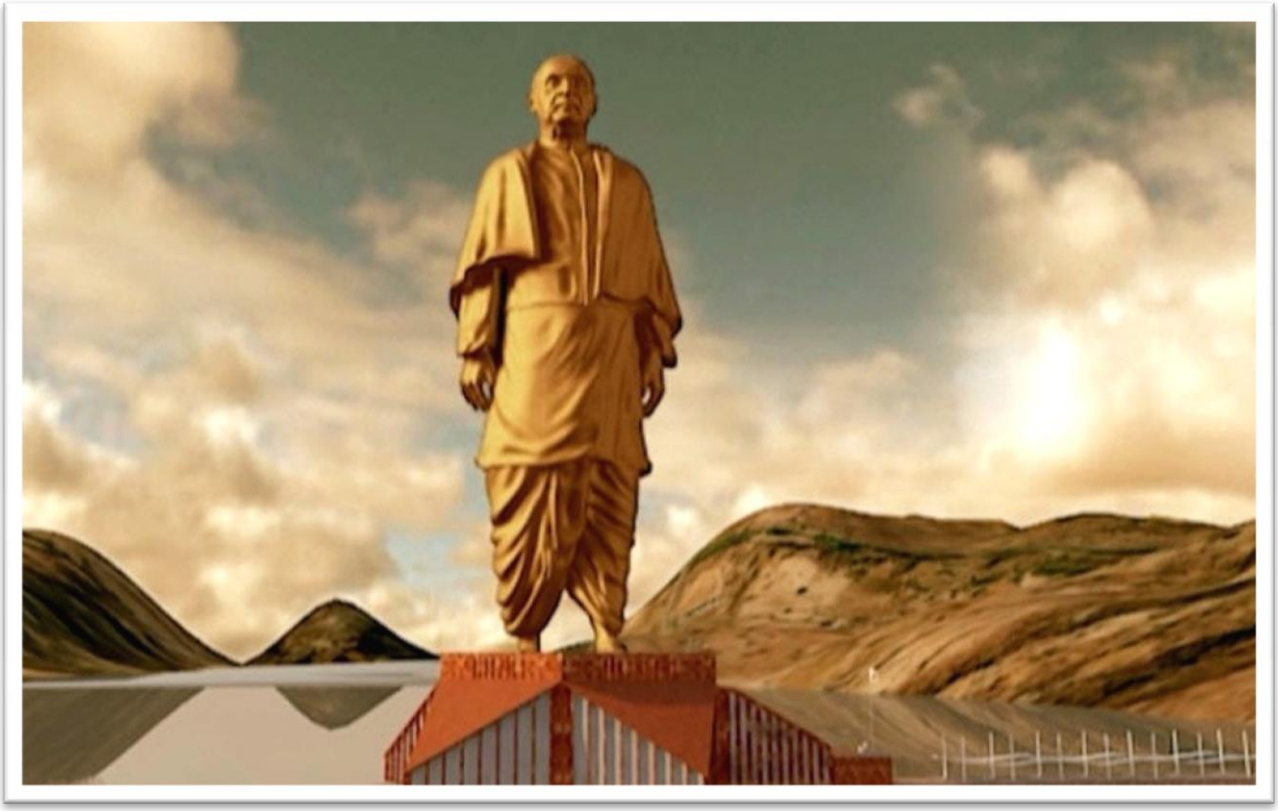

যদিও এই একতা মূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব ঘোষিত হয়েছিল ২০১০ সালের ৭ই অক্টোবর, কিন্তু গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী সবে মাত্র এই সেদিন – ২০১৩ সালের ৩১শে অক্টোবর, সর্দার প্যাটেলজির ১৩৮তম জন্মদিনে, এই মূর্তির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত করেছেন। এই মূর্তির ভিত্তির উচ্চতা হবে ৫৮ মিটার আর মূর্তির উচ্চতা ১৮২ মিটার, তার মানে মাটি থেকে ২৪০ মিটার উঁচু হবে সম্পূর্ণ কাঠামোটি। লোহার বিশাল খাঁচা আর কংক্রিটে গড়ে উঠবে এর মূল কাঠামোটি, তারপর ব্রোঞ্জের প্রলেপে রূপ পাবে সর্দার প্যাটেলজির চেহারা।

২০১৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি এই মূর্তির কাজ শুরু হবার কথা। এটি বানাতে সময় লাগবে ৪ বছর ৮ মাস। তার মধ্যে ১৫ মাস লাগবে মূর্তিটির প্রযুক্তিগত হিসেবপত্র আর নকশা বানাতে, আর বাকি সময় লাগবে মূর্তিটিকে গড়ে তুলতে। এখনও পর্যন্ত এই মূর্তি গড়ার খরচের হিসাব অনুমান করা হয়েছে প্রায় ২০৬৩ কোটি টাকা। অবশ্য এই খরচের হিসেবের মধ্যে এই মূর্তি ছাড়াও, নর্মদা নদী পার হয়ে দ্বীপে পৌঁছানোর জন্য একটি সেতু ও প্রায় ১২

কিমি লম্বা নতুন রাস্তা নির্মাণের খরচও ধরা আছে। এই সম্পূর্ণ খরচের টাকা আসবে পিপিপি, তার মানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে। অধিকাংশ টাকাই আসবে ভারতের জনগণের দান থেকে, কিছু অংশ বহন করবে সরকার।

এই মূর্তি বানাতে যে লোহার প্রয়োজন সেই লোহা দান হিসাবে যোগাড় করা হবে সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে চাষীভাইদের থেকে। তাদের ঘরে ঘরে পড়ে থাকা কৃষিকাজে ব্যবহার করা যন্ত্রপাতির ভগ্নাংশ যোগাড় করার জন্যে সারা ভারতে খোলা হয়েছে মোট ৩৬টি সংগ্রহ কেন্দ্র।

আমাদের দেশের মানুষের বিশাল এই কর্মকাণ্ডের সার্বিক প্রচেষ্টায় বছর পাঁচেকের মধ্যে "একতা মূর্তি" বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উঁচু মূর্তির কথা বললে বুঝতে পারবে, আমাদের দেশের এই "একতা মূর্তি" একটি অসাধারণ কীর্তি হতে চলেছে।

<u>স্প্রিং টেম্পল বুদ্ধঃ</u>

বৈরোচন বুদ্ধের এই ১২৮ মি উঁচু মূর্তিটি চিনের হেনান প্রদেশের ঝাউকুন শহরে একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয়েছিল ২০০২ সালে। ২০ মি উঁচু পদ্মের সিংহাসনের উপর ১০৮ মি উঁচু বুদ্ধের মূর্তিটি গড়ে তুলতে সেই সময়েই খরচ হয়েছিল প্রায় ৩৩০ কোটি টাকা। প্রায় ১০০০ টন তামা ১১০০টি অংশে ঢালাই করা হয়েছিল এই মূর্তিটি গড়ে তোলার সময়। এই মূর্তির ঠিক নিচেই আছে একটি বৌদ্ধ গোম্ফা। ২০০১ সালে তালিবান জঙ্গীদের হাতে আফগানিস্তানের প্রাচীন বামিয়ান বুদ্ধ মূর্তিগুলি ধ্বংস হবার পরেই এই মূর্তি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় চিনা সরকার।

যে পাহাড়ে এই মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছে, তার অদূরে আছে তিয়ানরুই উষ্ণ প্রস্রবণ বা হট স্প্রিং যার জলের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি। এই উষ্ণ প্রস্রবণের নামেই এই মূর্তির নাম স্প্রিং টেম্পল বুদ্ধ। বর্তমানে এই মূর্তিটিই বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি।

<u>ল্যাকিউন শেৎকিয়রঃ</u> এটিও গৌতম বুদ্ধের মূর্তি। ১৩.৫ মি উঁচু সিংহাসনের উপর ১১৬ মি উঁচু এই বুদ্ধ মূর্তিটি মায়ানমারের মোইনোয়া শহরের কাছে খাতাকান টোং গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৮ সালে। এই মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। এই মূর্তিটির ভিতরটি ফাঁপা, মূর্তির ভিতরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যায় এবং সেখান থেকে মূর্তির গায়ের জানালা দিয়ে দেখে নেওয়া যায় চারপাশের দৃশ্যাবলী। এখনও পর্যন্ত এই মূর্তিটিই বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম মূর্তি।

উশিকি দাইবুৎসুঃ এটিও অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তি। জাপানের হনসু দ্বীপের ইবারাকি প্রিফেকচারের উশিকিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। প্রিফেকচার অনেকটা আমাদের দেশের জেলার মতো, এর আগেকার নাম ছিল হিতাচি প্রভিন্স, ১৮৭১ সালে নাম পাল্টে হয়ে যায় ইবারাকি। ১০ মি উঁচু ভিত্তির ওপর, ১০ মি উঁচু পদ্ম সিংহাসন, তার ওপরে ১০০ মি উঁচু এই মূর্তিরও ভিতরটি ফাঁপা। মূর্তির ভিতরেই চারতলা একটি বাড়িতে আছে ছোট্ট একটি মিউজিয়াম। মূর্তির ভিতরে একটি এলিভেটর চড়ে ৮৫ মি উঁচুতে একটি প্ল্যাটফর্মে ওঠা যায়, সেখান থেকে মূর্তির চারপাশের ফুলের বাগান ও ছোট্ট একটি চিড়িয়াখানার দৃশ্য দেখার মতো। ব্রোঞ্জে বানানো এই মূর্তির ওজন ৪০০৩ টন, কানের মাপ ১০ মি, চোখের মাপ ২.৫৫ মি আর নাকটি ১.২০ মি। এখনও পর্যন্ত এই মূর্তিটি বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম মূর্তি।

স্ট্যাচু অফ লিবার্টিঃ আমেরিকার স্ট্যাচু অফ লিবার্টির মূর্তির সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর সকলেই পরিচিত। এই সুন্দর মূর্তিটি স্বাধীনচেতা আমেরিকানদের মুক্তচিন্তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লিবার্টাস নামে এক রোমান দেবীর এই মূর্তিটি। ডান হাতে উঁচু করে ধরে আছেন একটি মশাল, আর অন্য হাতে ট্যাবুলাস আনসাটা, যার ওপরে রোমান হরফে খোদাই করা আছে ৪ঠা জুলাই ১৭৭৬, আমেরিকার স্বাধীনতার দিনটি। মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে আছে ভাঙা শিকলের টুকরো। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে যুদ্ধজয়ী সৈন্যবাহিনীর সেনানায়ককে প্রশংসা বা কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সম্রাটরা একটি ধাতু বা চামড়ার পাত দিতেন, সে পাতের ওপর রোমান হরফে লেখা থাকত তাঁদের কৃতিত্বের কথা, সেই পাতটিকেই বলত ট্যাবুলাস আনসাটা, অনেকটা আমাদের রাজাদের আমলের তাম্রপত্রর মতো।

সমুদ্রপথে আমেরিকায় ঢোকার মুখে এই মূর্তিটি বিদেশ থেকে আসা সকলকে যেন বুঝিয়ে দেয় আমেরিকার অধিবাসীদের স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসার কথা। ৪৬ মিটার উঁচু এই মূর্তিটি ৪৭ মিটার উঁচু বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন অংশে মূর্তিটি বানানো হয়েছিল ফ্রান্সে, বিশাল বিশাল বাক্সে ভরে সেইসব অংশ ফ্রান্স থেকে জাহাজে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল। আমেরিকায় নিউইয়র্ক হার্বারে লিবার্টি দ্বীপের মাঝখানে বানিয়ে তোলা বেদিটির উপর ফ্রান্সের শিল্পীরা মূর্তিটিকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৮৮৬ সালের ২৮শে অক্টোবর।

এই মূর্তির ভিতরে দুটি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে মূর্তির মুকুট পর্যন্ত ওঠা যায়, সেখানকার জানালা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখে নেওয়া যায় চারপাশের দৃশ্য। মূর্তির ডানহাতের ভিতরে আর একটি সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়া যায় মশালের চারদিকের ঝোলানো বারান্দায়। মাটি থেকে ৯৩ মি উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দর্শকরা এমন একটি সৃষ্টির জন্য অনুভব করতে পারতেন গর্ব এবং রোমাঞ্চ। নিরাপত্তার কারণে ১৯১৬ সাল থেকে এই বারান্দাটি সাধারণ দর্শকের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১২৭ বছরের বহু ঝড়ঝাপটা সামলে বিশ্বের চতুর্থ উচ্চতম এই মূর্তিটি আজও স্বমহিমায় বিরাজিত।

মাদারল্যাণ্ড কলসঃ ২৩শে আগষ্ট ১৯৪২ থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ পর্যন্ত ২০০ দিন ধরে স্তালিনগ্রাড যুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করা হয়। এই ভয়ংকর যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজের হাতে ভীষণভাবে পরাস্ত হয়েছিল জার্মানির নাৎসী বাহিনী। সেই যুদ্ধজয়ের স্মৃতিতে ১৯৬৭ সালে রাশিয়ার ভলগোগ্রাড শহরের মামায়েভ কুরগানে ৮৭ মি উঁচু এই মূর্তিটি স্থাপিত হয়। মাদারল্যাণ্ড কলস মানে মাতৃভূমির আহ্বান, মাতৃরূপী এই মূর্তি হাতে উদ্যত তলোয়ার নিয়ে দেশবাসীকে ডাকছেন, দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে। মূর্তির উচ্চতা ৫২ মি, ডানহাতে উদ্যত তলোয়ারটির দৈর্ঘ ৩৩ মি। ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর এই মূর্তিটির কাছে উঠতে ২০০ ধাপের সিঁড়ি পার হতে হয়, ২০০ সিঁড়ি, ২০০ দিন যুদ্ধের স্মারক। এই মূর্তিই এখন বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম মূর্তি।

- oo-

ব্যাঙের নাম পিনোশিও

পিনোশিওকে মনে আছে নাকি? সেই যে, মাঝেমাঝেই যার নাকখানাহঠাৎ করে বেজায় লম্বা হয়ে যেতএকখানা লাঠির মত।! বছরকয়েক আগে সতিকারের এক পিনোশিওকে আবিষ্কার করা গেছে।

নিউ গিনির ফোজা পাহাড়ের গভীর অরণ্যে সর্পবিশারদ পল অলিভার ক্যাম্প করছিলেন ২০০৮ সালে। সেখানে এখনও প্রায় তিন হাজার বর্গ কিলোমিটার আদিম , মানুষের ছোঁয়া না লাগা অরণ্য আছে। হঠাৎ তাঁর চালের বস্তাটার ওপরে তিনি বসে থাকতে দেখেন শ্রীমানকে। সবজেটে গায়ের রঙ। এমনিতে এলেবারে স্বাভাবিক।কিন্তু মজা হল সে ডেকে উঠতে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার নাকের ডগাটা একটা ডান্ডার মতন সামনে এগিয়ে চলে এল। ডাক থামতেই নাক আবার একেবারে যে কে সেই।

ডাক ছাড়বার সময় নাক কেন লম্বা হয় সে নিয়ে বিজ্ঞানিরা এখনও ধাঁধায়। কারো কারো মতে ওই ভেঁপুর মতন নাক নাকি আসলে একটা অ্যামপ্লিফায়ার যার কল্যানে ডাকটা অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে তার। তবে সকলেই কিন্তু এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নন।

ভারতের বৈজ্ঞানিক

একদল নামহীন প্রযুক্তিবিদ

সংহিতা

বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ব্যবহার করে জীবনযাপনে লাগে এমন জিনিস বানানোর পদ্ধতি হলো প্রযুক্তি। সেরকমভাবেই কাগজ বানানো, আতর বানানো বা বারুদ বানানোর কৌশলও প্রযুক্তি।

মধ্যযুগে ভারতের নানা অঞ্চলে আলাদা আলাদাভাবে শুরু হয়েছিল কাগজ তৈরি করার কাজ। এর মূলে ছিল রসায়নশাস্ত্রের জ্ঞান। কাশ্মীর, শিয়ালকোট, জাফরাবাদ, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, মাইসোর, আমেদাবাদ, আওরঙ্গাওবাদ ছিল কাগজ উৎপাদনের মূল কেন্দ্র। প্রত্যেক এলাকাতে কাগজ তৈরির পদ্ধতি প্রায় একই ছিল। কিন্তু কাগজের মণ্ড বানানোর জন্য যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হতো সেগুলো প্রায়ই একেক এলাকায় একেকরকম ছিল।

কিন্তু কাগজ বানানোর কৌশল যাঁরা রপ্ত করেছিলেন তাঁরা কীভাবে কবে কোথা থেকে এই বিদ্যা পেয়েছিলেন সে নিয়ে বিশদে কিছু জানা যায় না। জানা যায় না এই কাজের পথিকৃৎ কে বা কারা ছিলেন সে কথাও। কারণ মধ্যযুগের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অনেক তথ্যের মতো এই সংক্রান্ত তথ্যও হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির সমুদ্রে। হয়তো প্রাচীনযুগের মতো সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কারের কথা লিখে রাখার চল মধ্যযুগে ছিল না বলেই অনেক কৃতি নাম হারিয়ে গেছে।

মধ্যযুগেই ভারতে এসেছিল বারুদ। কাগজের মতো বারুদও প্রথম চিন দেশেই বানানো হয়েছিল। তারপর মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টার সাথে সাথে বারুদও পৌঁছে যায় ভারতে। তবে ‘শুক্রনীতি’র মতে শুক্রাচার্যই নাকি জানতেন যে সল্টপিটার, গন্ধক আর কয়লা

মিশিয়ে কেমন করে বারুদ বানাতে হয়।

তারপর যত রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাড়তে থাকে তত বাড়তে থাকে বারুদের বহুমুখী ব্যবহার। বাজির জন্য যে ধরনের বারুদ ব্যবহার করা হতো তা কামানের গোলার বারুদের থেকে নিশ্চয়ই আলাদা ছিল। বারুদের শক্তিকে বহুগুণ বাড়াতে বাদশাহ আকবরের সময়েই প্রথম বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। পরে ইউরোপিয়ান যোদ্ধারা ভারতে পৌঁছলে বারুদের ব্যবহার আরও ব্যাপক হয়ে পড়ে উন্নততর বন্দুকের ব্যবহারে।

আকবর বাদশাহের আতর সংগ্রহটিও ছিল মধ্যযুগের রসায়নবিদদের গবেষণার ফল। যেটুকু তথ্য আইন-ই-আকবরি থেকে পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে আতরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে বাদশাহ আকবরের জমানায় আলাদা দপ্তর ছিল এবং সবথেকে জনপ্রিয় গোলাপগন্ধী আতরের আবিষ্কারক ছিলেন নুরজাহান। কিন্তু রাজপরিবারের বাইরে অসংখ্য যে মানুষরা মধ্যযুগীয় জীবনকে রসায়নে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের পরিচয় অচেনাই রয়ে গেছে, তাঁদের কথা কেউ লিখে রেখে যায়নি বলে বা নিরক্ষরতার আগ্রাসনে।

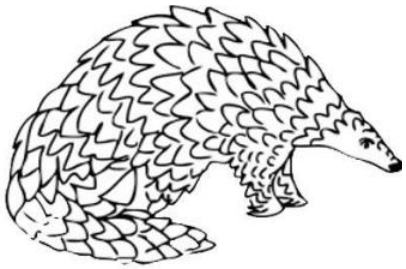

প্যাঙ্গোলিনের সঙ্গে কটা দিন

স্বপ্না লাহিড়ী

কদিন ধরে অঝোর ধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। পাহাড়ি জায়গা বলে বাঁচোয়া, জল নেমে যায় পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে। সমতল হলে আর রক্ষা ছিল না।রাস্তাঘাট জলে থৈ থৈ করত। একে ঝড় জলের দিন, তার ওপর পরপর তিনটে পিরিয়ড নিয়ে মনে হচ্ছিল এক কাপ চা (আমার বাবার ভাষায় ভিটামিন টি) না হলে আর চলছে না। অবশ্য জানতাম ল্যাবের সঙ্গে লাগানো আমার ছোট্ট অফিসের টেবিলে, এক কাপ গরম চা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

আরও একটা ক্লাস আছে খানিক বাদে। সেই বিষয়ে ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপটা সবে হাতে নিয়েছি , দরজার পর্দা ঈষৎ সরিয়ে এলোমেলো চুল, জলে ভেজা একটি মুখ বললো "ম্যাম আসবো?" ভেতরে আসতেই একটু অবাক হয়ে দেখলাম, ছেলেটি এম. কম ফাইনালের , মাথা থেকে জল গড়িয়ে পায়ের নিচে পুকুর বানিয়ে দিচ্ছে আর তার বর্ষাতিটা হাতে গোল করে ধরা।আমি অধ্যাপনা ছাড়াও কিছু কিছ কার্যকলাপে জড়িত থাকতাম বলে কলেজের বেশির ভাগ ছেলেদেরই চিনতাম। ছেলেটি নিঃশব্দে হাতের বর্ষাতিটা সরাতেই দেখি মাথা নেই, ল্যাজ নেই, বড় বড় আঁশে মোড়া একটা বল ।

আমি অবাক গলায় বলে উঠলাম, "প্যাঙ্গোলিন, কোথা থেকে পেলে?" আগে এ জীবটি মাঝে মাঝে চোখে পড়ত, কিন্তু ওপেন ক্যয়ারি (খোলামুখ কয়লার খনি) শুরু হবার পর থেকে এক্সাভেসন আর ব্লাস্টিং –এর জন্য লেপার্ড, হায়না, নেকড়ে এবং এদের মতন আরও জীবজন্তু বাস্তু হারা হয়ে পালিয়েছে অন্য জঙ্গলে আশ্রয়ের খোঁজে। ছেলেটি বলল ওদের বাড়ি থেকে কলেজের রাস্তায় এক টুকরো জঙ্গল পড়ে, ও সেখান দিয়ে আসার সময় প্যাঙ্গোলিনটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে, নিজের বর্ষাতিটা চাপা দিয়ে সোজা আমার কাছে নিয়ে চলে এসেছে। এক কাপ গরম চা দিয়ে ছেলেটিকে বাড়ি গিয়ে ভিজে জামাকাপড় বদলে নিতে বললাম । ততক্ষণে আমার প্যাঙ্গোলিন হাত পা ছড়িয়ে সোজা হয়ে, তার কালো মুক্তোর মতন চোখ দিয়ে আমাকে পরখ করছে আর হয়ত ভাবছে এটা কী জাতীয় সৃষ্টি ভগবানের?

আমার ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট রামচরণ আর ডিপার্টমেন্টের কিছু ছেলেরা মিলে একটা মাঝারি মাপের কাঠের ক্রেটের এক দিকে বেশ শক্ত পোক্ত জাল লাগিয়ে প্যাঙ্গোলিনটার একটা বাসা

বানিয়ে দিল। দু দিনেই প্যাঙ্গোলিনটা আমাদের বন্ধু হয়ে গেল। যতটুকু সময় তাকে ছাড়া হয়, সে ল্যাবের মধ্যেই পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়, আবার কখনো গোল বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ছাত্র ছাত্রীরা সমানে তাকে পিঁপড়ে, ফড়িং, আরশোলা, ডিমসেদ্ধ এমনকি পাউরুটি পর্যন্ত খাওয়াচ্ছে। প্যাঙ্গোলিনরা সাধারনত রাতেই ঘোরে আর তদের ধারালো নখ দিয়ে উই, পিঁপড়ের বাসা খুঁড়ে তাদের লম্বাটে শুঁড়ের মতন মুখ ঢুকিয়ে চিপচিপে জিভ দিয়ে উই বা পিঁপড়ে ধরে খায়। কিন্তু এখানে আমরা উই এর ঢিপি বা পিঁপড়ের বাসা কোথা থেকে আনি ! জেরালড ডারেলের লেখা একটি বইতে (থ্রি সিংগলস্ টু আডভেঞ্চারস) পড়েছিলাম তিনি তাঁর প্যাঙ্গোলিনদের দুধ, কিমা ও ডিমের মিশ্রণ খাওয়াতেন, তাও বা আর সম্ভব হচ্ছে কোথায়? আরও মুশকিল হল তার নখ দিয়ে সে দেয়াল, মেঝে সব খুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ করলাম প্যাঙ্গোলিনটা কেমন যেন মনমরা হয়ে যাচ্ছে। স্থির করলাম ওকে ওর নিজের পরিবেশেই ফিরিয়ে দেয়া উচিত। সেদিন ক্লাস কম ছিল, দুটো পিরিয়ড নেবার পর রামচরণকে বললাম, "প্যাঙ্গোলিনটাকে একটা ব্যাগে নিয়ে নাও, ওকে ওর বাড়িতে দিয়ে আসি।"

ডিপার্টমেন্টের ছেলেদের, ও এম.কমের সেই ছেলেটিকে প্যাঙ্গোলিনটার অবস্থার কথা আগেই বলেছিলাম। সে চলে যাবে শুনে ওদেরও খুব মন খারাপ।

আমার স্কুটারে রামচরণকে পেছন বসিয়ে গেলাম সেই জঙ্গলের ধারে। ব্যাগের মুখটা খুলতেই আমাদের ক'দিনের বন্ধুটি গুটগুট করে ফিরে গেল তার পরিচিত জায়গায়।

মনে মনে বললাম ভাল থেকো। মনটা বড় খারাপ লাগছিলো কিন্তু ভালোও লাগছিল এই ভেবে যে ও ওর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে।

ত্রিপুরার জীববৈচিত্র্য

ত্রিপুরার জীববৈচিত্র্য ইন্দো- মালয় ইকো জোনের অংশ হলেও তা ইন্দো- বার্মা বায়োডাইভার্সিটি হটস্পটের অংশ কিনা তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই এখনও। এখানেও এমন অনেক জীব আছে যাদের অস্তিত্ব সংকটে। তাই এই রাজ্যে চারটে অভয়ারণ্য ও দুটো জাতীয় উদ্যান আছে।

এই রাজ্যের ভূ- ভাগ সারা ভারতের ভূ- ভাগের ০. ৩২% এবং এখানে সারা দেশের জনসংখ্যার ০. ৩% শতাংশ বাস করেন। আবার সারা রাজ্যের ভূভাগের ৬০%- এর অল্প বেশি নথিবদ্ধ বনভূমি। বনভূমির ৬৬. ৩৩% হলো রিজার্ভ ফরেস্ট আর ০. ০৩% প্রোটেক্টেড বনাঞ্চল।

বনবিদ চ্যাম্পিয়ন ও শেঠের হিসেবে এখানে মূলত ছ ধরণের বন দেখা যায় যেগুলোকে দুটো দলে ভাগ করা যায়ঃ ক্রান্তীয় আংশিক চিরহরিৎ বন এবং ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন। গাছপালার মধ্যে প্রধান হলো গর্জন, কাঁঠাল জাতীয় গাছ, আম, আমড়া, জলপাই, জাম। বাইরে থেকে এনে বসানো হয়েছে ইউক্যালিপটাস। এই অঞ্চলের বনে বাঁশও পাওয়া যায় অনেক। জলা জায়গায় নিম, শিরীষ, ম্যাকারাঙা, ব্যারিংটোনিয়াও দেখা যায়।

ত্রিপুরার বনে পশুর বৈচিত্র্যও প্রচুর। তিনশ প্রজাতির পাখি যেমন এখানে পাওয়া যায় তেমনই পাওয়া যায় পনের প্রজাতির বানর। তবে স্থলচর স্তন্যপায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এখানে। প্রায় নব্বই প্রজাতির স্তন্যপায়ীর মধ্যে যেমন হাতির মতো বিশালাকার পশু আছে তেমন আবার বার্কিং ডিয়ারের মতো খুদে চেহারার পশুও আছে। বড়র দলের আরেক সদস্য ভালুক। আবার ছোটদের দলে বিন্টুরাং ও সজারু দেখা যায়। মাঝারি দলের মধ্যে যেমন আছে বুনো কুকুর, তেমন আছে গাউর, সম্বর, বুনো শুয়োর। প্রধান মাংশাসীর উদাহরণ সাধারণ লেপার্ড আর ক্লাউডেড লেপার্ড।

ভারতের একমাত্র ক্লাউডেড লেপার্ড সংরক্ষণের জাতীয় উদ্যান আছে ত্রিপুরাতেই। ত্রিপুরার অন্য জাতীয় উদ্যান হলো রাজবাড়ি জাতীয় উদ্যান। রাজবাড়ি জাতীয় উদ্যানের বিস্তার মাত্র ৩১ বর্গ কিলোমিটার। তবে ক্লাউডেড লেপার্ড জাতীয় উদ্যানের বিস্তার ৫৫০ বর্গ

কিলোমিটার। এটা সিপাহিজলা অভয়ারণ্যের মধ্যেই একটা অংশ। সিপাহীজলা মূলত পাখিদের সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের পশু ফ্রে'- স লিফ মাঙ্কির আদত বাসও এখানেই। ত্রিপুরার বন ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এই চশমাচোখো বাঁদর দেখা যায় না। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে চশমাচোখো বাঁদরের আরও কিছু প্রজাতি আছে। কিন্তু ত্রিপুরার ফ্রে'- স লিফ মাঙ্কি ভারতে ও পৃথিবীতে অনন্য। অন্য তিনটি অভয়ারণ্য হলো গুমটি, রোওয়া ও তৃষ্ণা। এদের মধ্যে গুমটি পাখির সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরার বনের সমস্যা হলো যে এখানে পাতলা ও মাঝারি বনের পরিমাণ বেড়েছে। ঘন বনের এলাকা কমে গেছে। তাছাড়া এখানে বনের মোট পরিমাণও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে দেখা গেছে যে ঝুমচাষের জন্য নতুন নতুন এলাকায় বন কেটে চাষজমি বানানো হয়েছে আর নানা জায়গায় প্রাকৃতিক বন কেটে ব্যবসায়িক রবারের জন্য রবার গাছের বাগান তৈরি করা হয়েছে। ত্রিপুরার পক্ষে ঝুম চাষ বা রবার বাগানের জন্য বনের ক্ষয় রোখা বেশ কঠিন কাজ। কারণ এখানে জনসংখ্যার চারভাগে তিনভাগের বেশি গ্রামে বাস করেন। ফলে তাঁদের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য বনের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়বে বই কমবে না।

রাক্ষস রাক্ষুসী

রতনতনু ঘাটী

সেদিন দেখি তাল- সুপুরি বনের পাশে
দাঁড়িয়ে ছিল শূর্পণখা রাক্ষুসীটা।
সন্ধে তখন নেমেই গেছে, নয়তো বাকি,
“মনে রাখিস,মারতে পারি এই ঘুঁষিটা!”

বলেই আমি ছুটছি জোরে মাঠ পেরিয়ে
দানব- ডোবা দিঘির পরে থমকে দেখি
মেঘ পেরিয়ে আসছে হেঁটে তারকাসুর
হাঁক ছাড়ছে, “আলেনটেকি, আলেনটেকি!”

এর মানে কি ডিকশনারি ঘাঁটলে পাব?
মেল করব দেবকীনাথ বসুর কাছে?
বাংলাতে সে একশোই পায়, সেই পারবে!
তাকিয়ে দেখি, বকাসুরটা ঝুলছে গাছে।

মেল না করে চেঁচিয়ে বলি, “ঝুলছ কেন?
পড়লে যাবে হাত- পা ভেঙে, হাসপাতালে...”
হিড়িম্বাটা কানের কাছে মুখটা এনে
জীবনমুখী গান শোনাল তালবেতালে।

সান্ধ্য জগিং সারছে একা নিশুম্ভটা
বলল হেঁকে, “টলিকটোমা টলিকটোমা!
সিক্সে পড়ো, এর মানেটা জানবে কবে?
বাংলা জানে দানবকুলে অসিতলোমা।”

ও মা, এটাই বাংলা নাকি? কেমন ছিরি!
বাংলা সারের কাছে তখন জানতে গেছি,
ভয় পাইনি, আকাশছোঁয়া আঁকশি দিয়ে
জটাসুরের জটার ফাঁকে চাঁদ পেড়েছি।

সে চাঁদ নিয়ে আমি যখন ফিরছি বাড়ি
কণ্বমুনির তপোবনের পাশের ঝিলে
ক্ষীরের পরে ভাসছে কত মুড়কি- মোয়া
সাঁতার কাটে দৈত্য এবং দানব মিলে।

যেই বলেছি, “নামব নাকি? সাঁতার জানি!”
রাক্ষসীরা উড়াল দিল বাংরিপোসি,
হঠাৎ দেখি দাঁত ভেঙাল আমার দিকে
নীলচে- রঙা পূতনা আর কুম্ভীনসী।

ভাবছি আমি কেমন করে ফিরব বাড়ি?
কাশ ফুটেছে, ঢাক বাজছে অনেক দূরে...
পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গা মা যে
আমায় নিতে পাঠিয়ে দিল মহিষাসুরে।

ছবিঃ মৌসুমী, ইন্দ্রশেখর

অন্যরকম

আবু হোসেন

এক যে ছিল লোক
তার প্রাণে বেজায় শোক
পুবেই কেন সূর্য ওঠে
গাড়ি কেন সামনে ছোটে
দাদুর কেন আহ্নিকেতেই ঝোঁক?

এসব ভেবে মনে
তার দুঃখু ক্ষণে ক্ষণে
শুধোয় জনে জনে
পৃথিবীটা যেমন আছে
তেমন কেন হয়
জল বয়ে যায় ঢালুর দিকে
সকাল হতেই আকাশ ফিকে
কিছুই কেন অন্যরকম নয়?

ছবিঃ সোমা

ষষ্ঠী

অমিতাভ প্রামাণিক

খেলা- অজুহাতে হাতি লোফালুফি? সেটা তো ভীষণ বোরিং
ষষ্ঠী তাই আজ হাঙর নাচায়, যেন তা গঙ্গাফড়িং!
সিঙ্গিমামার কেশরটি ধরে বুলিয়ে শেভিং ব্রাশটা
হাজামত করে, কুমিরের ভাঙা দাঁতে সে লাগায় প্লাস্টার।
পিঠের মধ্যে যে জায়গাটায় চুলকানি ওঠে প্রবল,
হাত পৌঁছায় না বলে সেখানে সে খায় সাপের ছোবল।
সুয়েজ ক্যানালে চ্যাঁচাচ্ছিল যা একটা তিমিঙ্গিলে,
ষষ্ঠীচরণ সজ্ঞানে তার বদলিয়ে দিল পিলে।
তার দুধকলা খেয়ে নিয়েছিল র‍্যাট্‌ল্ স্নেক না কোবরা –
ষষ্ঠী সেটাকে এক চড় মেরে বানিয়ে ফেলল ছোবড়া।
বাঘের হালুম- এ ভয় পেয়ে এক বাচ্চা হারালো তার দুল,
দশটি মিনিট নিলডাউন হয়ে রক্ষা পেল সে শার্দূল।
একবার সে কী ঘোর মারামারি কিংকং- গডজিলাতে –
ষষ্ঠী দুটোকে দু বগলে চেপে লাগল পাঁচন গিলাতে।
রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টটায় হিসি করেছিল কুকুরে,
ষষ্ঠী সেটার কান ধরে টেনে চুবিয়ে রাখল পুকুরে।
খাওয়া নিয়ে লাদেনের গড়িমসি, ষষ্ঠী বল, ওসামা –
সব খেয়ে নিবি।ওসু বলে মাকে,দুটো কমিয়ে দে ধোসা, মা।
এক গোদা হাতি মার্কেটে ঢুকে ধ্বংস করল আড়ত;
সেটাকে বসিয়ে খাতা- পেন দিয়ে বলে, লেখ মহাভারত।
একে টীজ করা? রজনীকান্তকে চাবকাতো ধরে পারলে –
যেই সে শুনলো বিয়ের জন্যে মা খোঁজ করছে গার্লের,
ষষ্ঠীর সে কী ভয়, দুইবেলা বলে, কী করেছি দোষটি?
ক'দিন আগেই বিয়ে হয়ে গেল, আজকে জামাই ষষ্ঠী!

ছবিঃ সৌভিক

চড়ুই

পবিত্র মন্ডল

উড়ুক্কু ডানার ছটফট
বারান্দার আলিসায় যোগ হল একঝাঁক,
দামাল চড়ুই
এক দল মুক্তি বেবাক -
কবে যেন জুড়ে গেল
সহজ সড়াক।
উচ্ছ্বাসে উষ্ণতায় উপ্ত থাক
ডুবন্ত ঠোঁটে আদর অবাক,
হঠাৎ উড়ে যাওয়া
আবার উড়ে আসায় নেই রাখ-ঢাক -
খুঁটে নেওয়া দানা দুই-এক।
ত্রস্ত ওড়া আবার
সারা সকাল সারা বেলা
উচাটন মন নেয় বাঁক
আলোয় আলিসায় ভালবাসায় ভরে যাক
উড়ুক্কু ডানার ছটফট
দামাল চড়ুই একঝাঁক

রূপকথার কন্যে

ইন্দ্রাণী সরকার

রূপকথার এক অচিন দেশে
এক যে ছিল কন্যা
নীলসায়রে ডুব দিয়ে সে
আনতো রূপের বন্যা
নীল তারাদের বন্ধু সে যে
নীল চাঁদনী মেয়ে,
নীল পাখিদের রং মাখানো
সবাই থাকে চেয়ে
নীল ঘাগরি পরণে তার
চুলে নীলের জরি
কন্যে আমার বড়ই মধুর
আহা মরি মরি

ছবিঃসংঘমিত্রা

চিলাপাতায় ফিস্টি

মধুমিতা ভট্টাচার্য্য

চিলাপাতার জঙ্গলেতে হচ্ছে দারুণ ফিস্টি,
পোস্ত বড়া, গোস্ত- মাটন মস্ত খাওয়ার লিস্টি।
বিরিয়ানি আর কোর্মা হবে, রায়তা আছে সঙ্গী,
কড়াই জুড়ে উথালপাথাল সবজি পঞ্চ- রঙ্গী,
মালাই- পনির শাহি মেজাজ, খুশবু ম' ম' চারদিক
জায়ফল, দারচিনি, এলাচ মশলাপাতি ঠিক ঠিক।
তিস্তা থেকে ভিস্তি ভরে টাটকা জলের চালান
আসলো, এবার রান্না হবে ভেটকি মাছের সালান,
দই পটলের দোর্মা হবে চিংড়ি মালাই- কারি

পোলাও হবে গাওয়া ঘিয়ের, মিঠাই রকমারী।
হঠাত সে এক শব্দ ভীষণ, রান্না যখন সাঙ্গ
হুড়মুড়িয়ে এলেন বাঘু জুটিয়ে সাঙ্গ- পাঙ্গ,
আগুন রাগে গনগনিয়ে বাইসনেরা যত্ত,
ফুঁসছে রোষে শুঁড় বাঁকিয়ে হাতিরা উন্মত্ত!
বাইসন আর হাতির সাথে করতে হল রফা
খাওয়ায় ওদের ভাগ না দিলে করবে দফা- রফা।
রাস্তা জুড়ে পাত পড়েছে সবাই যখন ব্যস্ত
গন্ডার এক বললে এসে, “করব হেস্ত নেস্ত!
বাঘ, হাতি আর বাইসনেরাও শুনছি নাকি খাবে!
আমার ভাগের ভোজটা বুঝি মাঠেই মারা যাবে?
গুঁতিয়ে তোদের করব বেহাল, ভাঙব ভাতের হাঁড়ি,
শিং বাগিয়ে করব তাড়া উলটে দেব গাড়ি”।
বললে সবাই, " রোসো রোসো, বসো না এইখানে,
মিলেমিশেই ফিস্টি হবে, গুস্‌সার কি মানে"?
তখন হল জঙ্গলেতে আজবরকম ভোজ,
হাতি বলে ‘আহা এমন হয়না কেন রোজ’?
বাঘ বাবাজি ‘হালুম’ বলে ঢেঁকুর তোলেন জবর,
বলেন হেসে, ‘কালকে হবে এটাই ব্রেকিং খবর”।
গন্ডার আর বাইসনেরাও দেদার খুশি- মন,
ফিস্টি শেষে চুপটি আবার চিলাপাতার বন।

ছবিঃ অন্তরা

কুলপিওয়ালা

প্রকল্প ভট্টাচার্য

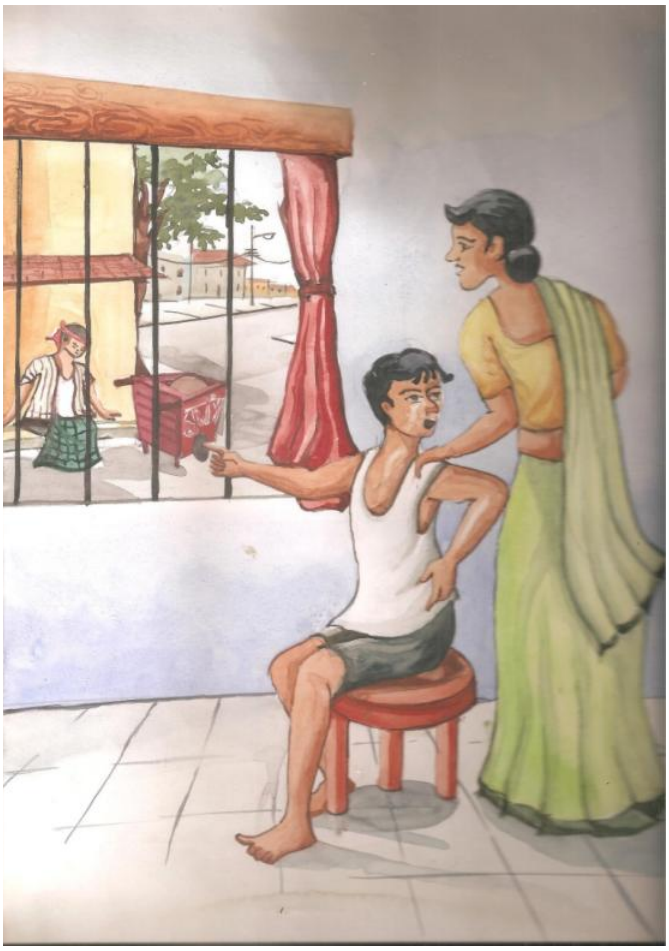

উফ কী গরম! দুপুরবেলা জানলা দিয়ে দেখি,
জুলপিওলা কুলপিওলা ঠেলছে গাড়ি। একি!
দিব্যি কেমন একটা কাঠি নিজেই মুখে পুরে
আরাম করে চোখ বুজিয়ে যাচ্ছে হেঁটে দূরে!!
ভাল্লাগেনা। কুলপিওলা নিজেই কেন তার
কুলপি খাবে! ঐগুলো তো আমার ও দাদার!
'ও মা দ্যাখো! কুলপিওলা লোকটা কেমন পাজি,
রোজই বোধহয় সব খেয়ে নেয়,দেখতে পেলাম
আজই!
বিকেলবেলা পার্কে গেলে বলবে যা, সব শেষ!
নালিশ শুনে মুচকি হেসে মা জানালো, বেশ।
আমি যখন রান্না করি পোলাউ বা চাউমিন,
তোমরা খেও, আমি বরং উপোস দিই সেদিন?
ও মা, সেকি, তুমি কেন খাবে না খাবার!
তাহলে কী দোষ হল ঐ কুলপিওলাটার?
সেও তো মানুষ! এই গরমে বেড়াচ্ছে রাস্তায়,
ভেবেছ কি, তারও কতো তেষ্টা, খিদে পায়!
নিজেই খেটে কুলপি বানায়, তোমরা খাবে বলে,
প্রাণ জুড়োবে, এবং পাবে আনন্দ সক্কলে!
নাহয় নিজেও একটা খেল? কী এসে যায় তাতে?'
শুনে আমার নজর গেল আবার সে রাস্তাতে।
দূরের একটা বাড়ির নিচে একটু ছায়া পেয়ে
কুলপিওলা ক্লান্ত, বোধহয় পড়েছে ঘুমিয়ে।
আমার তখন মায়াই হলো। সত্যি তো, বেচারা,
বাড়ির ভিতর বসেই আমি ঘেমে নেয়ে সারা,
আর ও এখন ঠেলবে গাড়ি 'কুলপি খাবে ভাই'
মনে মনে জুলপিওলার কাছেই ক্ষমা চাই!!

ছবিঃ অরিঘ্ন

বাবার মত

শংখ করভৌমিক

যখন আমি তোমার মত ছোট,
ভেবেছিলাম একটু বড় হলে
খেলনাগুলো ফেলব কিনে সবই
পকেটভরা পয়সাকড়ি পেলে।
আমার বাবা, তোমার যিনি দাদু
ভেবেছিলেন অনেকদিন পরে
ছেলেটি তাঁর অনেক বড় হবে -
বয়েসে নয়, অন্য কোনো জোরে।
তাই তো তিনি নিজেই হাত ধরে
শিখিয়েছেন রাস্তা দিয়ে চলা।
সাঁতার কাটা, সাইকেলেও চড়া,
সময়মতো উচিত কথা বলা।
এখন থেকে অনেকদিন আগে
বাবারা হত বাঘের মত কড়া।
তবুও আমি ঠিক তোমারই মত
বাবার মুখে শুনেছি কত ছড়া।

আজকে দেখি সত্যি বড় হয়ে
এখন আছে পকেটটাতে টাকা।
খেলনা কেনা হয়নি তবু আজও,
বাবার কাছে হয়নি কথা রাখা।
আমার সাথে করলে তুমি আড়ি
ভাবটি করা হয় না খুব সোজা।
বাবার মতো বড় হওয়ার হ্যাপা
ঠেলায় পড়ে তখন যায় বোঝা।
আসলে বুঝি সব ছোটরা ভাবে
বড়ই সোজা বাবার মত হওয়া।
সত্যি বড় হলেই যায় বোঝা
কঠিন কাজতেমন বোঝা বওয়া। -
তাই তো বলি খেলার মাঠে হেরে
হতাশ হয়ে পালিয়ে যেও নাকো।
তবেই হবে বাবার চেয়ে বড়ো।
বরং তুমি নিজের মত থাকো।

ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা

মাছাল

তরুণকুমার সরখেল

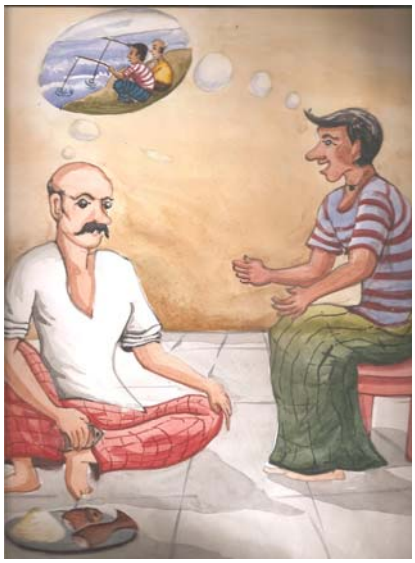

পায়ের ওপর পা- টি রেখে তরণীদাস খুড়ো
আয়েস করে থালা ভরে খাচ্ছে মাছের মুড়ো
এমন সময় ঘরে ঢুকে ওপার গাঁয়ের আলী
বলল ওরে তরণীদাস যাবি না বকখালি?
খুড়ো বলে মাছের লোভে সব গিয়েছি ভুলে
এই কে আছিস আলীভাইকে বসতে দে না টুলে
দুজনে আজ বকখালিতে ধরব মাছের পোনা
যে যাই বলুক কারো বারণ আজকে তো মানবো না।

ছবিঃ অরিঘ্ন

অনির্বাণ

তোফায়েল তফাজ্জল

যে আমাকে বাঁ -হাত দেখায়
চুপটি হাঁটে পুকুর পাড়ে,
পাখি দেখতে নেয় না সাথে
বললে বরং আছাড় মারে ।
ফুল কুড়িয়ে আনে একা
সূর্যি সোনা জাগতে বাকি,
বুলবুলিকে জাম দিতে কয়
পড়ার ঘন্টা দিয়ে ফাঁকি!

তুমিই বলো, সে কখনো
হতে পারে আমার সাথী
ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিতে
অনির্বাণ এক জ্ঞানের বাতি?

ছবিঃ অন্তরা

এবারের ধাঁধা তিনটে পাঠিয়েছেন

শ্রী জয় মুস্তাফী

পল্টুদাকে মনে আছে তো? নেই? থাকবেই বা কেন? তাকে নিয়ে তো এর আগে কেউ লেখেনি! তবে সে এখন মস্তবড় মানুষ। কিন্তু তার মেজোবেলার কথা অনেকেই জানে না... মনেও রাখেনা। এদিকে পল্টুদাও অনেক কিছু মনে রাখতে পারেনা। ইতিহাসে ফেল করত তার স্মৃতিশক্তি কম বলে! নিজের মনের মত ইতিহাস পরীক্ষা দিত সে। যা খুশি তাই লিখত। কিন্তু পল্টুদা ছিল অঙ্কে তুখোর, তাই অঙ্কের জোরে জীবনের অনেক ধাঁধার সমাধান নিজেই করতে পারতো। অনেকবার অনুরোধ করায়, তিনটে ধাঁধা পল্টুদা আমাকে কষ্টেসৃষ্টে মনে করে শোনালো -

প্রথম ধাঁধাঃ

পল্টুদা যাচ্ছিল ছোটমামার বাড়ি, ভালই দূর... কিন্তু বাসের নম্বর ভুলে যাবার ভয়ে হেঁটেই যাচ্ছিল। অনেকটা পথ হাঁটার পর সে দেখল সামনের রাস্তাটা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো বিচ্ছু ছেলে। পথ ভুলে যাওয়া পল্টুদা ওদের ঠিকানা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাওয়ায় ওরা বলল - ওদের মধ্যে একজন সব সময় সত্যি কথা বলে, আরেকজন সব সময় মিথ্যে! আর শুধু মাত্র একটাই প্রশ্ন ওদের মধ্যে যে কোনো একজনকে বেছে নিয়ে করা যাবে। যাই হোক, পল্টুদা বুদ্ধি খাটিয়ে তাই করলো। আর তারপেরই মামারবাড়ি পৌছে কব্জি ডুবিয়ে কষা মাংস আর গরম ভাত! এখন বলতো পল্টুদা কী প্রশ্ন করেছিল?

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ

দুর্গম রাস্তার একদিকে খাদ তো অন্যদিকে পাহাড়। আর সাপের মত পেঁচানো রাস্তা দিয়ে চলেছে বাস - যাত্রী বলতে জনা কুড়ি তার মধ্যে একজন আমাদের পল্টুদা। মাঝরাত। চারদিক জনমানবশূন্য... সব মিলিয়ে একটা গা- ছমছমে ব্যাপার! হঠাৎ পল্টুদা বাস থামাতে বলল। যেই কথা সেই কাজ। পল্টুদা এবার নেমে কিছুটা হেঁটে গেল। এমনসময় একটা বড় পাথরের চাঁই এসে পড়ল বাসের মাথায়। বাসও গড়িয়ে খাদে... পল্টুদা বেঁচে গেলেও বাকিদের নির্ঘাত মৃত্যু... তবুও পল্টুদা আফশোষ করে বলল "ইশ! আমি কেন ওই বাসে থাকলুম না"। প্রশ্ন হল বেঁচে গিয়েও কেন এমন ভাবলো পল্টুদা?

তৃতীয় ধাঁধাঃ

নয়ছয় করতে পল্টুদা মোটেই ভালোবাসতো না... সে ছিল বেশ হিসেবী। কিন্তু অঙ্কে নয়ছয়? মানে, পাশের রোমান নয়কে কেবল একটা রেখা টেনে ছয় করতে পারবে? পল্টুদা এক মিনিটে পেরেছিল। তোমাদের কত সময় লাগলো জানিও কিন্তু।

শব্দখেলা

ইঁট, কাঠ, লোহা, মাটি, আগুন,এদের মধ্যে কোনটা দিয়ে নিচের কোনটাকে বানানো যায়? যা বানাবে তা জ্যান্ত হতে হবে কিন্তু।

দুটো ফুল, একটা জ্বালানি, একটা প্রাণী।

ড্রুডল

বল তো এটা কীসের ছবি?

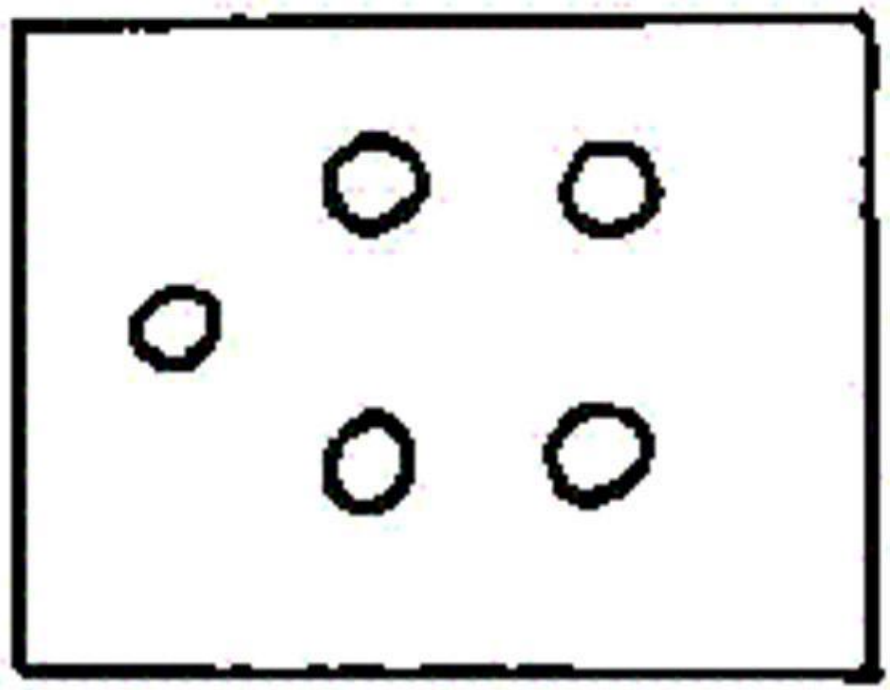

কুইজ

১। ফাদার অব অ্যাটমিক বম্ব কাকে বলা হয়?

২। বাতাসের চেয়ে ভারী প্রথম মানুষবিহীন উড়োযান কোন সালে উড়েছিল?

৩। ২ নং প্রশ্নের যানটি তৈরি করেছিলেন কে?

৪। ২ নং প্রশ্নের যানটির নাম কী ছিল?

৫। রাইট ভাইদের তৈরি বাতাসের চেয়ে ভারী উড়োযানকে কেন প্রথম উড়ানের স্বীকৃতি দেয়া হয়?

৬। ওর্নিথপটার কী?

৭। প্রথম সফল ওর্নিথপটার কে তৈরি করেন?

৮। ওটো লিলিয়েনথাল কেন বিখ্যাত?

৯। ঘুড়ন্ত রোটর দিয়ে উড়ান প্রথম কোন দেশে, কবে আবিষ্কৃত হয়?

১০। ঝুকিংটিং বা তাকেতম্বো কাকে বলে?

জানো কি?

১।প্রথম ডুবোযান তৈরি করেন কর্নেলিয়াস ড্রেবেল নামের এক ওলন্দাজ। ১৬২০ সালে। জলের তলায় দাঁড় বেয়ে চালানো হত সেটিকে।

২। ১৭৪৭ সালে নাথানিয়েল সাইমনস প্রথম ব্যালাস্ট পদ্ধতিতে ডুবোযানের ভাসাডোবার পদ্ধতির পেটেন্ট নেন। কয়েকটা চামড়ার থলেতে দরকার মত জল ভরে ভারী করে ডুব দিত তাঁর ডুবোযান। জল বের করে হাওয়া ভরে দিলেই সে ভেসে উঠত আবার।

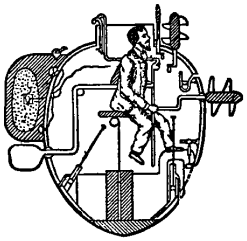

৩। প্রথম মিলিটারি সাবমেরিন তৈরি হয় ১৭৭৫ সালে। আমেরিকায় তার নাম টার্টল। বানিয়েছিলেন ডেভিড বুশনেল। চলত চালকের পেশির জোরে।

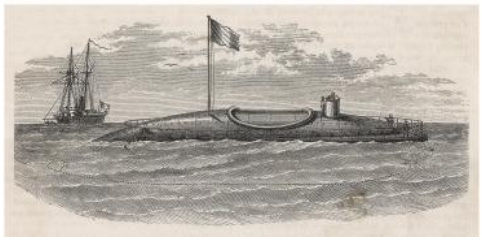

৪। প্রথম যান্ত্রিক শক্তিতে চালিত সাবমেরিন হল ফরাসিদের তৈরি প্লঁজার (১৮৬৩)। চলত কমপ্রেসড হাওয়ার ধাক্কায়।

৫। প্রথম ইঞ্জিনচালিত সাবমেরিন হল ইকটিনিও - ২ (১৮৬৭)। তৈরি হয়েছিল স্পেনে। ১৪ মিটার লম্বা। দুই যাত্রীর যান। জলের তিরিশ মিটার নিচ দিয়ে দু ঘন্টা চলতে পারত।

৬। প্রথম স্বয়ংচলিত (কম্প্রেসড এয়ার চালিত) টর্পেডো তৈরি করেন ইংরেজ বিজ্ঞানি হোয়াইটহেড। ১৮৬৬ সালে।

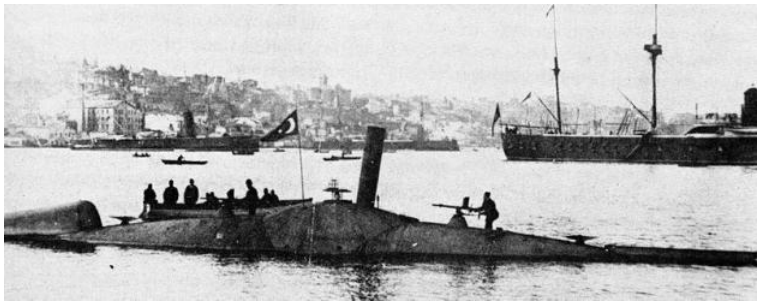

৭। প্রথম বাষ্পচালিত টর্পেডোযুক্ত সাবমেরিন তৈরি হয় ১৮৮৫ সালে। তার নাম নর্ডেনফেল্ট- ১। এটি জলে ভেসে থাকবার সময় বাষ্পীয় ইঞ্জিনে চলত আর তার সাহায্যে প্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করে নিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে জলে ডুব দিয়ে সেই চাপ কাজে লাগিয়ে সামনে

এগোত। এর দ্বিতীয় প্রজন্মের যান নর্ডেনফেল্ট- ২ কিনে নেয় গ্রিস। এই যানটিই যুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম সাবমেরিন থেকে টর্পেডো ছোঁড়বার কৃতিত্বের অধিকারী।

৮। ৪৫ খানা শক্তিশালী ব্যাটারি সজ্জিত প্রথম বৈদ্যুতিক সাবমেরিন তৈরি করেন বৃটিশ উদ্ভাবক ওয়াডিংটন। তার নাম পরপয়েজ। ১৮৭০ সাল নাগাদ।

৯।জন ফিলিপ হল্যান্ড ব্যবহারযোগ্য ডিজেল ও ব্যাটারিচালিত প্রথম হল্যান্ড টাইপ সিক্স মিলিটারি সাবমেরিন তৈরি করেন ১৮৯৬ সালে। সেই প্রথম নিয়মিত মিলিটারিতে ব্যবহৃত সাবমেরিন।

১০। ১৯৫৪ সালের ২১শে জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন ইউ এস এস নটিলাস জলে ভাসল। নটিলাস ১৯৮০ সাল অবধি কাজ করেছে। উপস্থিত কানেক্টিকাটের গ্রোটনের এক মিউজিয়ামে তার স্থান হয়েছে। বছরে প্রায় আড়াই লাখ দর্শক তাকে দেখতে সেখানে আসেন।

বলো তো এটা কীসের ফটো?

অবিশ্বাস্য

হংকং- এর প্রধান এয়ারপোর্ট কাই টাক ঘনবসতি এলাকায় থাকায় এইভাবেই বড় বড় এরোপ্লেন অঠানামা করতে বাধ্য হত সেখানে। ১৯৮৮ সালে এই এয়ারপোর্টটা শেষমেষ বন্ধ করে দিতে হয় সে দেশের সরকারকে।

আশ্চর্য উল্কি

অ্যামিবা অ্যামিবা খেলবে? ছোট পোকাদের ধরে খাও আর শক্তি বাড়াও আর বড় পোকাদের থেকে দূর হটো।

কিংবা হাঁস হাঁস খেলাও যায় ইচ্ছে করলে। একটা হাঁস হয়ে গুণে গুণে কয়েন জোগাড় করো আর হয়ে যাও এক শক্তিমান পাওয়ার ডাক। এমন হাজারো মজার মজার দারুণ সব খেলা নিয়ে হাজির হয়েছে এই সাইটটা। এইখানেঃ→ http://www.coolmath-games.com/

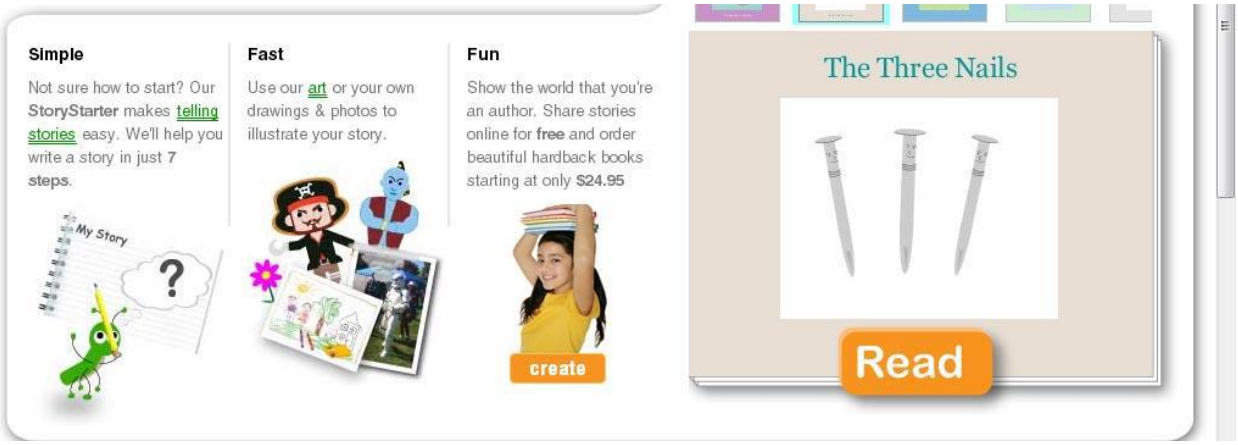

গল্প লিখবে নাকি? কেমন করে লিখবে বুঝতে পারছো না? এই লিংকে একবার ক্লিক করে দেখো তাহলে। কেমন সুন্দর করে ভারী সহজে গল্প লেখা শিখিয়ে দেবেন তোমাদের ওখানে সবাই মিলে। শিখেটিখেনিয়ে তারপর যখন ভালো ভালো সব গল্প লিখবে তখন সে সব জয়ঢাককে পাঠিয়ে দিও কিন্তুঃ http://www.storyjumper.com/

গত সংখ্যার উত্তরঃ

ধাঁধার উত্তরঃ

১। তরমুজ ২। মাথার ওপর একটা জলের গেলাস ধরে দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল, ৩। বন্ধুটি অন্ধ। ব্রেইলে বই পড়ছিল। ৪। টেপটা রিওয়াইন্ড করল কে?

শব্দখেলার উত্তর

১। সুন্দ [(~~থাকব~~)/ রব] নে ২। ঈশ্বরসাধনা হয় ~~ক,খ,গ,ঘ~~ / অক্ষরধামে ৩। তাহারা আমাকে কতই না ~~পত্নী/~~ বিবিধ ~~জহর~~/ বিষয়ে প্রশ্ন করিল। ৪। আকাশে তারার ~~১,২,৩,৪~~/সংখ্যা কত তা কে বলিতে পারে? ৫। জ~~প~~াহাড়/নগণের ইচ্ছাই সর্বপ্রধান।

কুইজের উত্তর

১। শতকরা ২০ ভাগ ২। মস্তিষ্কের একটি নিরাপত্তা আবরণ ৩। গ্রে ম্যাটার ৪। ফোরামেন ম্যাগনাম। এটা হল খুলির মেঝের একটা ফুটো যেখান দিয়ে মস্তিষ্ক আর স্পাইনাল কর্ড যুক্ত হয়। ৫। লেফট ফ্রন্টাল লোব (সামনের বাঁদিকের অংশটা) ৬।ওয়েরনিকস্ এরিয়া ৭। লেখা। (এই অংশটা চোট পেলে আকার চেনা, সাজগোজ করা, অংক কষা এই সব কাজ বিঘ্নিত হয়। ৮। মেডুলা অবলাঙ্গাটা বা সুষুম্নাশীর্ষক। ৯। ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু। বারোটা ক্রেনিয়াল নার্ভের মধ্যে পঞ্চম এই স্নায়ু চোখ, মুখ, চোয়াল, জিভ এদের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। ১০। তিমি।

কীসের ফটো

চায়ের কাপের গায়ে ছোট্ট স্টেপলার

ড্রুডল

মমিদের পেরিস্কোপ

"বাবা, কাল রাত্রের আলোটা আবার-- " জিষ্ণু ফিসফিস করে ডাকছিল।

"দেখেছি। প্লাস্টিকের থেকে মাথা বের কোরো না জিষ্ণু।" তীব্র একটা আলোর রেখা একটা তীক্ষ্ণ ছুরির মতন আকাশ থেকে নেমে গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। ডালে ঝুলন্ত তড়িৎপ্রতিরোধী প্লাস্টিকের থলেদুটিকেও ছুঁয়ে দেখল একসময় তা। তারপর এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

"প্লাস্টিকের বাইরে শরীরের কোন অংশ বের হয়ে ছিল না তো তোমার জিষ্ণু?" খানিক বাদে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন প্রফেসর বোস।

"উঁহু। আইপিসের মধ্যে দিয়ে দেখেছি।"

"ভালো। বায়ো স্ক্যান করছিল এরা। মোমমাখানো প্লাস্টিকের আবরণের মধ্যে থেকে আমাদের জৈব- বৈদ্যুতিক সংকেত ধরতে পারবে না।"

"ধরতে পারলেই বা কী হত? জঙ্গলে তো অনেক জীবজন্তু আছে। স্ক্যানারে আমাদের আলাদা করে বুঝতে পারত নাকি?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রফেসর বোস বললেন, "পারত। অনুমান করো তো কেমন করে?"

"মানুষের শরীরের জৈব বৈদ্যুতিক সংকেত অন্যদের চেয়ে আলাদা বলে?"

"শরীরের নয়, মস্তিষ্কের। শারীরিক জৈব বৈদ্যুতিক তরঙ্গে মানুষ আর পশুর তফাৎটা সুক্ষ। তাকে ধরবার ক্ষমতা এখনো কোন স্ক্যানারের হয় নি। কিন্তু ওরা আমাদের মস্তিষ্কতরঙ্গ টের পেত জিষ্ণু। মানুষের মস্তিষ্ক থেকে ক্রমাগত যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বের হয়ে চলে তার বৈশিষ্ট্য আর সব জীবের চেয়ে একেবারে আলাদা।"

আলোটা আবার বহুদূর থেকে এঁকে বেঁকে ফিরে আসছিল। কথা বন্ধ করল মানুষদুটি। জঙ্গলে নৈঃশব্দ নেমে এসেছে ফের। মাথার ওপর যানটি এইবার অনেকটা নিচুতে নেমে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক কোন উড়ুক্কু রাক্ষসের মত ধীরে ধীরে উড়ে চলেছে গাছগুলোর একেবারে মাথার কাছ ঘেঁষে তার শিকারের খোঁজে।

তার যন্ত্র চোখে অবশ্য কোন মানুষের চিহ্ন ধরা পড়ল না। এইখানে অরণ্য একেবারে আদিম। মানুষের পা পড়েনি এখনো সম্ভবত এই অঞ্চলটিতে। কয়েক বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে শয়ে শয়ে অতিকায় মৌচাক ঝুলে আছে গাছগুলো থেকে। তাদের মধ্যে মিশে থাকা দুটো ঝুলন্ত মোমজড়ানো প্লাস্টিকের থলেকে মানুষবাহী হ্যামক বলে চিনতে পারার সাধ্য ছিল না যানের স্ক্যানারের।

বেশ কয়েকঘন্টা গোটা এলাকাটার ওপর ঘুরে ঘুরে তারপর ভোররাতের দিকে হঠাৎ গতি বাড়িয়ে তীরবেগে যানটা ছুটে গেল পেছন দিকে। খানিক বাদে বহু দূর থেকে আগুনের আকাশছোঁয়া আলো জেগে উঠল। আর প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই সেই অগ্নিকুন্ডের থেকে একটা আগুনের শিখা তীরের মত সটান ওপরের দিকে উঠে অন্ধকার আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

প্রফেসর সাবধানে থলের মুখের বাঁধন খুলে মুখ বাড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়েছিলেন। এইবার মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "বাইরে বের হতে পারো জিষ্ণু। গত দু রাত ধরে যে ভয়টা পেয়ে এইভাবে লুকিয়ে থাকতে হল সে ভয় এবারে কেটে গেছে।"

পুবদিকের আকাশ ফরসা হয়ে আসছিল। গাছ থেকে নিচে নেমে এসে প্লাস্টিকের হ্যামকদুটোকে গুটিয়ে রেখে একটা বড়োসড়ো ঝোপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর বোস। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছুরির ছোট্ট একটা টান দিতে লতাপাতায় বোনা ঢাকনাটা খুলে পড়ল মাটিতে। ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠেলাগাড়িটাকে বের করে আনতে আনতে প্রফেসর বোস বললেন, "আর সময় নষ্ট নয়। সকালের খাওয়া সেরে নটার মধ্যে রওনা হয়ে গেলে আজ সূর্যাস্তের আগেই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবো আমরা।"

"কিন্তু বাবা, ওরা যদি আবার—"

"সে ভয় নেই জিষ্ণু। যানটা পার্থিব নয়। এইজাতের পুরোনো মডেলের জি শ্রেণীর প্রমোদতরণী বহুকাল হল এ গ্রহ থেকে বাতিল হয়ে গেছে। মঙ্গল উপনিবেশে এখনো এর ব্যবহার হয়। ওখান থেকেই এসেছে এটা। মঙ্গলের কোন প্রমোদযানকে দু দিনের বেশি ভিসা দেয়া হয় না জিষ্ণু। যানটা কাল থেকে এইখানে ঘোরাঘুরি করছে। তার মানে আজকের পরে তার আর এখানে থাকবার উপায় নেই। আমাদের পুলিশ এ ব্যাপারে কড়াভাবে নিয়ম মেনে চলে। এখন তৈরি হয়ে নাও। আমি দেখছি কিছু তাজা খাবারের বন্দোবস্ত করা যায় কিনা।"

খানিক বাদে কাছের একটা জলধারা থেকে হাত মুখ ধুয়ে জিষ্ণু ফিরে এল। প্রফেসর বোস একটা ছোট জীবের ছাল ছাড়াচ্ছিলেন হাতের ছুরিটা দিয়ে। জিষ্ণু একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল "বাবা, এটা—"

"এই প্রাণীটাকে বলে গোধিকা। এর মাংস খুব সুস্বাদু হয়। আমাদের আজকের খাবার।"

"খাবার? আমরা এটাকে—"

"খাবো জিষ্ণু। কৃত্রিম প্রোটিন সংশ্লেষণ খুব বেশিদিনের পুরোনো নয়। মাত্রই পঞ্চাশ ষাট বছর হল আমরা প্রাকৃতিক মাংস খাওয়া ছেড়েছি। তার আগে—ওকী? কোথায় যাচ্ছো তুমি?"

জিষ্ণু ততক্ষণে এক ছুটে খানিক দূরে গিয়ে উপুড় হয়ে বসে পড়েছে অন্যদিকে মুখ করে।

হাতের ছুরিটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর বোস। তার পিঠে হাত রেখে নরম গলায় ডাকলেন, "জিষ্ণু! উঠে এস। এই জঙ্গলে আমাদের সামনে এখন অনেক লড়াই পড়ে আছে। এ লড়াইয়ের শেষ অংকের অভিনয় হবে আজ থেকে পনেরো বছর পরে। আমি তখন বেঁচে থাকব কিনা জানি না। তোমাকে অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে যে। হয়ত এই পরিচিত পৃথিবীটাকে বাঁচাবার ভার থাকবে তোমার ওপরেই। তোমাকে খুব শক্তপোক্ত মানুষ হয়ে উঠতে হবে। এইখানে প্রকৃতি যতটুকু দেবে তাই নিয়ে বহুদিন বেঁচে থাকতে হবে আমাদের। ওঠো।"

প্রফেসর বোসের গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল জিষ্ণু। তার দশ বছরের মুখটাতে অনেক বিচিত্র আলোছায়া খেলে যাচ্ছিল। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বাবার হাত ধরল সে। বলল, "চলো। আর আমি কখনো এমন করব না।"

***

জ্বলন্ত আগুন থেকে একে একে বাঁশের চোঙগুলো বের করে এনে ছুরি দিয়ে কেটে তাদের ভেতর থেকে ধোঁয়া ওঠা মাংসের খন্ডগুলো বের করে আনছিলেন প্রফেসর বোস। একটা টুকরো হাতে তুলে নিয়ে একটু অস্বস্তিভরা চোখে দেখল জিষ্ণু। তারপর একরকম জোর করেই সেটাকে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েই চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার।

"ভালো লাগছে?"

মুখ ভরা খাবার নিয়ে ঘাড় নাড়ল জিষ্ণু। দশ বছরের জীবনে এই প্রথম প্রাকৃতিক মাংসের স্বাদ পেয়েছে সে। যন্ত্রের সংশ্লেষিত কৃত্রিম প্রোটিনখন্ডে অভ্যস্ত জিভে বড় ভালো লাগছিল সেই স্বাদ।

"তোমার মা- ও খুব ভালোবাসতেন আসল মাংস বা প্রাকৃতিক ভাত খেতে।"

কথাটা শুনে হঠাৎ মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল জিষ্ণুর। মাকে সে কখনো দেখেনি। তার মা মহাকাশবিজ্ঞানী ছিলেন। তার জন্মের এক বছর পর একটা মহাকাশফেরি দুর্ঘটনায় ইউরোপার আকাশে হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই সে বাবার সঙ্গে চাঁদের গবেষণাগারে এতটা বড় হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো পৃথিবীতে এলে কলকাতা বা দিল্লি বা ন্যু

ইয়র্কের মত শহরেই কয়েকদিন ঘোরাফেরা করে ফিরে গেছে সে। সেইসব শহরের বাইরে পৃথিবীটা যে এত বড় আর এত অদ্ভুত হতে পারে সে নিয়ে কোন ধারণাই ছিল না তার এতদিন।

***

গভীর মহাকাশের অন্ধকার রাজত্ব পেরিয়ে যানটা ছুটছিলো। পৃথিবীর আকর্ষণক্ষেত্র পার হয়ে নিশ্চল মহাকাশ সাঁতরে তীব্রগতিতে তা এগিয়ে চলেছে মঙ্গলের ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে থাকা গোলকটার দিকে।

"এবারও ফাঁকি দিল আমাদের শয়তানটা।"হাত মুঠো করে আপনমনেই বিড়বিড় করছিলেন লালপিওতে।

যানের কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে থেকে একটা নিচু ব্যাঙ্গভরা গলা ভেসে এল, "আমরা কি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম অ্যাডমিরাল?"

"কী বলতে চাইছ তুমি সৈয়দ?"

"বলতে চাইছি, একটা নিশ্চিত রাস্তা ছিল একে নিকেশ করবার। আমরা সেটা নিজেদের দোষেই হাতছাড়া করলাম না কি?"

"কোন রাস্তার কথা বলছ তুমি?"

সৈয়দ আব্রাহাম ঘুরে বসে ঠান্ডা চোখে তাকালেন অ্যাডমিরাল লালপিওতের দিকে। তারপর বললেন, "লোকটা পায়ে হেঁটে ছাড়া অন্য কোন যানবাহনে পালায় নি সেটা তো নিশ্চিত জানতাম আমরা। যেখানে ওর যানটা ভেঙে পড়েছে সেখানে ছড়িয়ে থাকা কাঠকুটোর টুকরোগুলো, আর যানটার দুটো চাকার একটাও না থাকা—এ থেকেই তো বোঝা যাচ্ছিল ও একটা হাতে টানা প্রাচীন যান তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে গেছে। তার মানে ও জায়গাটার বিশপঁচিশ মাইলের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে ছিল ও। একটা কোন একটা নিচু শক্তির আণবিক বোমা জায়গাটায় বিস্ফোরণ করালে অন্তত চল্লিশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত জীবিত প্রাণী তাতে ঝলসে মারা যেত। কিন্তু আমি বারংবার বলা সত্ত্বেও আপনি সে সিদ্ধান্তটা নিতে ভয় পেলেন।"

লালপিওতের হাতের আঙুলগুলো কোমরে আটকানো আগ্নেয়াস্ত্রটার ওপরে চেপে বসছিল। ঠান্ডা গলায় কেটে কেটে বললেন, "আমি—ভয় পেয়েছি? মূর্খ, ওখানে ওই বিস্ফোরণ ঘটালে আমরা কেউ ছাড়া পেতাম? পৃথিবীর জেলখানায় থাকবার শখ তোমার আজও মেটেনি সৈয়দ, তাই না?"

হঠাৎ ছোট একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল সৈয়দ। মুখটায় তার একটা অদ্ভূত হাসি ছড়িয়ে গেছে। নিচু গলায় বলল, "জেলখানায় আটকালে সেখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করতে আমার বেশি সময় লাগত না অ্যাডমিরাল। কিন্তু আপনি ভয় পেয়ে গেলেন। পৃথিবীর জেলখানা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এতবড় একটা সুযোগ-- "

কথাটা শেষ করা হল না সৈয়দ আব্রাহামের। তার আগেই অ্যাডমিরালের হাতে উঠে আসা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে শক্তির একটা নীলাভ ঝলক ছুটে এল তাঁর দিকে।

যানের দুর্ঘটনাকালীন বায়ুপরিশোধক যন্ত্রগুলো পোড়া গন্ধমাখা ধোঁয়ার কুন্ডলিটাকে দ্রুত বাইরের শূন্যতার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। একটা নীলাভ ধোঁয়ার গোলক হয়ে সেটা তখনো যানটার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে। সেইদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফের শান্ত গলায় লালপিওতে বললেন, "মঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ কর। আমি গ্রোভারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখুনি—"

***

গুম গুম শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই শোনা যাচ্ছিল। নিচু একটা টিলার জঙ্গলঘেরা মাথাটা পাড় হতেই এইবার নদীটাকে চোখে পড়ল। কূলহীন একটা সুবিশাল জলধারা, বর্ষার জল পেয়ে ফুলেফেঁপে উঠে তীরবেগে ছুটে চলেছে। সন্ধের আধো অন্ধকারে তার আবছায়া চেহারাটা একটু একটু বোঝা যায় শুধু। সেইদিকে তাকিয়ে জিষ্ণু ভয়ে ভয়ে বলল, "এই নদীটা আমাদের পেরোতে হবে?"

"হ্যাঁ এবং না।"

"তার মানে?"

"মানে হল আমরা নদীটাকে পার হব, কিন্তু গোটা নদীটা নয়। এই দুরবীনটা নিয়ে সামনের দিকে দেখ।"

"কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

অবলোহিত সংবেদি দুরবীনের সবজেটে পটভূমিতে ছুটন্ত জলের সেই স্রোতটাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। তার একেবারে মাঝখানে কালো একখন্ড দ্বীপ দাঁড়িয়ে আছে। জিষ্ণু ফের একবার ভালো করে সেদিকে দেখল। না, দ্বীপ নয়, একটা পাহাড়। নদীটার বুক ভেদ করে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

"দ্বীপটা দেখতে পেয়েছ তো? আমরা ওইখানেই আজ রাতে ঘুমোব জিষ্ণু। ঐ আমাদের আস্তানা হবে এখনকার মত।"

"আজ রাতে—ওই নদীটা পেরিয়ে—"

তার গলার কাঁপুনিটা কান এড়াল না প্রফেসর বোসের। মৃদু হেসে তার পিঠে ছোট একটা চাপড় মেরে বললেন, "আজ থেকে কয়েক শতাব্দি আগের মানুষও কিন্তু এই নদীটা পাড় হবার কৌশল জানত। সামান্য একটা যন্ত্র লাগে তার জন্য। এইবারে আমরা সেটা তৈরি করব। যানের ভেতর যে অগ্নিনিরোধক পলিমারের কাপড় রয়েছে তার বাক্সটা বের করো--

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

পঞ্চা নামে ভালুকটি

চিত্ত ঘোষাল

"ওই হল। আমি চলি। বলে থপথপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বদ্যিনাথদাদু।"

মামা বলল "কী করবি বল তো দশা। বদ্যিনাথজ্যেঠু পঞ্চার পিঠে চড়লে পরাণজেঠু আবার রেগে না যায়।"

"কিছু ভেবো না," আমি ভরসা দিলাম মামাকে, "আমি খুব জানি ওকে। রাগের মাথায় এসেছিল। সত্যি সত্যি ভালুকের পিঠে চড়ার সাহসই নেই ওর। দেখো, আর আসবেই না।"

"না এলেই ভালো।"

"সব রেডি মামা। এবার খেলা দেখাতে বেরোলেই হয়।"

কিন্তু পঞ্চার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। শীত কমে গেছে, তবু বসে বসে ঝিমোয় সবসময়। ভালো করে খায় না। তিন- চার দিনেও যখন সুস্থ হল না পঞ্চা তখন ভাবনায় পড়ে গেলাম আমরা। পঞ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে আমরা তো গেছি।মন- খারাপ মন- খারাপ মুখের ভাব নিয়ে মামা আমাকে বলল, "বুঝলি দশা, পঞ্চাকে কেনার পর হাতে যে একষট্টি টাকা ছিল সে তো কবে শেষ। তারপরে একজনের কাছ থেকে একশো টাকা ধার করে চালাচ্ছি। পঞ্চা যে রকম অসুখে পড়ল তাতে ওকে ডাক্তার না দেখালে নয়। অথচ হাতে আছে আর পাঁচ- সাতটা টাকা। কী যে করি..."

"চলো মামা। পঞ্চাকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাই," আমি পরামর্শ দিলাম।

"দশা," মামা যেন ধমকই দিল আমাকে, "ইয়ার্কি করার আর সময় পেলি না! মানুষের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভালুকের চিকিৎসা হয় কখনো?"

"হয় গো মামা। আমি খবরের কাগজে পড়েছি। একটা বেড়ালের খুব কষ্ট হচ্ছিল, বেড়ালটা এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই থাকত। তা, সেই বেড়ালের কষ্ট দেখে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার তার পেট কেটে বাচ্চা বার করে দেয়।"

"বেড়ালটা বেঁচেছিল তারপর?"

"হ্যাঁ গো মামা, কাগজে লিখেছিল দিব্যি ভালো আছে বেড়ালটা।"

"লিখুকগে, সে কোন পাগল ডাক্তারের কান্ড। এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোন পাগল ডাক্তার নেই। থাকলেও তার হাতে আমরা পঞ্চাকে তুলে দেব না। পঞ্চাকে আমরা পশু- চিকিৎসকই দেখাব।"

আমি বললুম, "কিন্তু টাকা যে নেই মামা..."

গুম হয়ে বসে রইল মামা প্রায় দশ মিনিট, তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল, "আমার আংটিটা বিক্রি করে দেব ভাবছি... হ্যাঁ, বিক্রিই করে দেব..." আবার চুপ করে গেল মামা।

আমিও চুপ করে আছি। কী আর বলব। দামি জিনিস বলতে আমাদের ওই একটাই। তা ছাড়া অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে আংটিটার সঙ্গে। মামা পেয়েছিল দাদুর কাছ থেকে। শুনেছি তিনিও পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন তা মামাও ঠিক জানে না।

হুম করে একটা শব্দ করে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মামা, তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "ভেবেছিলাম আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আংটিটা তোকে দিয়ে যাব। তা আর হল না..."

মামার কষ্ট দেখে আমারও খুব কষ্ট হল। তার মন ভালো করে উৎসাহ দেবার জন্যে আমি বললাম, "তুমিই তো বল মামা, আমরা লড়ব, লড়ে বাঁচব। আমাদের অবস্থা একদিন ভালো হবেই। তখন শুধু একটা আংটি কেন, কত কি তুমি আমাকে দিতে পারবে! ওসব ভেবে এখন মন খারাপ করতে হবে না।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল মামা, "কে কার মামা রে, আমি তোরে না তুই আমার?"

হেসে উঠলাম দু'জনে একসঙ্গে। একটু পরে মামা বেরিয়ে গেল আংটিটা নিয়ে। ফিরে এল ঘন্টাখানেক বাদে।

"বারোশো টাকা পেলাম রে দশা। স্যাকরাটাকে ভালোই বলতে হবে, পরীক্ষা করে নিজেই বলল, 'ভালো সোনা, নিয়মমতো যেটুকু বাদ দেবার দিয়ে পুরো দামই দিচ্ছি।' এবার চল তো আমার সঙ্গে, আটাপাড়া ঘুরে আসি। সেখানে শুনেছি একজন পশু- চিকিৎসক আছে।"

আটাপাড়ার পশু- চিকিৎসককে খুঁজে পেতে বেশি কষ্ট করতে হল না। বাড়ির সামনে মস্ত বোর্ড। তাতে হলুদের ওপর কালো দিয়ে লেখা –ডাঃ ভববন্ধু পোদ্দার। আরো কী কী সব লেখা ছিল মনে নেই।

কলিংবেল টিপতেই হোঁদল কুতকুত চেহারার একজন দরজা খুলেই বলল, "বেড়াল কুকুর কাকাতুয়া না ময়না?"

"আপনিই কি ডাক্তার ভববন্ধু পোদ্দার?" মামা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, আমিই বিখ্যাত পশু-চিকিৎসক ভববন্ধু পোদ্দার। ভারতবিখ্যাত বললেই ঠিক বলা হয়। আমি কোয়েম্বাটুরের রাজবাড়িতে কাকাতুয়ার চিকিৎসা করেছি। সেবার যদি আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছতে না পারতাম তাহলে হায়দরাবাদের পাঁচটা হায়েনা মারাই যেত। তারপর ধরুন হিজলগঞ্জের সেই হিপোপটেমাস, আমি ছিলাম বলেই না বাঁচল। কত আর বলব, যাক –আপনাদের কেসটা কী?"

"আজ্ঞে ভালুক।" মামা বলল।

আমার মনে হল কেমন একটু ভড়কে- যাওয়া ভাব হল ডাক্তার ভববন্ধুর।

"ও, ভালুক," আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল পশু- চিকিৎসক।

"তার মানে ভালুকের চিকিৎসা আপনার দ্বারা হবে না!" মামা খোঁচা দিল ডাক্তারকে।

"কী? কী বললেন আপনি? ভালুকের চিকিৎসা আমার দ্বারা হবে না? আপনার ভালুককে কেউ যদি বাঁচাতে পারে তো সে এই ভারতবিখ্যাত পশু- চিকিৎসক ডাক্তার ভববন্ধু পোদ্দার। অন্তত কয়েক হাজার ভালুকের চিকিৎসা আমি করেছি।"

মানুষের ডাক্তাররাও রোগ সারানো নিয়ে বড়ো বড়ো গুল মারে, তা আমি দেখেছি। পশু-চিকিৎসকরাও ডাক্তার, তারাও গুল মারতেই পারে। তা- ই বলে গুলের কোন সীমা- পরিসীমা থাকবে না? পঞ্চার জন্যই মামা যে এত গুল সহ্য করছে তা বুঝতে পারছি।

আমি মিনমিন করে বললাম, "ডাক্তারবাবু, এখানে অত ভালুক আছে?"

"দূর বোকা, ডাক্তার আমার দিকে তাকাল, সে কি এখানকার কথা নাকি? একবার হল কী, উগান্ডার জঙ্গলে শয়ে শয়ে ভালুক মরে যেতে লাগল। রোগটা যে কী কেউ ধরতে পারছে না। জঙ্গলে

ঘুরে বেড়ানো ভালুকদের চিকিৎসাই বা হবে কেমন করে? অগত্যা অগতির গতি এই ডাক্তার ভববন্ধু পোদ্দারকেই চিঠি লিখল ওদের প্রধানমন্ত্রী। কী আর করি? গেলাম।"

"উগান্ডার প্রধানমন্ত্রী আপনাকে চিনত?"

"চিনত না, কিন্তু জানত। প্রধানমন্ত্রীদের সব জানতে হয়। এই যে তোমাদের একটা ভালুক আছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর তা নিশ্চয়ই জানা আছে। তারপর যে কথা হচ্ছিল, চলে গেলাম উগান্ডা। একটা মরা ভালুক দেখেই বুঝে গেলাম রোগটা কী। লিখে দিলাম ওষুধ। সে ওষুধ উগান্ডায় ছিল না। ব্লাডিভোস্টক থেকে প্লেনে করে বস্তা বস্তা ওষুধ আনানো হল। তারপর টন টন গাজরে সেই ওষুধ মাখিয়ে সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে দেওয়া হল হেলিকপ্টার থেকে। ভালুকরা সেই গাজর মনের আনন্দে খেতে লাগল। সেরে গেল তাদের সেই মারাত্মক অসুখ। যাকগে, গল্প করে আমার সময় নষ্ট কোরো না, অনেক রুগি দেখতে হবে, বেরিয়ে যাব এক্ষুণি।"

"আমিও তা- ই বলতে যাচ্ছিলাম," মামা বলল, "চুপ কর দশা। সেই কখন থেকে শুধু বকবক করে যাচ্ছিস। ডাক্তারবাবুর সময় নষ্ট হচ্ছে। দেখছিস না ডাক্তারবাবু বাজে কথা বলা একদম পছন্দ করেন না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনার ফি কত?"

"ভালুক তো? বাড়ি গিয়ে দেখলে একশো, এখানে নিয়ে এলে পঞ্চাশ।"

এ কী রে বাবা, আমি ভাবলাম, এ কেমন ডাক্তার? এক এক রকম রুগির জন্য এক এক রকম ফি। আপনা- আপনি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "ডাক্তারবাবু, আপনার আরশোলা দেখার ফি কত?"

ডাক্তার ভুরু কুঁচকে মামার দিকে তাকাল, "এই ছোঁড়াটা কে হয় আপনার?"

"ভাগনে," মামা বলল।

ডাক্তার হাত নেড়ে বলল, "এর দ্বারা কিসসু হবে না। এ পশুপক্ষী আর কীট- পতঙ্গের পার্থক্য বোঝে না। আরশোলা যে পশুও না পক্ষীও না, তা জানে না গাধাটা।"

"গাধার আই. কিউ. আপনি মেপেছেন ডাক্তারবাবু?" আমি বোকা- বোকা মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম।

"এটা কোথাকার গজকচ্ছপ রে বাবা!" খ্যাকখ্যাক করে উঠল ডাক্তার ভববন্ধু পোদ্দার।

"চল দশা," আমার হাত ধরে টানল মামা, "পঞ্চাকে নিয়ে আসি। আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যে ভালুক নিয়ে আসছি ডাক্তারবাবু।"

"এই যে শুনুন..," ডাক্তারের ডাকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা।

ডাক্তারের থুম্বো মুখটা হঠাৎই ঝুলে পড়েছে যেন, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। থেমে থেমে সে বলল, "আপনাদের ভালুকের স্বভাবচরিত্র কেমন? শান্তশিষ্ট তো? মানে, সেই বুঝে আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে কিনা!"

“আপনি একদম চিন্তা করবেন না ডাক্তারবাবু,” মিটিমিটি হাসি মুখে মাখিয়ে মামা বলল, “ও রকম ঠান্ডা স্বভাবের ভালুক আপনি কখনও দেখেননি। আর চরিত্র? দেবতুল্য। না, ভুল বললাম, দেবতাদের চাইতে অনেক ভালো। চুরি ছ্যাঁচড়ামি ছলনা গুলবাজি একেবারে জানে না।”

“ভালুকরা গুলও মারে? দেখেছেন আপনি? কীভাবে মারে?” চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল ডাক্তার ভববন্ধু।

“ওই গুলবাজি কথাটা,” মামা বলল, “ভুলে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। গুল মারার আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষ ছাড়া কারোই তো নেই।” চল রে দশা, পঞ্চাকে নিয়ে আসি। দেরি হলে ডাক্তারবাবু আবার কলে বেরিয়ে যাবেন।

যেতে যেতে আমি বললাম, –“এই গুলবাজ ডাক্তারকেই দেখাবে পঞ্চাকে? কাজ হবে ওর চিকিৎসায়?”

“এখানে পশু- চিকিৎসক আর পাচ্ছি কোথায়? হাজার হোক পশুর ডাক্তার তো, মানুষের ডাক্তারের মতো অতটা খারাপ হবে না।”

“ বুঝলাম না মামা, তোমার এই কথাটা।”

“বুঝবি বুঝবি। বড়ো হ, অভিজ্ঞতা হোক, তখন বুঝবি।”

পঞ্চাকে নিয়ে ঘন্টাখানেক বাদে আমরা আবার তো গেলাম ডাক্তার ভববন্ধু পোদ্দারের বাড়িতে।

প্রথমে ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে পঞ্চাকে দেখতে দেখতে বাশ খানিকটা দূরে থেকে তার চারপাশে ঘরতে লাগল।

“এটা কী হচ্ছে মামা?” আমি ফিসফিস করে মামাকে জিজ্ঞেস করলাম।

“কতটা মারাত্মক বুঝে নিচ্ছে।”

“কী? পঞ্চার অসুখটা?”

“না, পঞ্চা নিজে।”

ঘোরা থামিয়ে একসময় ডাক্তার বলল, “হুঁ, খুবই খারাপ অবস্থা। কষ্ট কী?”

মামা সব বলল।

শুনতে শুনতে ডাক্তার ভীষণ গম্ভীর মুখ করে শুধু হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিল। মামার বলা শেষ হতে সে বলল, “দু’ জনে জাপটে ধরুন ওকে। পরীক্ষা করব।”

“কিচ্ছু করতে হবে না ডাক্তারবাবু, আপনি নিশ্চিন্তে ওকে পরীক্ষা করুন,” মামা ভরসা দিল।

তবু কি ভয় যায় ডাক্তারের? যতটা সম্ভব দূর থেকে হাত বাড়িয়ে সে পঞ্চাকে পরীক্ষা করতে লাগল। তবে মানতেই হবে, অনেকক্ষণ ধরে বেশ যত্ন করেই দেখল। স্টেথো দিয়ে বুক, পেট, এমনকী ল্যাজও পরীক্ষা করল, তারপর ভীষণ থেকে ভীষণতর গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করতে লাগল, “হুঁ, সুপ্রাভেন্ট্রিকিউলার প্যারক্সিজম্যাল ট্যাকিকার্ডিয়া উইদ ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম। হুঁ, খুবই কঠিন অবস্থা। ট্রাটোট্রিট্রোট ট্রিট্রিট্রোটেটিট ট্রোট্রোইটিসের লক্ষণও আছে।”

আমি খুব ভয় পেয়ে বললাম, “আমাদের পঞ্চা বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?”

ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটল, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, “আলবাত বাঁচবে। আমার কাছে যখন ওকে আনতে পেরেছ, সারিয়ে আমি তুলবই। তবে বাপু, খরচ একটু আছে। ফি আমি আজ যা নেব ওই একবারই। অনেক ওষুধ লাগবে, তার দাম আছে, খাওয়ানোর খরচ আছে...”

ডাক্তারের কথার মাঝেই মামা বলে উঠল, “ওষুধ খাওয়ানোর খরচ? সে কী?”

“হ্যাঁ, অত ওষুধ আপনি ভালুককে খাওয়াবেন কী করে? খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো যাবে না। দু’ বেলা ওকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। আমি ওষুধ খাইয়ে দেব। ওষুধও আমিই দেব। ওষুধের দাম আর খাওয়ানোর খরচ এক এক বেলায় পঞ্চাশ টাকা।”

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

কর্ণাকর্ষণ বৃত্তান্ত

তাপস মৌলিক

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে সবকিছুর প্রতিই আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বাংলাভাষার প্রবাদগুলোকে দেখলে বোঝা যায় সেগুলি মোটেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাই এগুলোর খুব শিগগির আধুনিকীকরণ দরকার।

উদাহরণ হিসাবে একটা প্রবাদ নেওয়া যাক –'কান টানলে মাথা আসে'। প্রথম কথা, শুধু কান টানলেই যে মাথা আসে তা তো নয়। চুল টানলেও আসে, কান টানলেও আসে (সর্দির নাক টানা অবশ্য আলাদা), সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত টানলেও আসে। হঠাৎ কানের প্রতি এমন পক্ষপাত কেন?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কান টানলে কি সবসময়েই মাথা আসে? যদি কারো বাঁ কানটা দড়ি দিয়ে জানালার শিকে বেঁধে ডান কান ধরে টানা হয় তবে মাথা আসতে পারে না। যদি কারো বাঁ কানে দশ নিউটন বলপ্রয়োগ করা হয় আর ডান কান ধরে পাঁচ নিউটন বলে টানা হয় তবে মাথাটা বাঁ দিকে যাবে। অর্থাৎ যে ডান কান ধরে টানছিল সে বলবে, 'কান টানলে মাথা যায়'। আবার ধরা যাক ক আর খ দুটো ছেলে। খ ছেলেটি ক এবং একটা জানালার মাঝে দাঁড়িয়ে। এখন খ- এর কানে একটা দড়ি বেঁধে জানালার শিকে এক পাক ঘুরিয়ে ক- র হাতে দিয়ে বললাম টানো। এবার ক দড়ি ধরে টানলে খ জানালার দিকে, অর্থাৎ ক- র থেকে দূরে সরে যাবে। এক্ষেত্রেও কান টানলে মাথা 'যাচ্ছে'।

কানে টান মেরে মাথা আনতে গেলে একটা ন্যূনতম বল দরকার। একটা পুঁচকে ছেলে যদি দারা সিং- এর কান ধরে টানে তবে কি আর মাথা আসবে? মাথার স্থিতিজাড্য কাটাবার জন্য প্রয়োজনীয় এই বলকে আরম্ভ বল বা থ্রেশোল্ড ফোর্স বলা হয়। কান টানলে মাথা আসবে তখনই যখন টানটা এই আরম্ভ বলের চেয়ে বেশি হবে। 'বল' জিনিসটার মান- এর সঙ্গে দিকনির্দেশ করাও সমান জরুরি। কেউ যদি কারো কান ধরে ওপরদিকে টানে তবে বলা যাবে 'কান টানলে মাথা ওঠে'। আবার নীচের দিকে টানলে বলতে হবে 'কান টানলে মাথা নামে'। এই দুই ক্ষেত্রে সবসময়েই টানটা আরম্ভ বলের চেয়ে বেশি

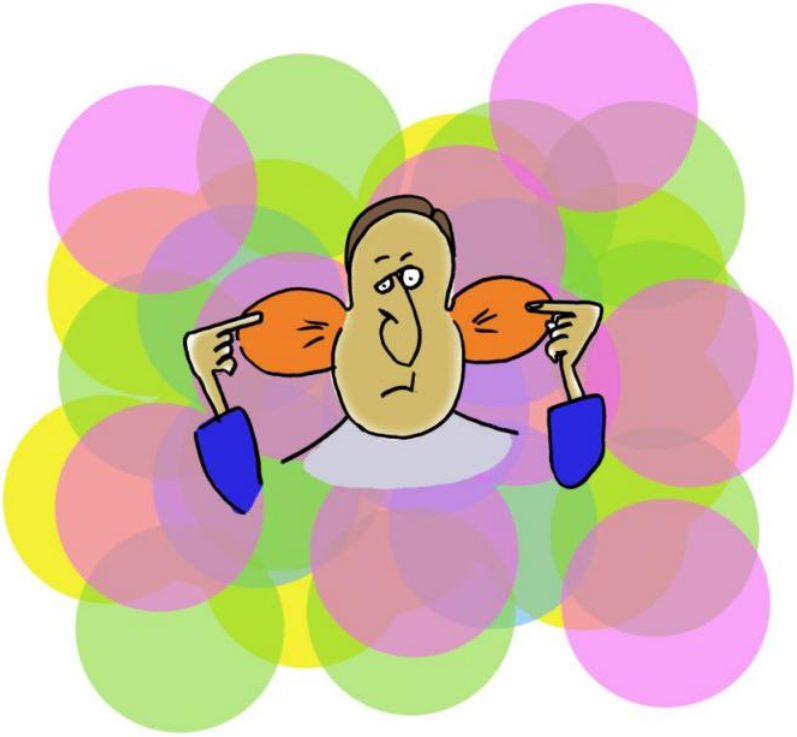

হতে হবে। বলা বাহুল্য, আরম্ভ বলের মান একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম। মাথামোটা বা কানভারী লোকেদের আরম্ভ বল বেশি লাগে।

আরো অনেক ব্যাপার আছে। যারা নির্লজ্জ, এক কানকাটা তাদের ক্ষেত্রে মাত্র একটা কান ধরে টানলে তবেই মাথা আসবে। যেদিকের কানটা কাটা সেদিকে মাথা যাবার কোন প্রশ্ন নেই। ঝামেলা কম (উদাহরণ- ডানকান ফ্লেচার)। আর দু'কানকাটাদের তো কান টানার কোনো ব্যাপারই নেই – তাই তারা নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটে। যাদের কানপাতলা তাদের ক্ষেত্রে ভয়টা হচ্ছে হ্যাঁচকা টানলে কানটা না ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে – তাহলে আর মাথা আসবে না। এমনও হতে পারে কারো কারো কান টানলে শুধু ইলাসটিকের মতো বেড়েই যায় – মাথাটা যেখানকার সেখানেই থাকে। এদের স্থিরমস্তিষ্ক বলে। বাকিরা অস্থিরমস্তিষ্ক। আর লজ্জায় যাদের মাথা কাটা গেছে, তাদের তো 'মাথাই নেই তার মাথাব্যথা'।

এসব কথা বিচার করে দেখলে 'কান টানলে মাথা আসে' কথাটার পরিবর্তন যে কতটা জরুরি তা টের পাওয়া যায়। সমস্ত দিক হিসেব করে এ বিষয়ে নতুন একটা প্রবাদ তৈরি করা খুব শক্ত। দুইকানবিশিষ্ট লোকেদের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রবাদটাকে ঠিকঠাক করে বলা যেতে পারে – 'কোন ব্যক্তির দুই কানে প্রযুক্ত বিপরীতমুখী আকর্ষণ বলের অন্তর (বা বিয়োগফল) আরম্ভ বলের সমান বা বেশি হলে অধিক মানের বলটির অভিমুখে ব্যক্তিটির মাথার সরণ হবে।' এতবড় প্রবাদ মনে রাখা শক্ত। তাই ছোট করে বলা যায় – 'কান টানলে মাথা আসতেও পারে, নাও আসতে পারে।'

এটাতেও ভুল আছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি কান টানলে মাথা আসা, না আসা ছাড়াও ওঠা, নামা, স্থির থাকা ইত্যাদি নানা ঘটনা ঘটতে পারে। তাই প্রবাদটা হওয়া উচিৎ - 'কান টানলে মাথার যে কী হবে কিচ্ছু বলা যায় না।' এখানেও ভুল আছে।

আমরা এই প্রবাদে ধরেই নিচ্ছি যে কানটার অস্তিত্ব আছে এবং সেটা টানা হতে পারে। অথচ আমরা একটু আগেই দেখলাম যে কান ছাড়া লোক (uncanny বা cannot) হতেই পারে। আর কান ধরে টানাটা মোটেই কিছু আহামরি কিংবা উচিৎ কাজ নয়।

আরো বহু অবৈজ্ঞানিক প্রবাদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। যেমন 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' – যেন লম্বা লোকেরা প্রতিদিন একবার চাঁদটা ছুঁয়ে দেখে নেয়! যেমন 'যেখানে ধোঁয়া সেখানেই আগুন' – যেন শীতের সকালে যখন আমাদের মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়লে ধোঁয়া বেরোয় তখন পেটের ভেতর আগুন জ্বলে। যেমন 'চোরের মায়ের লম্বা গলা' – যেন জিরাফের ছানাপোনারা সবাই এক একটা সাক্ষাৎ চোর।

তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে এসব প্রবাদে কান না দেওয়াই ভালো।

ছবিঃ সৌভিক

প্রান্তিকের গল্প

শীতের বিকেল, বেশ ঠান্ডা লাগছে। দোলনায় দুলতে দুলতে থাম্মাকে বললাম, "আচ্ছা থাম্মা তুমি জানো শীতকালে রোদ্দুর কেন দেরিতে ওঠে আর তাড়াতড়ি চলে যায় ?"

থাম্মা বলল, "নাতো ! "

আমি বললাম, "শীতকালে ভোর বেলা খুব ঠান্ডা তো, তাই সূর্যি ঠাকরের লেপ ছেড়ে বেরতে ইচ্ছে করে না, দেরি হয়ে যায়। হঠাৎ তার মনে হয় গাছ পালা ফুল পাখিদেরকে রোদ্দুর দিতে হবে, ওদের খুব ঠান্ডা লাগছে, তারপর আকাশের এদিক থেকে ওদিকে দৌড়তে হবে । ও সোয়েটার না নিয়েই দৌড়ে চলে যায়। ওর মা কত বলে, 'সোয়টার নিয়ে যা।'

"বিকেল হলেই সূর্যি ঠাকুরের ঠান্ডা লাগে, ও তখন লাফাতে লাফাতে বাড়ি চলে যায়। এবার বুঝলে তো থাম্মা শীতকালে কেন দেরিতে রোদ্দুর ওঠে আর তাড়াতাড়ি চলে যায়।"

ছত্তিশগঢ় রাজ্যের এক পাহাড়চুড়োয় একটা ইশকুলে গিয়েছিলাম ছবি আঁকাতে আর গল্প বলতে। সেদিন সকালে বেশ একদল বন্ধুকে নিয়ে ছবি আঁকবার আসর বসল। সেখান থেকে দারুণ দারুণ সব ছবি নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। এ সংখ্যায় তার থেকে তিনখানা ছবি দিলামঃ

প্রথম ছবিটা এঁকেছে ক্লাশ টু এর দিশা লাকরা।
তার ভীষণ প্রিয় এক মা হাতি আর বাচ্চা হাতির গল্পের ছবি এঁকেছে সে। তারা একটা বাগানের মত সাজানো বনে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমে আমরা দাঁড়াব সেই বাগানেঃ

একবার এক বাঘ নাকি এক বাঁদরকে বিয়ে করতে এসেছিল। অন্য বাঁদরেররা সত্যিকারের বাঁদরের জায়গায় তার সামনে রেখে দিল একটা মাটির বাঁদর। তার মাথাটা রাখল আলগা করে বসিয়ে। বাঘ এসে তার হাত ধরতেই মুন্ডু পড়ল খসে আর অমনি সব বাঁদর মিলে কান্না শুরু করে দিল, কনে মরে গেছে। আসল বাঁদরটা বেঁচে গেল। ভাবো কেমন বুদ্ধি! সে গল্পটা ছিল উত্তরপূর্বের শিলং পাহাড়ের মানুষদের গল্প। আর তাই শুনে মধ্যভারতের ছেলে ক্লাশ টু এর কৌশিক বিশ্বাস তার কেমন চমৎকার ইলাস্ট্রেশান করেছে দেখো→

এবারে আনমোলের কথা। সে- ও পড়ে ক্লাশ টু তে। সে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, আমি তো রোজ ভূত দেখি! বললাম সেকী রে? রাতে ঘুমোস না? সে বলল, রাতে কোথা? আমি তো ভূত দেখি শুধু দ্দিনের বেলা। ভূতেরা খুব ভালো। এই দেখো। বলেই লাল নীল পেনসিলের বড় বড় টানে সে এঁকে দিল ভরদুপুরে এক জঙ্গলভর্তি গোল গোল মজাদার ভূতেদের ছবি। এই যে সঙ্গে দিলামঃ

খান্ডবদাহন

<u>সংহিতা</u>

সার্ঙ্গক ও অগ্নিদেব

সার্ঙ্গকদের নিস্তার দিয়েছিলেন স্বয়ং অগ্নি। চার সার্ঙ্গক আসলে ছিলেন ঋষি মণ্ডপালের সন্তান, চার বেদজ্ঞ ঋষি জরিতারি, সরীসৃক্ক, স্তম্বমিত্র ও দ্রোণ। ঋষি মন্ডপাল ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। বহু সংযম ও কৃচ্ছসাধনে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন কঠিন থেকে কঠিনতর তপস্যায়। তাঁর অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চার ফলে তিনি তপশ্চর্চার সমস্ত বিরুদ্ধমার্গেও সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মুক্তি পেয়েছিলেন মনুষ্যরূপ থেকে। আর স্থান পেয়েছিলেন পিতৃলোকে। তবুও স্বর্গের নানা অঞ্চলে গিয়ে দেখেছিলেন যে সে এলাকা তাঁর জন্য রুদ্ধ। একদিন তেমন এক অঞ্চলের প্রবেশপথে তিনি সপারিষদ মৃত্যুরাজকে পেয়েছিলেন। হতাশ ঋষি জানতে চেয়েছিলেন, "কেন এই অঞ্চল আমার জন্য রুদ্ধ? আমি তো জানতাম আমি আমার তপস্যাবলে, তপস্যার ফলেই এসব অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারব! হে স্বর্গবাসীরা, আমাকে জানান কেন এইসব অঞ্চল

আমার জন্য রুদ্ধ। যে তপস্যা, যেরকম কৃচ্ছসাধন করলে আমি এসব অঞ্চলে প্রবেশ ও বিচরণের অনুমতি পাব, আমি তাই করব।”

দৈব পরিষদ উত্তরে জানিয়েছিলেন, “হে ব্রাহ্মণ, মানুষ জন্মসূত্রে ঋণী। নিঃসন্দেহে এই ঋণ তার ধর্মের, আচরণের, অধ্যয়নের এবং পূর্বজের কারণে। এইসব ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যজ্ঞে, তপস্যায় আর সন্তান জন্ম দিয়ে। তপস্যা ও যাগযজ্ঞ আপনি অনেক করলেও আপনি নিঃসন্তান। সন্তানের জন্ম দিন। তবে আপনি আনন্দের সেই সব মার্গে বিচরণের সুযোগ পাবেন যা এখনও আপনার কাছে অবরুদ্ধ, অজানা। বেদানুসারে পুত্র পিতাকে পুত নামের নরকে যাওয়ার থেকে উদ্ধার করে।”

সে কথা শুনে মন্ডপাল ভাবতে শুরু করেন কোন প্রাণী অল্প সময়ে অনেক

সন্তানের জন্ম দেয়। ভেবেচিন্তে তিনি ঠিক করেন যে পাখিরা সব থেকে তাড়াতাড়ি সব থেকে বেশি সংখ্যায় অপত্যের জন্ম দেয়। তাই তিনি পিতৃলোক থেকে পৃথিবীতে এসে সার্ঙ্গক পাখির রূপ ধরেন। যথা সময়ে জরিতা নামে এক পক্ষিণীর সাথে তাঁর বিবাহ হয় ও কিছুদিন পরে জরিতা চার সন্তানের জন্ম দেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বেদজ্ঞ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ছিলেন জরিতারি, মধ্যম ছিলেন সরীসৃক্ক, তৃতীয় সন্তান ছিলেন স্তম্বমিত্র ও

কনিষ্ঠ ছিলেন দ্রোণ। চার পুত্র ডিম ফুটে বেরোনোর আগেই মন্ডপাল বাসা ছেড়ে যান লপিতা নামের আরেক পক্ষিণীর কাছে।

কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে অগ্নিদেব খান্ডব দাহে মাতলে জরিতা উৎকন্ঠিত হয়ে পড়েন। তাঁর সন্তানরা যদিও তখন ডিম ফুটে বেরিয়েছে কিন্তু তখনো তাদের না হয়েছে পা, না হয়েছে ডানা, না গজিয়েছে পালক। চার সদ্যোজাত ঋষিও কান্নাকাটি জুড়লেন। মা জরিতা দুঃখ করতে লাগলেন, "আমি যে তোদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না! তোদের যে দেখার কেউ নেই। তোরা জন্মাবার আগেই যে তোদের বাবা তোদের কথা ভুলে চলে গেছে। এখন কী করে তোদের কোথায় নিয়ে যাই? কোথায় গিয়ে যে তোদের বাঁচাই!"

মাকে কাঁদতে দেখে জ্যেষ্ঠ জরিতারি বললেন, "মা তুমি যদি নিশ্চিত আশ্রয়

উড়ে যেতে পারো তবে তুমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে। আমরা না থাকলেও তোমার নতুন সন্তান আসবে।" জরিতা রাজি হলেন না সন্তানদের সুরক্ষা নিশ্চিত না করে উড়ে যেতে। একটু ভেবে চিন্তে তিনি চার ঋষিপুত্রকে আশ্বস্ত করলেন, "গাছের নিচে ইঁদুরের বাসায় ঢুকে পড়, বাবা" বলে। কিন্তু তাঁর সন্তানরা কিছুতেই রাজি হলেন না। ঋষিপুত্রদের মত হলো, "পালক ছাড়া আমরা মাংসপিন্ড মাত্র। ইঁদুরের ভুরিভোজ। আমরা যাব না।" মা আবার বললেন, "বাসায় থাকলে আগুনে

পুড়ে মারা পড়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত।" তখন বেদজ্ঞ ঋষিপুত্ররা বললেন, "ইঁদুরের গর্তে মৃত্যু অনিশ্চিত। কিন্তু নিশ্চিত অনিশ্চিতের মধ্যে নিশ্চিতকে আশ্রয় করাই সুবুদ্ধি। এখানে বাসায় মৃত্যু হবেই তা আমরা জানি। কিন্তু ইঁদুরের গর্তে আমাদের পরিণতি কী হতে পারে তা জানি না।" ব্যাকুল জরিতা বললেন, "আমি দেখেছি যে বাজপাখি নখে করে ধরে নিয়ে গেছে গর্তের ইঁদুরটাকে। আমি তার পিছু নিয়ে দেখে এসেছি যে সে ইঁদুরকে মেরে খেয়েও ফেলেছে। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে এসেছি।" তখন শিশু ঋষিরা তর্ক জুড়লেন, "গর্তে যদি একটার বেশি ইঁদুর থাকে?" অগত্যা সন্তানদের ভাগ্যের হাতে সঁপে জরিতা চললেন বাঁচার আশায়।

এদিকে অগ্নির কাছে তাঁর তেজ ও প্রভাবের ভূয়সী স্তুতি গেয়ে মন্ডপাল আর্জি করেছেন যে অগ্নি তাঁর চার পুত্রকে দহন থেকে রেহাই দেবেন। তবুও তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে উঠল শিশু সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে। তা দেখে লপিতার হিংসে হতে লাগল। তিনি দুকথা শোনালেন মন্ডপালকে। রাগে দুঃখে লপিতাকে ত্যাগ করে মন্ডপাল চললেন তাঁর শিশুপুত্রদের কাছে।

এদিকে আগুনে দহন আসন্ন দেখে চার শিশু ঋষি নিজেদের প্রস্তুত করতে লাগলেন। জরিতারি বললেন, "মৃত্যুকে দেখে যে স্থির থাকতে পারে সেই প্রকৃত জ্ঞানী।" সরীসৃক্ক বললেন, "তুমিই প্রকৃত জ্ঞানী। এখন আমাদের জীবন সংকট। নিঃসন্দেহে একমাত্র একজনই জ্ঞানী ও সাহসী প্রতিপন্ন হবে।" তারপর স্তম্বমিত্র বললেন, "জ্যেষ্ঠকেই রক্ষকের কাজ করতে হয়। জ্যেষ্ঠেই অনুজদের বিপদ থেকে বাঁচায়। জ্যেষ্ঠ ব্যর্থ হলে অনুজেরা কীই বা করতে পারে? " শেষে দ্রোণ বললেন, "সাতমাথা সাত জিভ নিয়ে তেড়ে আসছে অগ্নি, এক্ষুণি আমাদের চেটেপুটে খেয়ে ফেলল বলে!" অবশেষে অগ্নি উপস্থিত হলে একে একে চার ঋষি তাঁর স্তুতি গেয়ে প্রার্থনা করলেন যে তাঁদের যেন সুযোগ দেওয়া হয় তাঁদের পিতাকে নরকভোগের হাত থেকে মুক্ত করার এবং সে জন্যই তাঁদের যেন বাঁচিয়ে রাখা হয়। অগ্নিদেব তো আগেই মন্ডপালকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে চার ঋষিপুত্র অক্ষত থাকবেন। তিনি সে কথা রেখেছিলেন।

খান্ডবদাহ শেষ হলে জরিতা আর মন্ডপাল দুজনেই ফিরে এসেছিলেন চার শিশুপুত্রের কাছে। দেবরাজ বর দিতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণার্জুনকে। অর্জুন চেয়েছিলেন ইন্দ্রের অস্ত্রসম্ভার। ইন্দ্র যথা সময়ে তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকেও তিনি তেমন বর দিয়েছিলেন যেমনটা বৃষ্ণি কুলপতি চেয়েছিলেন। পাঁচ আর দশদিন ধরে খান্ডব দাহ করে তুষ্ট অগ্নি কৃষ্ণার্জুনের পৌরুষ ও বীরত্বের প্রশংসা করে বিদায় নিলেন।

ছবিঃ শিমুল

রেশমী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগের কথা। চম্পক নগরে এক সদাগর বাস করত। তার নাম ছিল চাঁদসদাগর। সদাগরের পত্নীর নাম ছিল সনকা। তাদের সাত সাতটি পুত্র ছিল। সর্পদেবী মনসার সঙ্গে তাঁর চিরকালীন বিবাদ। দেবীর রোষে মারা গেছে চাঁদসদাগরের ছয় পুত্র। এই কারণে সদাগর তো খুব শোকে ছিল। তবুও সে মনসাকে দেবী বলে মেনে নেয়নি। দিনরাত হেঁতালের ডাল হাতে ঘরে ঘরে মনসার সন্ধান করে ফিরত আর বলত, "একবার যদি দেখা পাই তার, এই লাঠির ঘা মাথায় মেরে মেরেই ফেলব তাকে। আপদ ঘুচবে আমার।"

এইভাবে কিছুদিন কাটার পর সদাগর তো ঠিক করল সে বাণিজ্যে যাবে সেই দক্ষিণে। মনের আনন্দে ডিঙায় চেপে "শিব শিব" বলে যাত্রা করল। কাণ্ডারীও চাঁদের আদেশ পেয়ে এগিয়ে চলল। সপ্তডিঙা উপস্থিত হল কালীদহে। এদিকে ধ্যানযোগে মনসা জানতে পারলেন যে সদাগর কালীদহে এসেছে। মা মনসা তার সখি নেতার সাথে মন্ত্রণা করতে বসলেন। তাঁর অপমানের বদলা কিভাবে নেওয়া যায়? সেই ভাবতে ভাবতে বললেন যে সদাগরের সপ্তডিঙা ভরাডুবি করবেন। তাহলে যদি সদাগরের শিক্ষা হয়।

যেই বলা সেই কাজ। মনসা আকাশের মেঘের দলকে আহ্বান করলেন। আহ্বান করলেন মহাবীর হনুমানকে। পবননন্দনের হাতে পুষ্প ও পান দিয়ে অনুরোধ করলেন, "তুমি গিয়ে কালীদহে প্রবল বাতাস বইয়ে দাও। চাঁদ বণিকের সপ্ত ডিঙা জলে ডোবাও।"

দেবীর আদেশ পেয়ে উড়ে চলল মেঘের দল। চাঁদের মাথার উপর তখন বিপদের কালো ছায়া। শেষে দেবীর আদেশ পুরণ হল আর সপ্তডিঙা ডুবে গেল জলের তলায়। সদাগর কোনমতে বেঁচে গেল।

মনসা ছিলেন শিবের কন্যা। কিন্তু স্বর্গের নিয়মানুসারে মানুষের হাতে পূজা না পাওয়া পর্যন্ত দেবী মনসা স্বর্গে ঢুকতে পারবেন না। তাই তিনি চাঁদসদাগরের হাতে পূজা পেতে চেষ্টা করেন। কারণ একমাত্র চাঁদ যদি তার পূজা করে তবেই তার পূজা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তিনি পূর্ণ দেবতা হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবেন। কিন্তু চাঁদ শিবের পুজারী। সে মনসাকে ঘৃণা করে। সে কিছুতেই মনসার পূজা করবে না। মনসা চাঁদকে সর্বস্বান্ত করার জন্য সদাগরের শেষ পুত্র লক্ষীন্দরকে আঘাত করার চেষ্টা করলেন এবারে।

চাঁদসদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরের সাথে বেহুলার বিয়ে হয়। বাসর রাতে যদি চাঁদ নিজের ছেলে লখাকে রক্ষা করে ফেলতে পারে তাহলে মনসা হেরে যাবে। সেজন্য চাঁদ শিবের কাছে গেল সাহায্যের জন্য।

শিবের আদেশে বিশ্বকর্মা পুরো বাসরঘর লোহা দিয়ে তৈরি করে, কিন্তু মনসার ভয়ে সেখানে একটা ছিদ্র রেখে দেয়। সেই ছিদ্র দিয়ে কালনাগিনী নামের সাপ লক্ষীন্দরকে বিয়ের রাতে দংশন করে। প্রাণ হারায় লক্ষীন্দর ।

লক্ষীন্দরকে ভেলাতে ভাসিয়ে দেয়া হবে। এটাই নিয়ম। কিন্তু বেহুলা গোঁ ধরে বসে স্বামীর দেহের সাথে সে- ও যাবে। সমাজের কোন নিয়ম না মেনে বেহুলা নিজেই রওনা দেয় লখার ভেলার সাথে।
ঘাটে ঘাটে বিষ ঝাড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বেহুলা ঘুরতে থাকে। অনেক কষ্টের পর বেহুলা স্বর্গে পৌঁছায়। স্বর্গে গিয়ে বেহুলা নেচে গেয়ে শিবসহ দেবতাদেরও খুশি করে। কিন্তু খুশি হবার পরেও সবার এক কথা। একমাত্র মনসা রাজি হলে তবেই সম্ভব।

ঘুরতে ঘুরতে বেহুলা আসে নেতাই ধোবানীর ঘাটে। নেতাই মনসার ধোবানী এবং ওঝা। নেতাও সব শুনে বলে তার পক্ষে আর সব মরাকে জীবিত করা সম্ভব কিন্তু লখাই ছাড়া। কারণ লখাইর ব্যাপারে মনসার নিষেধ আছে। বেহুলা যদি মনসার অনুমতি আদায় করতে পারে তবেই সম্ভব লখাকে বাঁচিয়ে তোলা।

নেতাইর সাথে কাজে ঢুকে মনসার কাপড় ধুয়ে ধুয়ে মনসার নজরে পড়ে বেহুলা। তার আগে পর্যন্ত স্বামীর কথা কিছুই বলে নি সে তাঁকে। যখন মনসা তার কাজে পুরোপুরি খুশি হলেন, তখন সে জানায় তার বাসনা। আর মনসাও জানান তাঁর শর্ত। পৃথিবীতে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং সেটা একমাত্র চাঁদ সদাগর ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

বেহুলা রাজি হয়। সে তার শ্বশুর চাঁদসদাগরকে সব বোঝায়। চাঁদ কোনমতে বাঁ হাতে মনসা কে ফুল ছুঁড়ে পূজা করে। এরপর মর্তে মনসা পূজা শুরু হয়। বেহুলা তার স্বামীকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পায়। তারা সুখে শান্তিতে সংসার করতে থাকে।

ছবিঃ মৌসুমী

কাজুমার প্রতিশোধ (দ্বিতীয় পর্ব)

মূল সংগ্রহঃ বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ডের 'টেলস অব ওল্ড জাপান'।
বাংলা ভাষান্তরঃ সংহিতা

(আগের সংখ্যার পর)

বুড়ি তো তাঁর ছেলেকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে পালাতে রাজি করালেন। আর তাকে পাঠিয়ে দিলেন শিরোগোরোর রাজপ্রাসাদে।

এই সময়ে আবার হাতামোতোরা সংবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাশালী দাইমিওদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল। আবে শিরোগোরোর সাথে জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আরও দুই অভিজাত পুরুষ, কোন্ডো নোবোরিনোসুকে এবং মিদজুনো জিউরোজায়েমন। ক্রমে ক্রমে এমন দাঁড়াল যে জোটকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁরা সব চালচুলোহীন ভয়ানক লোকেদের নিয়োগ করতে লাগলেন। দয়াবশত এইসব নিয়োজিতরা কে কোথায় ছিলেন বা আগে কী করেছেন সেসব কথা জানতে চাইতেন না। ব্যবস্থা যেখানে এইরকম সেখানে শিরোগোরোর পালক মায়ের আপন সন্তান মাতাগোরো আশ্রয়প্রার্থী হলে তার প্রার্থনা যে সহজেই মঞ্জুর হবে সে নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ফলে মাতাগোরো আশ্রয় পেলেন শিরিগোরোর প্রাসাদে। বরং শিরিগোরো দারুণ আনন্দে মাতাগোরোকে আশ্রয় দিলেন; দিলেন সমস্ত রকম বিপদ থেকে মাতাগোরোকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি। তাই তিনি মুখ্য হাতামোতোদের একটা সভা ডেকে সেখানে তাঁদের সাথে, মাতাগোরোর পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে যে, "এই ভদ্রলোক ইকেদা কোনাইশোয়ুর বিশ্বস্ত অনুচর। ওয়াতানবে ইয়েকুয়ি নামে কোনাইশোয়ুর আরেক বিশ্বস্ত অনুচরকে ইনি ঘৃণা করতেন এবং , তাই, হত্যা করেছেন। ইনি এখন আমার আশ্রয়প্রার্থী। আমি এঁর মায়ের স্তন্যে পালিত। তাই ঠিক হোক বা ভুল, আমি এখন এঁর বন্ধু। সুতরাং এরপরে কোনাইশোয়ু যদি এঁকে তাঁর হাতে তুলে দিতে সেনা পাঠান, আমার বিশ্বাস যে, তখন আপনারা সবাই এক হয়ে আমাকে সাহায্য করবেন যাতে আমি এঁকে রক্ষা করতে পারি।"

"হ্যাঁ, সানন্দে," বলে উঠলেন কোন্ডো নোবোরিনোসুকে। তারপর আবার বললেন, "আমরা অনেকদিন সহ্য করেছি দাইমিওদের ঘেন্নাভরা আচরণ। আসুক কোনাইশোয়ুর দৌত্য, আমরা দেখিয়ে দেব হাতামোতোর শক্তি কাকে বলে।"

সভার সমস্ত হাতামোতো তালি দিয়ে উঠলেন সমর্থনে। তাঁরা তাদের সৈন্যবাহিনী তৈরি করতে লাগলেন যদি কোনাইশোয়ু সেনা পাঠান মাতাগোরোকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে তাঁরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করবেন কোনাইশোয়ুর সেনার। মাতাগোরো কিন্তু শিরোগোরোর প্রাসাদে একজন আদরণীয় অতিথি হিসেবে দারুণ সেবা পেয়ে চললেন।

এখন ওয়াতানবে কাজুমা দেখলেন যে রাত অনেক হলেও তাঁর বাবা বাড়ি ফিরলেন না। তাঁর জন্য মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে কাজুমা চললেন মাতাগোরোর বাসার দিকে। সেখানে পৌঁছে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর বাবা নিহত হয়েছেন। তিনি বাবার

মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো যে এই দুষ্কর্মটা মাতাগোরোর না হয়ে যায় না। তিনি দৌড়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন সেখানেই তাঁর পিতৃহন্তাকে হত্যা করবেন বলে। কিন্তু মাতাগোরো ততক্ষণে পালিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তখন শুধু তাঁর মা। মাও তখন শিরোগোরোর প্রাসাদে পালাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সমস্ত অনুসন্ধান ব্যর্থ দেখে কাজুমা ধরলেন মাতাগোরোর মাকেই। তাঁকে গোষ্ঠীর বয়জ্যেষ্ঠদের হাতে তুলে দিলেন কাজুমা এবং জানালেন মাতাগোরোর কথা, মাতাগোরোর হাতে তাঁর বাবার নিহত হওয়ার কথা। যখন পুরো বৃত্তান্ত রাজকুমারের কানে গেল তিনি প্রচন্ড রেগে গেলেন। তিনি মাতাগোরোর মাকে বেঁধে রাখার আদেশ দিলেন। আরও আদেশ দিলেন যে মাতাগোরোর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর মায়ের কারাবাস চলবে। তখন কাজুমা তাঁর বাবার মরদেহ কবর দিলেন এবং তাঁর মায়ের সাথে শোকযাপন করলেন।

খুব শিগগিরই আবে শিরোগোরোর লোকজনের মধ্যে চাউর হয়ে গেল মাতাগোরোর অপরাধে তাঁর মায়ের কারাবন্দি হওয়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মাতাগোরোর মাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। সেই কারণে তাঁরা রাজা কোনাইশোয়ুর কাছে এক দূত পাঠালেন। দূত রাজপুত্রের উপদেষ্টার সাথে দেখা করে বললেন, "আমারা শুনেছি যে ইয়েকুয়িকে হত্যার অপরাধে মাতাগোরোর মাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রভু শিরোগোরো অপরাধীকে ধরে নিজের হেপাজতে রেখেছেন এবং আপনাদের হাতে তুলেও দেবেন। কিন্তু মাতাগোরোর মা তো কোনো অপরাধ করেন নি। তাই আমাদের প্রার্থনা যেন তাঁকে এই নিষ্ঠুর কারাদণ্ড থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। তিনি আমাদের প্রভু শিরোগোরোরও পালক মাতা। ফলে তিনি সানন্দে মধ্যস্থতা করবেন মায়ের মুক্তির জন্য। আপনারা সম্মতি দিলে কাল সকালে আমাদের প্রভুর প্রাসাদের সদরে আমরা আসামীকে আপনাদের হাতে তুলে দেব।"

উপদেষ্টা খবরটা যেই রাজাকে দিলেন, অমনি রাজা খুশি হয়ে উঠলেন যে পরদিনই তিনি কাজুমাকে সুবিচার দিতে পারবেন। সেই খুশির রেশে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে হয়ে গেলেন শিরোগোরোর প্রস্তাবে। শিরোগোরোর দূত তো মহানন্দে ফিরে গেল তাদের ষড়যন্ত্র সফল হতে চলেছে দেখে। পরদিন সকালে রাজা সাসাউও দান্যেমন নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচরকে ভার দিলেন মাতাগোরোর মাকে ডুলিতে চড়িয়ে শিরোগোরোর প্রাসাদের দরজায় পৌঁছে দিয়ে মাতাগোরোকে সেখান থেকে ধরে আনার জন্য। দান্যেমন শিরোগোরোর প্রাসাদের দরজায় পৌঁছে বললেন, "মাতাগোরোর মাকে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আর তার বদলে মাতাগোরোকে তোমাদের হাত থেকে নেওয়ার দায়িত্বও আমারই।"

"নিশ্চয়ই। আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দেব। তবে তার আগে মা আর ছেলে তো কিছুক্ষণ একসাথে কাটাবেই, তাদের যে বরাবরের মতো বিচ্ছেদ হতে চলেছে। আপনাকে একটু সবুর করতে হবে যে!" বললেন শিরোগোরোর লোকজনেরা। তারপর তাঁরা মাতাগোরোর মাকে নিয়ে চলে গেলেন ভেতরে। সাসাউও দান্যেমন অপেক্ষায় রইলেন প্রাসাদের বাইরে যতক্ষণ না তিনি অল্প অধৈর্য বোধ করলেন। তখন তিনি ভেতরের লোকেদের একটু তাগাদাও দিলেন। তাঁরা বললেন, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, শিরোগোরোর মাকে পৌঁছে দিলেন বলে। কিন্তু ছেলে তো এখন যেতে পারবে না। বরং ভালো হয় আপনি চটপট নিজের বাড়ি ফিরে গেলে। বেশ খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আপনাকে বেশ কষ্ট দিলাম আমরা।" এসব তাঁরা বেশ উপহাস করেই বললেন।

এইবারে দান্যেমন বুঝলেন যে তাঁকে শুধু মাতাগোরোর মাকে হাতছাড়া করার ব্যাপারে ঠাকানো হয়েছে তাই নয়, পুরো দরকষাকষিতে তাঁকে উপহাসের পাত্র করে তোলা হয়েছে। এতে তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন যে ভাবেই হোক হাতামোতোদের ডেরা থেকে মাতাগোরো আর তার মাকে তিনি ছিনিয়ে নিয়ে যাবেনই। পায়ে পায়ে শিরোগোরোর প্রাসাদের ফটকের চৌকাঠ পেরিয়েই দেখলেন যে হাতামোতোরা সব্বাই অস্ত্র হাতে তৈরি। একটা নিরর্থক যুদ্ধে প্রাণ হারানোর কোনো ইচ্ছেই তাঁর ছিলো না। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর এটাও মনে হচ্ছিল যে এইভাবে ঠকে ফিরলে প্রভুর কাছে তাঁর লজ্জার অবশেষ থাকবে না। তাই তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের সমাধিস্থলে গিয়ে নিজের পেট ফুঁড়ে আত্মহত্যা করলেন।

রাজা যখন জানতে পারলেন যে তাঁর দূতের সাথে হাতামোতোরা কেমন ব্যবহার করেছেন, তখন তিনি রাগে অস্থির হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তলব করলেন তাঁর উপদেষ্টাদের। যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন তবুও তাঁর সমস্ত অনুচরদের সংগ্রহ করে আবে শিরোগোরোকে আক্রমণ করা হবে এমনটাই স্থির হলো। খবরটা জানাজানি হতে প্রধান দাইমিওরাও স্থির করলেন যে হাতামোতোদের ঔদ্ধত্যকে সাজা দেওয়াই কর্তব্য। উল্টোদিকে হাতামোতোরাও দাইমিওদের বাধা দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে তৈরি হলো। ফলে ইয়েডোর শান্তি বিঘ্নিত হলো। শহরজুড়ে

বেধে যাওয়া দাঙ্গা সরকারের ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হলো। তাঁরা একত্রে পরামর্শ করতে লাগলেন শান্তি ফেরানোর তাগিদে। হাতামোতোরা যেহেতু শগুনদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল সেহেতু তাদেরকে বশে আনাটা দুরূহ ছিল না। কঠিন ছিল দাইমিওদের সামলানো। মাৎসুদাইরা ইদজু নো কামি নামে এক গোরোজিউ একটা পরিকল্পনা করলেন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য। তখন শগুনের চিকিৎসা করতেন এক নামজাদা চিকিৎসক, নাকারাই সুসেন। সুসেন প্রায় প্রায়ই শগুন কোনাইশোয়ুকে দেখতে যেতেন তাঁর প্রাসাদে। হাতামোতো আর দাইমিওদের মধ্যেকার মারপিট যখন ইয়েডোর শান্তিকে ছারখার করে দিয়েছে, তখন তিনি চিকিৎসা করছিলেন শগুন কোনাইশোয়ুর এক দীর্ঘকালব্যাপী অসুখের। ইদজু নো কামি গোপনে ডেকে পাঠালেন চিকিৎসককে। তাঁকে নিয়ে বসলেন নিজের ঘরের ভেতর। খানিক একথা সেকথার

পরে, গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, "সুসেন, শগুনের হাতে তুমি অনেক কৃপা পেয়েছ। এখন সরকারের ভয়ানক করুণ অবস্থা। এখন যদি তোমাকে তোমার প্রাণ দিয়ে আনুগত্যের পরীক্ষা দিতে বলি তুমি কী তাতে রাজি হবে?"

"হ্যাঁ প্রভু, আমার পূর্বপুরুষরা বংশানুক্রমে তাঁদের সম্পত্তি রক্ষা করেছেন শগুনের কৃপায়। একজন দায়িত্বশীল সামন্ত হিসেবে আমি এই রাতেই আমার রাজার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।" বললেন সুসেন।

"বেশ তবে তোমাকে জানাই। মাতাগোরোর ঘটনা নিয়ে মহান দাইমিওদের সাথে হাতামোতোদের বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা প্রায় যুদ্ধ বাধাতে চলেছে। পুরো দেশে অশান্তি লেগে যাবে। চাষাদের আর নাগরিকদের জীবন দূর্বিষহ হয়ে যাবে, যদি না আমরা এই বিশৃঙ্খলা বশে আনতে পারি। হাতামোতোদের নিয়ন্ত্রণে আনা খুব কঠিন হবে না, কিন্তু দাইমিওদের শান্ত করার কাজটা বেশ কঠিন। আমার কৌশলে যদি তুমি সায় দাও তবে শান্তি ফেরানো যাবে। কিন্তু তাতে তোমার আনুগত্যের প্রমাণ হবে তোমার মৃত্যু।"

"আমি এই কাজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

"বেশ। তুমি যেমন যাও অসুস্থ প্রভু কোনাইশোয়ুকে দেখতে কালও তেমন যেও। সঙ্গে করে বিষ নিয়ে যেও। তাঁর মৃত্যু হলে এই অশান্তি থেমে যাবে। তোমার থেকে এইটুকু সেবাই প্রয়োজন।"

পরের দিন সুসেন গেলেন প্রভু কোনাইশোয়ুকে দেখতে। সঙ্গে নিলেন বিষ মেশানো ওষুধ। পানীয়ের অর্ধেক তিনি নিজে খেলেন। ফলে রাজার সন্দেহের কিছু রইল না। বাকিটা তিনি খেয়ে নিলেন। ডুলিতে চেপে নিজের বাড়ি ফেরার পথে রক্তবমি হয়ে মারা গেলেন সুসেন। একই লক্ষণে মারা গেলেন শগুন কোনাইশোয়ুকে। শগুনের মৃত্যুতে এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকে ঘিরে যে বিহ্বলতা তৈরি হলো দাইমিওদের মধ্যে তাতে হাতামোতোদের সাথে তাদের বাকি থেকে যাওয়া লড়াইটা চাপা পড়ে গেল।

এর মধ্যে গোরোজিউ ইদজু নো কামি হাতামোতোদের তিন নেতাকে ডেকে বললেন, "গোপণ ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকের মতো যে দাঙ্গাহাঙ্গামা তোমরা করেছ তাতে তোমরা তিনজন হাতামোতো হিসেবে সবথেকে বেমানান। আমার প্রভু শগুন এতো ক্রুদ্ধ হয়েছেন তোমাদের আচরণে যে তোমাদের তিনজনকে একটা মন্দিরে বন্দি করে রাখার হুকুম দিয়েছেন। তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার তোমাদের উত্তরপুরুষকে ডেকে দিয়ে দেওয়া হবে।"

যার ফলে তিন হাতামোতোকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়ে, তাদেরকে কান্যেইজি মন্দিরে বন্দি করে রাখা হলো। এই ঘটনায় ভয় পেয়ে বাকি হাতামোতোরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এদিকে প্রভু কোনাইশোয়ুর মৃত্যু হওয়ার কারণে আর হাতামোতোরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে শান্ত হয়ে যেতে দাইমিওদের সামনে যুদ্ধ করার মতো কোনো শত্রুই আর রইল না। এইভাবে অশান্তিতে রাশটানা হলো। শান্তি ফিরে এলো।

যদিও ইয়েকুয়ির ঘাতক মাতাগোরো নিরাশ্রয় হলো, কিন্তু সে জীবিত রইল বিনা শাস্তিতে। এটাই কি কাজুমা চেয়েছিল? – জানা যাবে পরের সংখ্যায়।

ক্রমশ

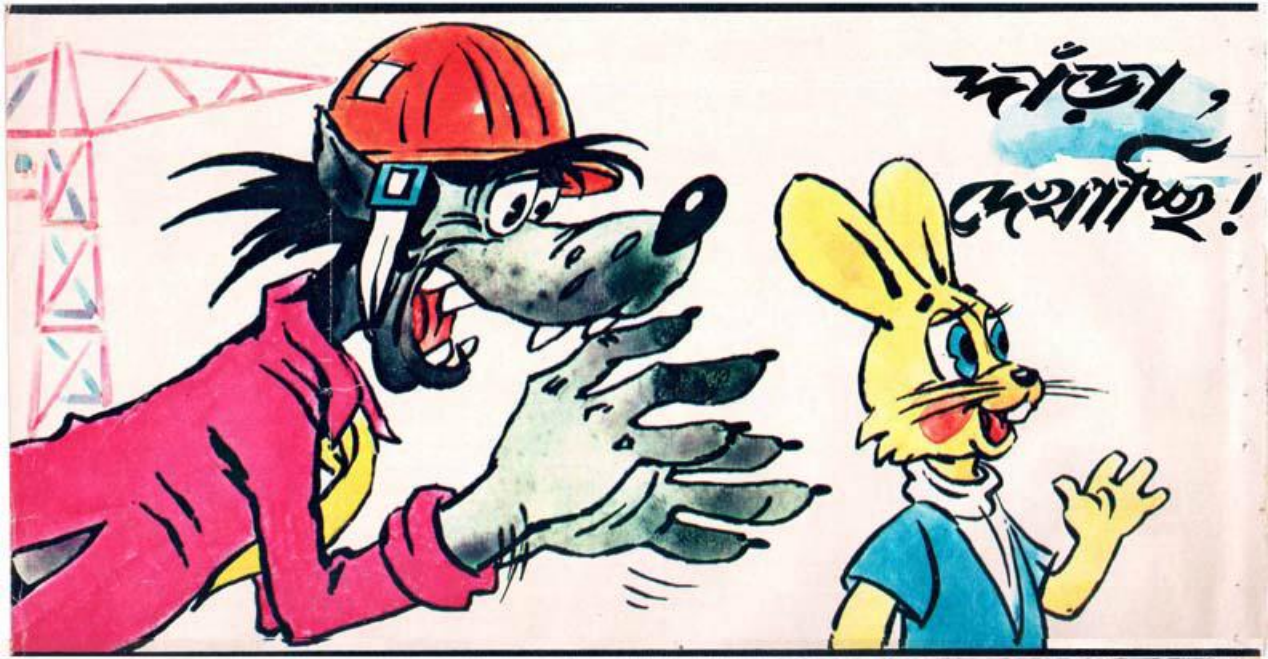

টেলিভিজন স্টুডিওতে দুর্ঘটনাটার পর নেকড়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে বহু সিরিজের এই কার্টুন ফিল্মটির চিত্রনাট্যকার আ. কুরলিয়ান্দ্স্কি ও আ. হাইত, পরিচালক ভ. কতেনোচকিন এবং শিল্পী স. রুসাকভ ঠিক করলেন নায়কদের এবার বড়ো একটা নির্মাণক্ষেত্রে পাঠানো যাক।

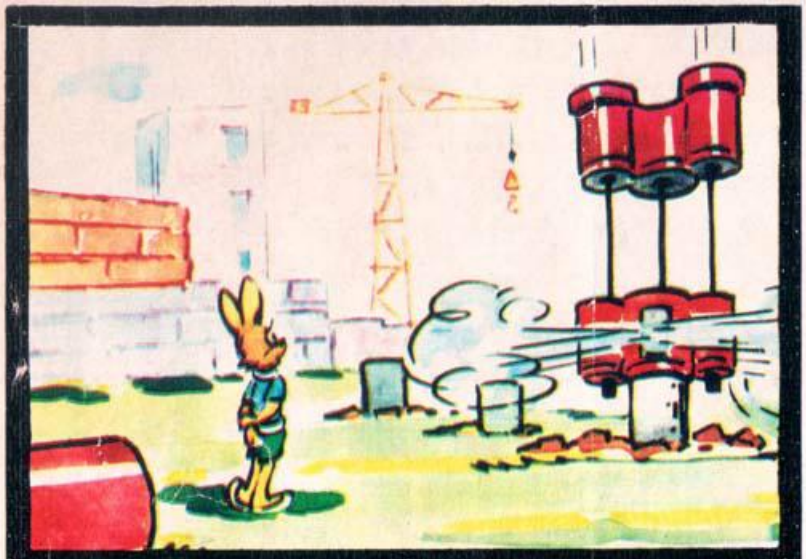

(১) নির্মাণক্ষেত্রটা ভালো লাগল খরগোশের। ঘুরে ঘুরে সে দেখে নানান ধরনের সেয়ানা সব যন্ত্র। পাইল পোঁতার যন্ত্রটাই মনে ধরল বেশি। তার কাছ ছেড়ে তার পা আর সরে না।

(২) এখানেই সে চোখে পড়ে গেল নেকড়ের। একটু দূরে লুকিয়ে পড়ল সে, নির্মাতাদের হেলমেটও পরে নিলে, খরগোশ যাতে চিনতে না পারে।

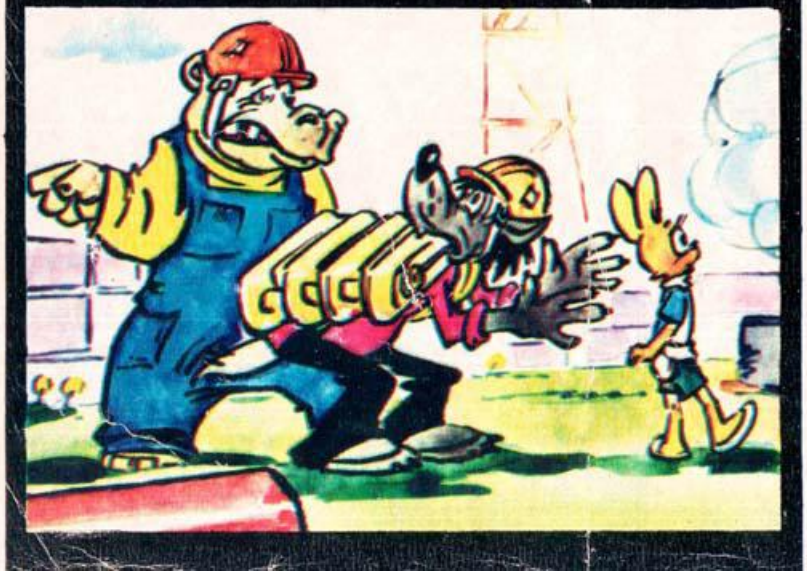

(৩) সেই হেলমেটই হল তার কাল। ফোরম্যান জল-হস্তী তাকে নির্মাতাদের একজন ঠাউরে হুকুম দিলে রেডিয়েটর নিয়ে যেতে পাশের দালানে।

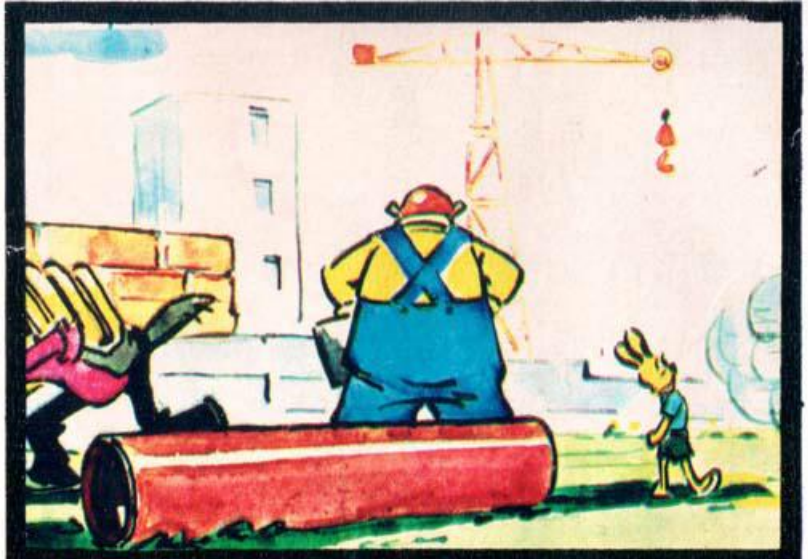

(৪) রেডিয়েটর টানাটানি করে নেকড়ে, ফেলতে পারে না; জলহস্তী কড়া নজর রেখেছে তার ওপর।

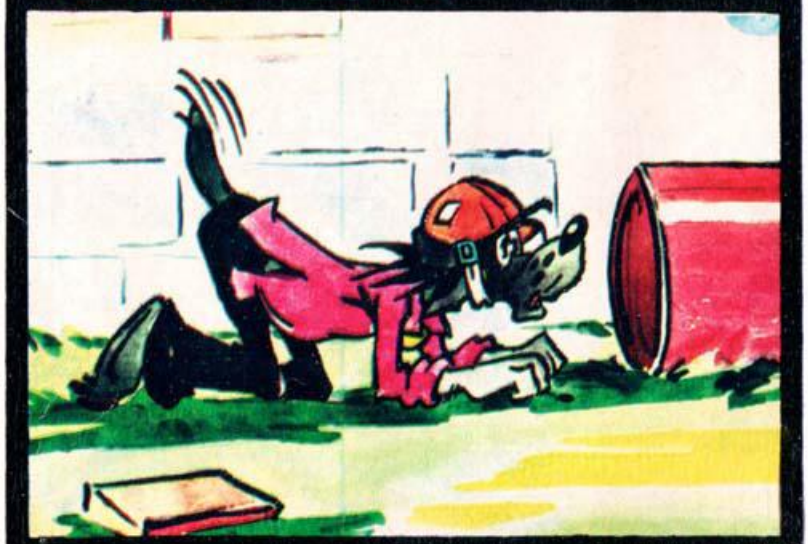

(৫) শেষ পর্যন্ত কোণ ঘুরে খালাস করলে তার বোঝা, খানিক বসল যাতে জল-হস্তীর চোখে না পড়ে, সেখানে পড়ে ছিল একটা পাইপ।

(৬) পাইপের ভেতর দিয়ে নেকড়ে দেখতে পেল খর-গোশকে। খরগোশ তখনো দেখছে পাইল-ড্রাইভারের হাতুড়ির খেলা, সন্দেহই করে নি যে নেকড়ে থাবা বাড়াবে তার দিকে।

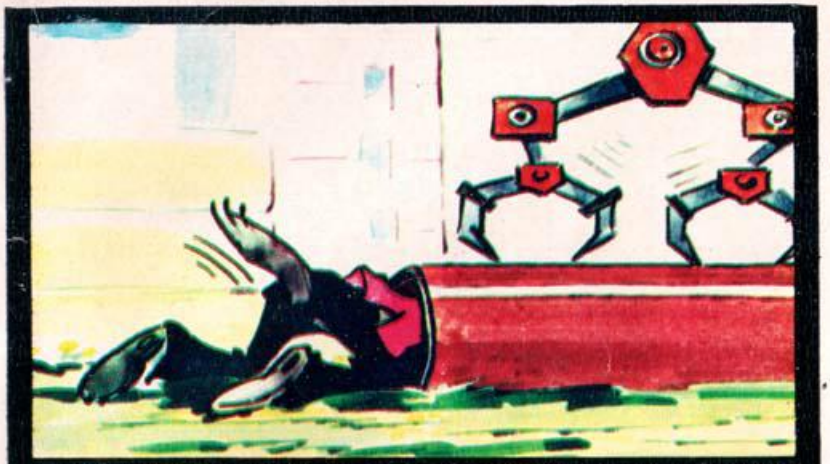

(৭) নেকড়ে ঢুকে পড়ল পাইপে, কিন্তু তা থেকে বেরতে আর পারে না। ওপর থেকে নেমে এল ইস্পাতের আঁকড়া...

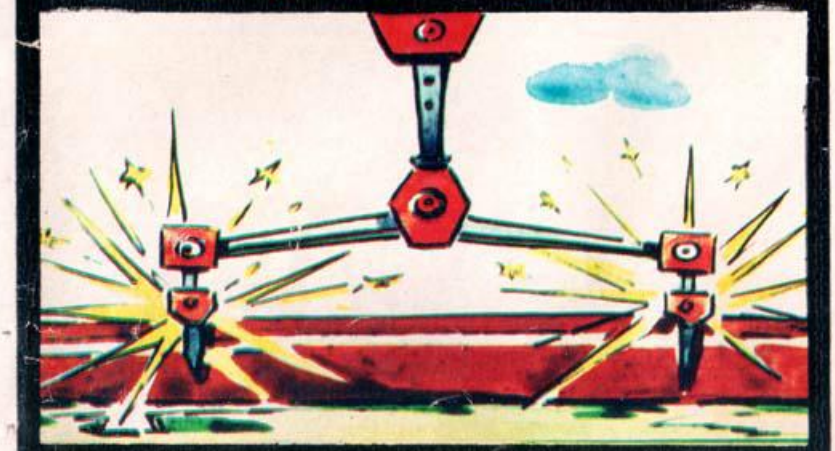

(৮) ছিটকাতে লাগল ফুলকি আর যে পাইপটায় নেকড়ে ঢুকেছিল তাকে জুড়ে দেওয়া হল জল যাবার বড়ো আরেকটা পাইপের সঙ্গে।

(৯) এবার জল ছাড়া যেতে পারে, ঠিক করলে জলহস্তী। কল ঘোরাতেই পাইপে কলকলিয়ে উঠল জল।

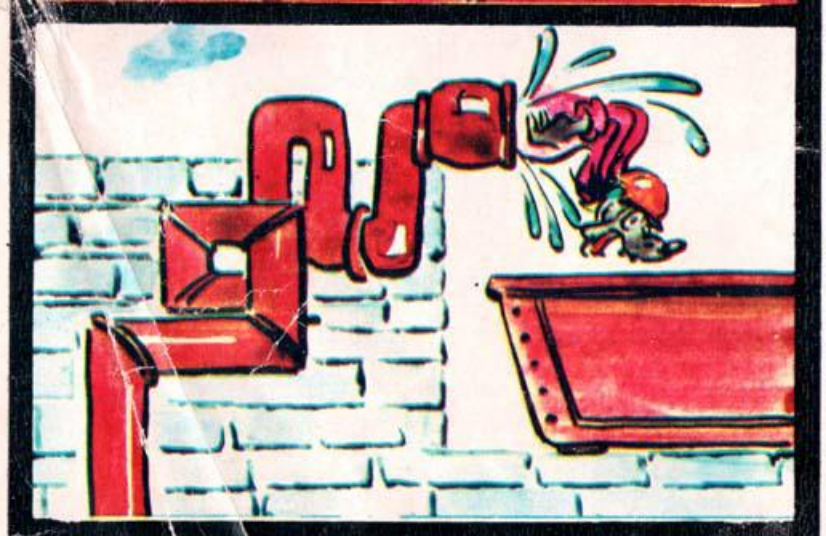

(১০) জলের তোড়ে নেকড়ে গিয়ে পড়ল ওপরতলার কোন একটা বাথরুমে।

(১১) ভিজে জবজবে নেকড়ে, দুর্দশার অন্ত নেই, রাগে ফোঁসে, কিছুতেই নামতে পারে না নিচে...

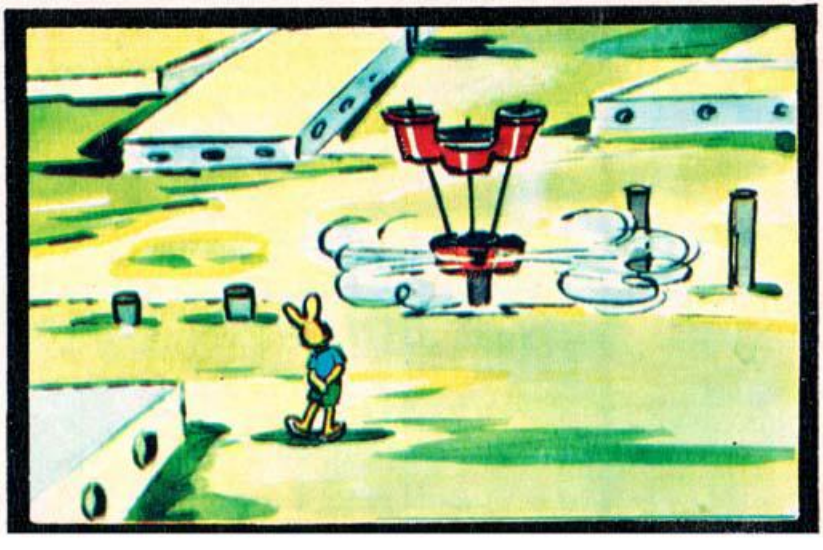

(১২) আর নিচে খরগোশ নিশ্চিন্তে বসে বসে দেখছে পাইল পোঁতা।

(১৩) নেকড়ের ভাগ্য ভালো, এই সময় কাছিয়ে এল একটা ক্রেন। সেও ঝট করে তার হুক ধরে নামতে লাগল নিচে, আগে থেকেই জিব চাটে...

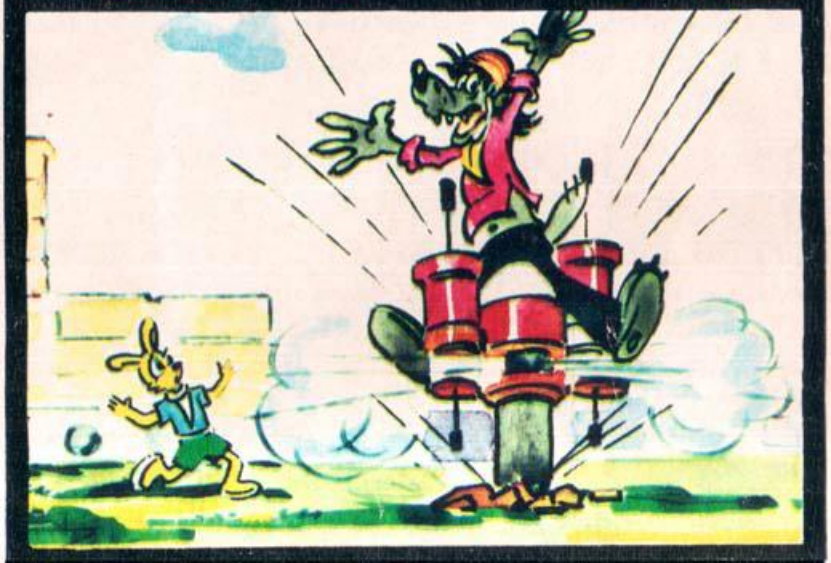

(১৪) ...কেননা ক্রেন তাকে নিয়ে যাচ্ছিল সোজা খরগোশের দিকেই। নামল নেকড়ে পাইল-ড্রাইভারের মাথায়। হাতুড়ি দম দম করে ওঠে-পড়ে। নেকড়েও লাফায় তার সঙ্গে।

(১৫) কাণ্ডটা দেখে খরগোশ তো চম্পট। যাক, বেঁচে গেছি খুব?

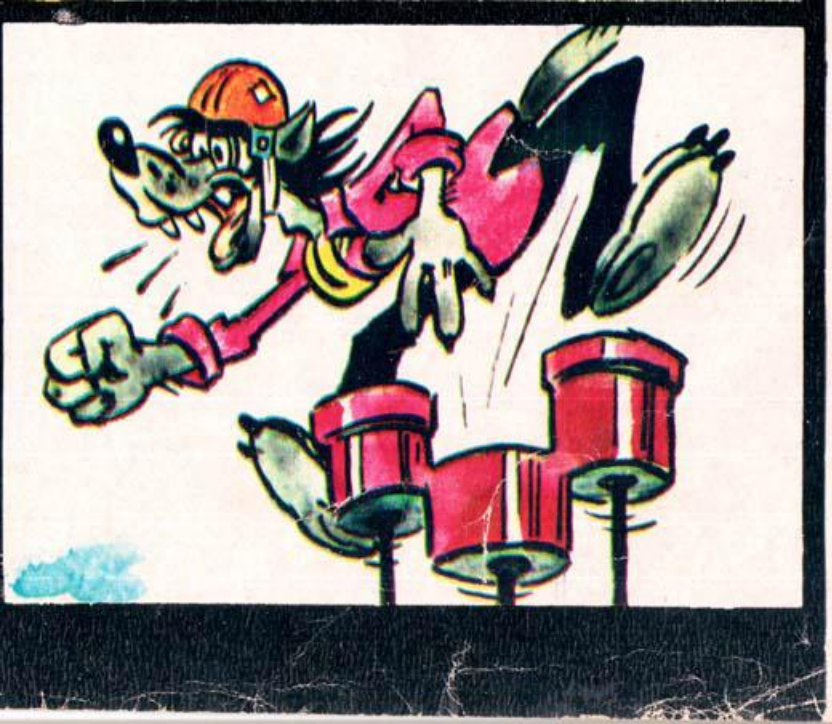

(১৬) নেকড়ে ওদিকে লাফায় আর লাফায়। ওপর থেকে ঝাঁপ দেওয়ার সাহস নেই। ঘুসি পাকিয়ে গাঁ-গাঁ করে উঠল: 'দাঁড়া খরগোশ, দেখাচ্ছি তোকে।' কিন্তু খরগোশ ততক্ষণে বহু দূরে, শাসানিটা তার কানেই গেল না।

রুপোলী খুর

পাহাড়ের দেশ উরাল, বহুকাল থেকেই মূল্যবান মণিরত্নের জন্যে তার নাম, এখানকার কারখানায় আকরিক থেকে গলানো হত লোহা আর তামা। কিংবদন্তিতেও জায়গাটি অসামান্য, সত্যি-মিথ্যে মিশে থাকত তার কাহিনীতে। 'মালাকাইটের ঝাঁপি' নামে উরাল কাহিনীর লেখক পাভেল বাজভের একটি কাহিনী এখানে দেওয়া হল। ছবি এঁকেছেন 'ডায়াফিল্ম' স্টুডিওর শিল্পী র. স্তলিয়ারোভ।

আমাদের এলাকায় ছিল ককোভানিয়া নামে এক বুড়ো। তার ছেলেপুলে কেউ আর টিকে থাকে নি। ভাবলে কোনো একজন অনাথকে পুষ্যি নেবে। অনাথরা যাদের কাছে থাকত, গেল সেখানে। দেখে, ছোটো-বড়ো নানান লোকে কুটির ভরা। চুল্লির কাছে বসে আছে একটি মেয়ে, পাশে বেড়াল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে ককোভানিয়া জিজ্ঞেস করলে:

'আমার সঙ্গে থাকবি খুকি?' 'কিন্তু তুমি লোকটা কে?' শুধায় মেয়েটি। 'আমি শিকারী গোছের। গ্রীষ্মকালে মাটি ধুয়ে ধুয়ে সোনা বার করি, শীতকালে বনে বনে ছুটি ছাগলের পেছনে। সে এক অসাধারণ ছাগল... তবে থাক গে, আমার সঙ্গে থাকবি চল, সব বলব।'

'যাব, তবে এই মুরেনকা বেড়ালটাকেও সঙ্গে নিতে হবে, দ্যাখো কী সুন্দর।'

এইভাবেই ককোভানিয়া দাদু, অনাথিনী দারেন্‌কা আর মুরেনকা বেড়াল থাকতে লাগল একসঙ্গে। সকাল হতেই কাজে বেরুত ককোভানিয়া, ঘরদোর সাফ-সুফ করে রান্না-বান্না করত দারেন্‌কা, আর ইঁদুর ধরত মুরেনকা বেড়াল। সন্ধ্যায় একসঙ্গে জুটত সবাই। বেশ জমত। বুড়ো ছিল গল্প বলতে ওস্তাদ। তবে প্রতিটি গল্পের শেষে দারেন্‌কা মনে করিয়ে দিত: 'ছাগলের কথাটা বলো, কেমন সে?' প্রথম দিকে ককোভানিয়া এড়িয়ে যেত, পরে বললে: 'এ ছাগলের সামনের দিকে ডান পায়ে আছে রুপালী খুর। যেখানে সে খুর ফেলে, সেখানেই দেখা দেয় দামী পাথর। একবার খুর ঠুকলে একটা পাথর, দু'বার ঠুকলে দুটো পাথর, আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে সেখানে একরাশ মণিরত্ন।'

জমিয়ে শীত পড়লে, ককোভানিয়া বনে যাবার তোড়জোড় করলে। ঠেলা স্লেজ গাড়িতে চাপাল শুকনো রুটি, শিকারের রসদপত্র। দারেন্‌কা অমনি মিনতি শুরু করলে: 'আমায় সঙ্গে নাও দাদু, রুপালী খুর হয়ত দেখতে পাব।' 'কী বলছিস, শীতকালে ছোটো খুকিকে নিয়ে বনে যাওয়া যায় কখনো! হিমে জমে যাবি।'

দারেনকা কিন্তু ছাড়ে না: 'তোমার তো হেঁশেল, জানলা সমেত ভালো বালাখানা আছে সেখানে। আমি স্কী-ও করতে পারি খানিকটা।' 'ঠিক আছে, নেব, শুধু বনে কান্না জুড়িস না, সময়ের আগে বাড়ি ফিরবার তাগাদা দিবি না।'

ককোভানিয়া আর দারেন্‌কা বেরতে যাবে, শোনে পেছনে কার মিউ-মিউ ডাক।

দেখে, ছুটে আসছে মুরেনকা বেড়াল। এই ভাবেই তিনজনে পেঁছিল বালাখানায়। দারেন্‌কা বাহবা দেয়: 'ভারি মজা।' ককোভানিয়া সায় দেয়: 'মজা তো বটেই।' আর মুরেনকা বেড়াল চুল্লির কাছে গুটিশুটি মেরে বললে: 'হক্‌ কথা, হক্‌ কথা।'

এ শীতটায় ছাগল ছিল অনেক। তবে সবই সাধারণ জাতের। ককোভানিয়া রোজ একটা-না-একটাকে টেনে আনত বালাখানায়। চামড়া জমল অনেক, কিন্তু ছাগলের মাংস তো আর ঠেলা স্লেজে করে নিয়ে যাওয়া যায় না। ঘোড়ার জন্যে এলাকায় যেতে হল ককোভানিয়াকে।

ককোভানিয়া চলে গেল। রইল দারেন্‌কা আর মুরেনকা। দিনের বেলা ককোভানিয়াকে ছাড়াই থাকতে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আঁধার হতেই ভয়-ভয় করে, দ্যাখে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে মুরেনকা।

বেড়ালকে সঙ্গে নিয়ে শুয়ে দারেন্‌কা ঘুমাল সকাল পর্যন্ত। দিন পোহাল কিন্তু ফিরল না ককোভানিয়া। একঘেঁয়ে লাগছিল দারেন্‌কার, ভাবল মুরেনকার সঙ্গে একটু কথা কইবে, কিন্তু তার পাত্তা নেই। তখন ভারি ভয় পেয়ে গেল দারেনকা, বেড়ালকে খুঁজতে বেরুল ঘর থেকে। চাঁদিনী রাত, জ্বলজ্বলে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দারেন্‌কা দ্যাখে, বেড়ালটা কাছেই, ঘাসকাটা মাঠে বসে আছে, তার সামনে ছাগল। বেড়ালটা মাথা নাড়ে, ছাগলটাও। যেন আলাপ করছে। তারপর ছোটাছুটি শুরু হল। ছুটতে ছুটতে ছাগল থেমে গিয়ে খুর ঠোকে।

অনেকখন এমনি ছোটাছুটি করে ওরা ফিরল বালাখানায়। ছাগল ছাতে লাফিয়ে উঠে ঠুকতে লাগল তার রুপালী খুর। খুর থেকে ফুলকির মতো ঝরে পড়তে লাগল পাথর — লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজা — সবরকমের।

ঠিক এই সময়েই ফিরে এল ককোভানিয়া। নিজের বালাখানাকে আর চিনতে পারে না, একেবারে মনিরত্নের পাহাড়। ওপরে ছাগল, রুপালী খুর ঠুকছে আর কেবলি ছড়িয়ে পড়ছে পাথর। হঠাৎ মুরেনকা দেখা দিল সেখানে। ছাগলের পাশে দাঁড়িয়ে সজোরে মিউ-মিউ করলে, বেড়াল আর রুপালী খুরের ছাগলকে আর দেখা গেল না।

ককোভানিয়া তৎক্ষণাৎ আধ টুপি ভরে মণিরত্ন কুড়িয়েছিল, কিন্তু দারেন্‌কা বললে: 'ছুঁয়ো না দাদু, কাল দিনের বেলায় আরো একবার দেখব।' শুধু সকালে তুষারপাত হল প্রচুর। ঢেকে গেল সমস্ত পাথর। পরে বরফ খুঁড়ে কিছুই পাওয়া গেল না। তবে টুপিতে ককোভানিয়া যা কুড়িয়েছিল তাই যথেষ্ট।

সবই ভালো, শুধু দুঃখ হয় মুরেনকার জন্যে। তাকে আর কখনো দেখা যায় নি, রুপালী খুরের ছাগলকেও। আর ঘাসকাটা যে মাঠটায় ছাগল লাফালাফি করেছিল সেখানে পাথর পেতে লাগল লোকে। বেশির ভাগ সবুজ রঙের। গোমেদ — দেখেছ তো?

বাংলা নতুন বছরের (১৪২১)আর দেরি নেই। তোমাদের সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। এবারের পুরাতনীতে, ঠিক একশো বছর আগে সন্দেশ পত্রিকায় ছাপা একখানা নববর্ষের লেখা দেয়া হল। শতবর্ষের ওপার থেকে বয়ে আসা এই শুভেচ্ছা তোমাদের সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলাম। সঙ্গের ছবিটা এখনকার বানানো।

নুতন বৎসর

ভগবানের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমরা নুতন বৎসরের কাজ আরম্ভ করিতেছি। আমাদের প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের মঙ্গল হউক; এবারে আমরা যেন আরো ভালো করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে পারি।

একটা বৎসর চলিয়া যাওয়া ত সহজ কথা নহে। পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া আমরা এই সময়ের মধ্যে না জানি কোথা হইতে কোথায় চলিয়া আসিয়াছি। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, গত বৈশাখ মাসে আমরা আকাশের যে স্থানে ছিলাম, সূর্যের চারিদিক ঘুরিয়া আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিয়াছি; এই ঘটনাটি ঘটিতে যে সময় লাগিয়াছে তাহাই এক বৎসর। সূর্য এখান হইতে প্রায় ৯২৭৯৬৯৫০ মাইল দূরে, তাহার চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে গেলে প্রায় ৫৮৪০০০০০০ মাইল পথ চলিবার দরকার হয়। এই কাজটি আমরা ৩৬৫(১/৪) দিনে শেষ করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮(১/২)মাইল হিসাবে চলিতে হইয়াছে।

সেকেন্ডে ১৮(১/২) মাইল! কি ভয়ংকর কথা। রেলগাড়ি যদি এত তাড়াতাড়ি চলিতে পারিত, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইতে এক মিনিটও লাগিত না। ২২ মিনিটের মধ্যে সমস্তটা পৃথিবী ঘুরিয়া আসা যাইত (অবশ্য পৃথিবীর চারিদিক বেড়িয়া রেল থাকিলে)।

আসলে কিন্তু পৃথিবীকে ইহার চেয়েও তাড়াতাড়ি চলিতে হইতেছে। সূর্য যদি আকাশের এক জায়গায় স্থির থাকিত্ তবে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর ওই পরিমাণ পথই চলিতে হইত, এ কথা ঠিক। কিন্তু পন্ডিতেরা অনেক পরীক্ষা তথা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য আকাশের একস্থানে বসিয়া নাই, সে বৎসরে চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি মাইল হিসাবে একদিকপাণে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই হিসাবে পৃথিবীকেও সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইতেছে। নচেৎ সূর্য তাহাকে পিছনে অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়া নিজের আলোক লইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে।

ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর কাজ কত কঠিন! বেচারীকে চলিতে চলিতে ক্রমাগত পাক খাইতে হইতেছে, নহিলে আমাদের দিনরাত হয় না। পাক খাইতে খাইতে আবার তাহাকে সূর্যের চারিদিকে চক্কর দিয়া আসিতে হইতেছে, নহিলে আমাদের বৎসর হয় না। এইসব কাজ করিতে করিতে আবার শুধু সূর্যের সঙ্গে থাকিবার জন্য তাহাকে বৎসরে চল্লিশপঞ্চাশ কোটি মাইল করিয়া ছুটিতে হইতেছে, নহিলে আমরা অন্ধকারে পড়িয়া মারা যাই।

সুতরাং পৃথিবী যে বৎসরের শেষে আবার আকাশের একজায়গায় ফিরিয়া আসে এ কথা ঠিক নহে। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে আমরা যেখানে ছিলাম, এখন তাহা হইতে ঢের দূরে আছি। আশ্চর্যের কথা এই যে, এমনভাবে এতদিন ছুটিয়াও পৃথিবী আকাশটাকে পাড়ি দিতে পারে নাই। সে জিনিসটা না জানি তবে কত বড়!

যাহা হউক, এত কথায় আমাদের কাজ নাই;আমরা বৎসরের কথাই বলিতে যাইতেছি। আকাশের যেখানেই থাকি, বৎসরে সূর্যের চারিদিক একবার দেখিয়া আসিতেছি একথা ঠিক। আর, তাহার দরুণ যাহা ঘটিবার কথা, তাহা নিয়মিতরূপেই ঘটিতেছে, সুতরাং আমাদের সংসারযাত্রা নির্বিঘ্নেই চলিয়া যাইতেছে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, এসকল ঋতুর পরিবর্তন কেন হয়? না, পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাই। আরেকদিন তাহার কথা ভালো করিয়া বলিব। আজ শুধু এতটুকু মনে করিয়া দিতেছি যে, এইসকল ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৎসরের হিসাবও আমরা পাইতেছি। শীতকালের দিন কেমন ছোট, আর রাত কত লম্বা; গ্রীষ্মকালের দিন কত লম্বা, আর রাত কত ছোট। এসকল কথা হয়ত তোমরা সকলেই লক্ষ করিয়াছ। মোটামুটি ২১শে ডিসেম্বর সকলের চেয়ে লম্বা রাত আর ছোট দিন হয়। তারপর ক্রমে রাত ছোট আর দিন বড় হইয়া ২০শে মারচ্ দিন আর রাত্রি সমান হয়। তারপর ক্রমে দিন বাড়িয়া, রাত ছোট হইয়া ২১শে জুন সকলের চেয়ে লম্বা দিন আসে। তারপর আবার দিন ছোট আর রাত বড় হইয়া ২২শে সেপ্টেম্বর দিন- রাত সমান হয়। তারপর ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমে রাত লম্বা আর দিন ছোট হইতে থাকে।

এইসকল ঘটনা হইতে বৎসরের হিসাব সহজেই পাওয়া যায়। চৈত্রমাসের শেষদিনকে বিষুবসংক্রান্তি বলে; সেইদিন দিবারাত্রি সমান হইবার কথা। ইহার পরের দিন (অর্থাৎ ১লা

বৈশাখ) হইতে দিন রাত্রির চেয়ে বড় হইতে থাকে, সেইদিন হইতে গ্রীষ্মকাল এবং বৎসরের আরম্ভ ধরা হয়।

দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে ৩০ এ চৈত্র বিষুবসংক্রান্তি হইত বটে কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। পৃথিবীর চালচলনের মধ্যে এমন একটু ঘোরপ্যাঁচ আছে যাহার দরুণ বিষুবসংক্রান্তি ক্রমেই ঠিক বৎসরের শেষ হইবার একটু আগে পড়িয়া যায়। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা এই ঘটনার কথা জানিতেন। কিন্তু এখনকার পঞ্জিকাইয় তাহার আর কোন হিসাব রাখা হয় না। বিষুবসংক্রান্তি আসলে ২০এ মার্চ হইয়া গিয়াছে; সেইদিন দিনরাত সমান ছিল। সেদিনকার বাংলা তারিখ ছিল ৬ই চৈত্র। তার পরের দিন হইতে পয়লা বৈশাখ ধরিতে পারিলে বৎসরের হিসাব ঠিক হইত।

যাহা হউক, সে হিসাব যখন হইবার নয়, তখন আর দুঃখ করিয়া লাভ কি? চলিত হিসাবেই তোমাদের শত বৎসর পরম সুখে কাটিয়া যাউক।

স্মরণীয় যাঁরা

পঞ্চানন তর্করত্ন

উমা ভট্টাচার্য

নৈহাটি শহরের দক্ষিণদিকে ভাটপাড়া গ্রাম দু-তিনশ বছর আগে থেকেই সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ভারতখ্যাত ছিল। আর ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণদের নিয়ম-নিষ্ঠার খ্যাতি এতটাই ছিল যে, বেশি নিয়মমানা লোকজনকে লোকেরা ডাকত "ভাটপাড়ার ভটচার্যি'' বলে। এই ভাটপাড়ারই এক নিষ্ঠাবান পন্ডিত নন্দলাল বিদ্যারত্নের অভাবের সংসারে জন্মগ্রহণ করেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য। ভাটপাড়ার পন্ডিতেরা বিনা বেতনে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। বিদ্যার্থীদের ভরণপোষণও করতেন। বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ নেওয়াকে এঁরা পাপ মনে করতেন।

জন্ম থেকেই পঞ্চানন সংস্কৃত শিক্ষার আবহাওয়ার মধ্যেই বড় হয়ে উঠছিলেন। বিদ্যার প্রতি ছিল অসম্ভব আগ্রহ। সাত বছরেই উপনয়নের পর গৃহদেবতার পূজা করতে হত। তখন পরিচয় ঘটছিল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে। প্রতি শ্লোকের অর্থ যথার্থ অনুধাবন না করে ক্রিয়াকর্ম করতে মন সায় দিতনা তাঁর। অসম্ভব মেধাবী আর স্মরণশক্তির অধিকারী বালক টোলের ছাত্রদের পড়ানো শুনে শুনেই অনেকটা শিখে নিয়েছিলেন, বাবার কাছেও কিছু কিছু সংস্কৃত ব্যকরণ শিখছিলেন।

কিন্তু বিধি বাদ সাধল শিক্ষায়। এক দিনেই বাবা আর মা মারা গেলেন,অনাথ করে গেলেন সহায় সম্বলহীন আট বছরের বালকটিকে। এই অবস্থায় হাল ধরলেন বাল্যবিধবা এক কাকিমা। বিধবা হওয়ার পর থেকেই তাঁর ঠাঁই হয়েছিল বাপের বাড়িতে। অনাথ বালকের ভার তুলে নিতে, আর শ্বশুরের বংশের শিবরাত্রির সলতেটি জ্বালিয়ে রাখতে তিনি চলে এলেন শ্বশুরঘরে। মায়ের অভাব পূরণের দায়িত্ব নিলেন স্বেচ্ছায়। খাদ্যের আর সামান্য অর্থের ব্যবস্থা করতে প্রতি মাসেই বালকের হাত ধরে যেতেন বারাসতে মুসলমান রায়ত প্রজাদের কাছে। সেখানে যজমানদের কাছ থেকে দানে পাওয়া কয়েকবিঘা জমি ছিল পঞ্চাননের বাবার। চাল, কলাই, গুড়, শাক-সবজি যা কিছু মুসলমান প্রজারা দিত তাই দিয়েই কোনমতে দিন চলত। নন্দলাল ন্যায়রত্নের চুঁচুড়াবাসী শিষ্য 'সোমপরিবার' মাঝে মধ্যে এসে গুরুপুত্রকে কিছু সাহায্য করে যেতেন, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই।

বালকের বিদ্যাশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলেন না কাকিমা। তবে তাতে কী? সে ছেলে নিজেই অনেক তৎপর। তাঁদের বাড়ির কাছেই ছিল তখনকার সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রের নামকরা পন্ডিত জয়রাম ন্যায়ালঙ্কারের টোল। বহু ছাত্র সেখানে থেকে পড়াশোনা করত। বালক পঞ্চাননের ইচ্ছা হতো তাঁর কাছে পাঠ নেবার। বাড়ির বাইরে বসে

শুনতেন জয়রামের পাঠদান। শুনে শুনে অনেক শ্লোক আর কাব্য তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একদিন সুযোগ বুঝে দুপুরে স্নানে যাবার পথে ধরলেন পন্ডিতকে। তাঁর কাছে শিক্ষালাভের ইচ্ছা জানালেন। নয় বছরের বালক নিজের লেখা একটি শ্লোকও শোনালেন তাঁকে। ছোট ছেলেটির মুখে সেই শ্লোক আর নানা বুদ্ধির প্রশ্ন শুনে জয়রাম তাঁকে বললেন যে, টোলের পড়াশোনার পরে দুপুরে তিনি যখন খেতে বসবেন তখন পঞ্চানন যেন তাঁর বাড়িতে আসেন। তাঁর খেতে বেশ সময় লাগত। অতএব সেই সময়েই তিনি মুখে মুখে তার সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দেবেন, কারণ টোলের বড় বড় ছাত্রদের সঙ্গে তো তাকে পড়ানো যাবেনা।

শুরু হল বিদ্যাচর্চা। অসাধারণ যুক্তি আর মননশীলতার অধিকারী বালক পঞ্চানন গুরুকে নানা জটিল প্রশ্ন করে অনেক পাঠের বাইরেও অনেক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মুখে মুখে শুনে কালিদাস, ভবভূতি,ভট্টিকাব্য,ব্যকরণ,অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক কিছুই মুখস্থ করে নিলেন আর সেগুলি তালপাতার পুঁথিতে লিখে রাখতেন। সেগুলিই তাঁর বই হয়ে গেল(স্মৃতি থেকে তাঁর সহস্তে লেখা সেই পুঁথিগুলি তাঁর পরিবার নৈহাটি বঙ্কিম গবেষণাগারে দান করে দিয়েছেন।)

তাঁর যখন এগারো বছর বয়স তখন তাঁর বিদ্যালাভের সহায় জয়রাম ন্যায়ালঙ্কারের মৃত্যু হল। এতদিন যা শিখেছেন , এমনকি ‘পাণিনি’ পর্যন্ত তাঁর শেখা হয়ে গিয়েছিল সেই বয়সেই, সেই জ্ঞান সম্বল করে চলল তাঁর উচ্চতর জ্ঞানের সাধনা।(এই পরম দয়ালু গুরু জয়রাম ন্যায়ালঙ্কারের জীবনী আর সাহচর্যের কথা তিনি বড় হয়ে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশ করে গুরুঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছিলেন)।

এদিকে সংসারে অভাব তীব্র, যজমানিতে আয় বড়ই কম। দুটি অন্নের যদি বা ব্যবস্থা হয়, পরবার কাপড় জোটেনা। ষোল বছরের কিশোর পঞ্চাননকে কাকিমা একদিন ডেকে বললেন, “বাজারে দেনা অনেক, এবার কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করো।’’ সেই সময় নানাজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে, তাদের সাহায্য নিয়ে গণিত আর ইংরাজি অনেকটা শিখে ফেলেছেন পঞ্চানন। ইতিমধ্যে পন্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের কাছে পাঠ নিয়েছেন, আর মুখস্থ করে ফেলেছেন ন্যায়শাস্ত্রের প্রাথমিক পুঁথিগুলি। রাখালদাস ন্যায়রত্নের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ছিল মধুর সম্পর্ক। তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে, অনুরোধ করলেন ছেলেটিকে একটি অধ্যাপকের চাকরি দিতে। একটি প্রবচন নিয়ে বিদ্যাসাগর মশাই রাখালদাস ন্যায়রত্নের কাছে একটি কূট প্রশ্নের মীমাংসা জানতে চাইলে অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে যুবক পঞ্চানন সেটির যথাযথ অর্থ করে দিলেন।

তাঁর চাকরি হয়েও যেত, কিন্তু কলকাতার স্কুল চলত ইংরেজি নিয়মে, উপস্থিতির সময় ছিল সকাল দশটা। যেটা ভাটপাড়া থেকে প্রতিদিন গিয়ে করা তখনকার দিনে অসম্ভব। ফলে তিনি সে কাজ নিলেন না। ফিরে এলেন। এদিকে কাকিমা সেই বছরেই তাঁর বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা কলেজের অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মাধ্যমে সেই কলেজে ধর্মশাস্ত্র পড়ানোর জন্য অধ্যাপকের কাজ জুটে গেল। কিন্তু মাইনে নিয়ে চাকরি করাতে, বিশেষত ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় স্থাপিত কোনও সংস্থাতে মাস মাইনের চাকর হতে তাঁর নিজের ঘোর আপত্তি। সুপন্ডিত হিসাবে পরিচিতিও তখন হয়েছে কিছুটা। কাজের সন্ধানে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গেলেন ভাগ্যের অণ্বেষণে পশ্চিমভারতে।

তখনকার দিনে, বিশেষত দেশে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ শুরু হওয়া থেকে অনেক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ চাকরি করতে চলে যেতেন ভারতের স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিতে।

তাঁর বাবার শিষ্য ভাটপাড়ার এক কবিরাজ অমৃতলাল রায় ছিলেন ইন্দোরের রাজার সভাবৈদ্য। তাঁর ঠিকানায় গিয়ে উঠলেন। বললেন এখানে চতুষ্পাঠী করবেন। অমৃতলালের মাধ্যমে পরিচিত হলেন রাজার সঙ্গে। রাজসভায় 'ন্যায়শাস্ত্রের শব্দশক্তি' বিষয়ে পণ্ডিতদের ডাকা বিতর্কসভায় অংশ নিলেন। আর 'শব্দের চলনের মাধ্যমের' বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন, আর প্রমাণ দিলেন 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' গ্রন্থ থেকে। রাজা মহাখুশি হয়ে পুরষ্কার দিলেন হাজার টাকা, একটি শাল, একটি উষ্ণীষ,আর দিলেন পথের খরচ। এরপর গেলেন গুজরাটের 'থার'এ। থারের বিখ্যাত পন্ডিত গণেশ উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় চতুষ্পাঠী খোলবার সুযোগ পেলেন। শাস্ত্রালোচনার সাফল্যস্বরূপ প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেন। এরপর এলেন বাড়িতে। কাকিমার হাতে অর্থ তুলে দিলেন, পালাবার জন্য প্রচুর বকাও শুনতে হল। অসুস্থ কাকিমা বিয়ে দিলেন আঠারো বছরের ছেলেকে।

সময়টা ১৮৮৩/১৮৮৪ সাল হবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হতে এক বছর বাকি। অর্থাগমের সুযোগ এল। চাকরির মাইনে নয়, মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে সাম্মানিক বৃত্তির মাধ্যমে। সেইসময় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার একটি শাস্ত্র প্রকাশণের মুদ্রণ বিভাগ খোলা হয়। সেই বিভাগের জন্য একজন পন্ডিত সম্পাদক প্রয়োজন হলে অনেক পন্ডিতের মধ্যে থেকে তিনি নির্বাচিত হলেন। একই সময়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেটে উত্তরাধিকের আইন নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে শ্রেষ্ঠতার বিচারে ১০টাকা পুরষ্কার পেলেন। এছাড়াও মাসিক ১০ টাকা হিসাবে একটি বৃত্তি দেওয়া হল। এই ৪০ টাকা বৃত্তির টাকা দিয়ে শুরু হল এই নির্লোভ পন্ডিতের জীবনের অভিযান। বাড়িঘর তৈরি করলেন, ছেলেদের যুগোপযোগী বিদ্যায় শিক্ষিত করলেন, কিন্তু বাইরে খাওয়া বা চাকরি করা ছিল নিষিদ্ধ। নিজে সাত্ত্বিক ছিলেন। কিন্তু পরিবর্তনশীল যুগের আবহাওয়া বা রাজনীতি থেকে দূরে থাকেননি।

বঙ্গবাসী আর সন্ধ্যা পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষদিক থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের ছোঁয়া লেগেছিল ভাটপাড়ার রক্ষনশীল পণ্ডিত মানুষদের মনেও। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে সকলে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও পরোক্ষে অংশ নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের অন্যতম পঞ্চানন তর্কালঙ্কার। জন্মভূমি পত্রিকা আর বঙ্গবাসী পত্রিকার শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে থাকার সময় জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্য, সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদের উদ্দীপিত করতে লিখেছিলেন দুটি সংস্কৃত নাটক- চিতোরের রাণা অমরসিংহের স্বাধীন থাকার জীবনসংগ্রাম নিয়ে লিখেছিলেন 'অমরমঙ্গলম'। আর মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র অবলম্বন করে লিখেছিলেন 'কলঙ্কমোচনম'।

ক্রমে পরিচিত হচ্ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে, জাতীয় স্তরের নেতাদের সঙ্গে। ১৯০৭ সাল নাগাদ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। আর পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষ বসুর নির্দেশে এই সভার তরফে 'তারকেশ্বরের মোহন্ত'দের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেন। ভাটপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির আদলে স্থাপিত সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন তিনি। এখানে ছেলেদের লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, নানারকম শরীরচর্চা করানো হত।

ইংরেজবিরোধী কাজে জনজাগরণের চেষ্টা, আর অনুশীলন সমিতির কর্তা হিসাবে বিপ্লবী কাজকর্মে মদত দেবার অভিযোগে ১৯০৮ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁকে রাখা হয়েছিল আলিপুরের হরিণবাড়ি জেলে। এ যেন শাপে বর হল তাঁর। সেখানে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হল। আলিপুরের বোমার মামলায় বন্দী অরবিন্দ ঘোষ সহ আরও ছয়জন বাঙালি

বিপ্লবী ছিলেন সেখানে। ছিলেন উল্লাসকর দত্ত, উপেন বাড়ুজ্যে, ফাঁসীর আসামী বিপ্লবী কানাই দত্ত। এইখানে একটি তক্তপোষে বসে তাঁদের সঙ্গে করতেন শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যেই গুলি করে মারার অপরাধে কানাই দত্তের ফাঁসি হুকুম হয়েছিল।এখানেই তিনি কানাই দত্তকে নির্ভয় দিতে স্মৃতি থেকে শুনিয়েছিলেন 'গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়টি।

সাত্ত্বিক এই ব্রাহ্মণকে পুলিশ বেশিদিন হাজতে রাখতে পারেনি। কারণ জেলে শুধু গঙ্গাজল আর সামান্য কাঁচা দুধ ছাড়া আর কিছুই খেতেন না তিনি। বাধ্য হয়ে তাঁকে পুলিশ চারদিন পরে তাঁকে মুক্তি দেয় কিন্তু দীর্ঘ ষোল বছর তাঁর উপর গোয়েন্দা নজর ছিল পুলিশের।বঙ্গবাসী পত্রিকায় লেখা তাঁর অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধের বক্তব্যই পুলিশের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক করেছিল।

আবার এই তর্করত্ন মশায়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নোবল প্রাইজ' পাওয়ার আনন্দে আপ্লুত হয়ে কবির উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন আর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে গিয়ে হাজির হন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে নিজের হাতে সেটি কবির হাতে দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছিলেন। দেশাত্মবোধের পরিচয় যে কতভাবে তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই মানুষটিই আবার 'সরাবেন' জেলে বন্দী গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন আর স্পষ্টবক্তা এই ব্রাহ্মণ গান্ধীজির অহিংসা মন্ত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অসারতার বিষয়ে তাঁর ভিন্নমত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি।

বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য চুঁচুড়া আর বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত ছিল তাঁর। যাতায়াত ছিল চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্গে ও অন্যান্য অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে। কলকাতার রাস্তার পাশে মন্দির থেকে হিন্দু দেবপ্রতিমা সরানোর প্রতিবাদ করতে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাইকোর্টের অ্যাটর্নি দেবেশ মুখার্জিদের সঙ্গে তিনিই গিয়েছিলেন লাটসাহেব জ্যাকসনের কাছে। তাঁর আবেগরুদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ কথায় বিচলিত সাহেব তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, "পন্ডিত তুমি কালই দেখিবে যে শিবলিঙ্গ যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।"

এই প্রতিবাদী মানুষটিই ভিক্টোরিয়ার ৫০তম জন্মদিনে আটজন ভারতবিখাত পন্ডিতের সঙ্গে প্রাপ্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ত্যাগ করেন সারদা আইনের প্রতিবাদে।

আমাদের বাংলাদেশের এই অখ্যাত অঞ্চল থেকেই যে এই মানুষটি প্রথম স্বদেশী হিসাবে জেলে গিয়েছিলেন তা আমাদের অনেকেই জানেনা। সারা জীবন শিক্ষাবিস্তারের কাজ করে গেছেন, আর করে গেছেন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই কিন্তু চাকরি নেবার কথা কোনদিন ভাবেননি আর ছেলেদেরও চাকরি করার অনুমতি দেননি। আচারনিষ্ঠ থেকে গেছেন নিজের প্রাত্যহিক জীবনে। এঁরই সুযোগ্য পুত্র ছিলেন ভারতবিখ্যাত পন্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

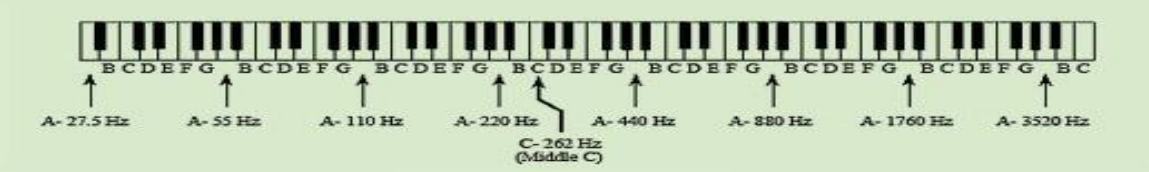

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

Link for soundclips: http://youtu.be/tqCTBsqWKw4
http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug

আগেরবার পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে' র ' হিন্দুস্হানী সঙ্গীত পদ্ধতি–ক্রমিক পুস্তক মালিকা' সম্পর্কে কথা হয়েছিল। এবার ঐ বই থেকে কিছু কিছু অংশ ব্যবহারিক ভাবে শেখার জন্য দেওয়া হল।

লেখাটা যখন বের হবে তখন বসন্তকাল বলে এবারের জন্য ' বাহার' রাগটিকেই বেছে নেওয়া হল।

ভাতখন্ডে- জী' র লেখার সময় থেকে এই রাগের নানা পরিবর্তন হয়েছে - আমরা ঐ লেখা থেকে আগের বাহার রাগ ভাবনাটাও জানব, আবার এখনকার রূপও দেখব।

আমরা কয়েকটি বাহার রাগ ভিত্তিক জনপ্রিয় গান শুনে নেব - তাহলে সুরের চলনটা মনে রাখতেও সুবিধে হবে। এইসব গানের ইউ- টিউব লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হল।

১) এ কি আকুলতা ভূবনে (রবীন্দ্রসঙ্গীত) http://www.youtube.com/watch?v=awwwtLCLasc
২) বাগ লাগা দুঁ সজনী (তানসেন) http://www.youtube.com/watch?v=Id3WgdaCz6I
৩) সাজ হো তুম আওয়াজ হুঁ ম্যয় (সাজ ঔর আওয়াজ) http://www.youtube.com/watch?v=FmgisDxvh9c
৪) ছমছম্ নাচত আঈ বাহার (ছায়া) http://www.youtube.com/watch?v=FmgisDxvh9c

বাহার নামটি মূলতঃ দুটো প্রায় সমার্থক ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে - উৎফুল্লতা আর আনন্দ। বসন্তকালে প্রকৃতির আনন্দের প্রকাশ ফুল ফোটানোয় - মানুষ স্বরের মাধ্যমে সেই আনন্দ অনুভব করার চেষ্টা করে। শব্দই যেহেতু সকল সৃষ্টির মূল আকর, তাই যে স্বর- কম্পনে ফুল সৃষ্টি হয় বসন্ত কালে, যদি সেই স্বর- কম্পন কন্ঠে বা যন্ত্রে ধরা যায়, তাহলেই শিল্পী ও শ্রোতার মনেও ফুল ফুটবে।

ভাতখন্ডে- জী' র লেখায় প্রাচীন কালের লেখকদের এই রাগ সম্পর্কে বর্ণনা উল্লেখ করা আছে। যেমন 'অভিনবরাগমঞ্জরী'- তে পাওয়া - 'ন্স জ্ঞম পজ্ঞমধ নর্স ণপ মপ জ্ঞম রস' (কোমল গা আর কোমল নি যথাক্রমে জ্ঞ আর ণ এই ভাবে লেখা হয়) সংযোগে রাত্রিগেয় রাগ বাহার হয়; 'রাগচন্দ্রিকাসার' অনুযায়ী 'রিধতীবর কোমল নিগম উতরত ধৈবত দার, সম সম্বাদীবাদী হ্যয় সমঝো রাগ বাহার' । বাহার রাগের উৎপত্তি কাফি ঠাট থেকে, বাদী স্বর মধ্যম(মা), সম্বাদী ষড়জ(সা)। আরোহ শুদ্ধ নিষাদ(নি) প্রয়োগ হয়। মধ্যম ও ধৈবত(ধা) স্বর- সঙ্গতি এই রাগের অত্যন্ত মনোহর রূপে দেখা দেয়। যদিও মধ্যরাত পরিবেশনের সময় হিসবে উচিত বলা আছে, আবার এও বলা আছে যে বসন্তকালে যে কোন সময়েই এই রাগ গাওয়া যেতে পারে। আরোহে রিষভ(রে) আর অবরোহে ধৈবত(ধা) ব্যবহার না করলে এই রাগের জাতি হয় - ষাড়ব- ষাড়ব (অর্থাৎ আরোহনে ও অবরোহনে ছয়টি স্বর)। কিন্তু কখনও কখনও খেয়াল গাইবার সময় জলদ তান নিতে গিয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন। কোন কোন খেয়াল গায়ক তো ধা ও গা' র শুদ্ধ ও কোমল ও ব্যবহারও করেন, বিবাদী স্বর (এক্ষেত্রে যেমন শুদ্ধ গা ও কোমল ধা) রাগের অঙ্গহানি না করে কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করা এক গভীর অনুভবের বিষয় বলে শিক্ষার্থীদের নিয়ম মেনেই শেখা ভাল। অনেক মরমীয়া গুণী বলেন এ রাগে অবরোহণে ধা এবং গা দুটি স্বরই বর্জন করা উচিত। ণ ধ প, ম প জ্ঞ ম, ধ, ন র্স এই স্বরগুচ্ছ এই রাগে বারবার ফিরে আসে।

যদিও এই রাগটির বাগেশ্রী রাগের, কানাড়া অঙ্গের সাথে মিল আছে, তবু একে সন্তর্পণে আলাদা করে কাফি ঠাটেই রাখার চেষ্টা করার কথা বলেছেন গুণীজনেরা। অর্থাৎ যেহেতু কাফি ঠাটে শুদ্ধ নি নেই, তাই এই স্বরটি ব্যবহার সাবধানে করা উচিত। "জ্ঞমরস" স্বরগুচ্ছ- বাহার- এ থাকলেও বাগেশ্রী তে ব্যবহার হয় না। বাহার- এ যদিও সাধারণতঃ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পঞ্চম স্বরটি আরোহনেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অবরোহনে পঞ্চম স্বর

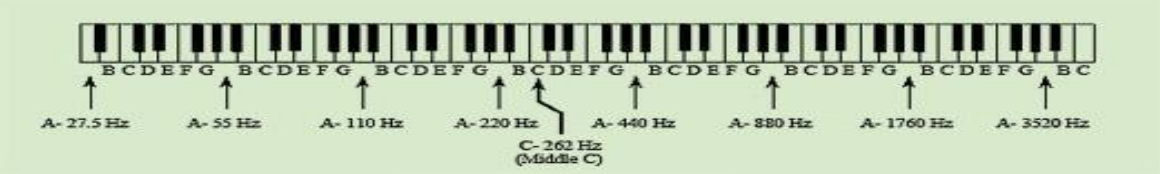

সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

Link for soundclips: http://youtu.be/tqCTBsqWKw4
http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug

ব্যবহার করতেই হয়। মধ্যম ও ষড়জ এই রাগের বাদী ও সম্বাদী স্বর বলে সাধারণতঃ মানা হয়। মণধনর্স স্বরগুচ্ছ বাহার- এর রূপ প্রকাশে প্রায়শঃই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ নি স্বরে বেশী জোর দিলে রাগের অঙ্গহানি হবে। মধ্য ও তার সপ্তকেই এ রাগের বেশী বিচরণ। আনন্দময়তা এই রাগের মূল ভাব হওয়াতে দ্রুতলয়েই রূপটি ফোটে বেশী। অনেকে অবশ্য এই রাগটিকে পূর্ণ রাগের মর্যাদা দিতে কুন্ঠিত। তাঁদের মতে আড়ানা, বাগেশ্রী, ভৈরব, বসন্ত এই সব রাগ থেকে যদিও অনেক চটুল রচনার সৃষ্টি হয়েছে, সে সব রচনা পরিপূর্ণ রাগ নয়, বরং সেগুলিকে বলা চলে আড়ানা- কি- বাহার, বাগেশ্রী- কি- বাহার, মালকোষ- কি- বাহার, বসন্ত- কি- বাহার ইত্যাদি। বাহার রাগ যখন অন্যান্য অনেক রাগের সাথে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হয়, তখন বাহার সত্যিই বাহারি রং ছড়ানোর কাজ করে, যেমন মিশ্র রাগ বসন্ত- বাহার, মালকোষ- বাহার, সাহানা- বাহার, হিন্দোল- বাহার ইত্যাদি।

ঠাট - কাফি (স র জ্ঞ ম প ধ ণ র্স)
জাতি - ষাড়ব- সম্পূর্ণ (আরোহনে ছয় স্বর - অবরোহে সম্পূর্ণ সাতটিই স্বর)
আরোহণ - ণ্- স- ম, প- জ্ঞ- ম, ম- ণ- ধ, ন- র্স
অবরোহণ - র্স- ণ- প- ম- প- জ্ঞ- ম- র- স
পকড় - সম- মপজ্ঞম- মণধনর্স (রাগরূপ প্রকাশী বিশেষ স্বরগুচ্ছ বা রাগস্বরূপ)

গানের যে উদাহরণগুলো আগের পাতায় দেওয়া আছে, সেখান থেকে এ কি আকুলতা ভূবনে গানটির স্বরলিপি নিচে দেওয়া হল।

				2				3				0			
		ধ	ধ	ধ	ণধ	প	ম	মপ	-	জ্ঞ	-	ম	জ্ঞ	ম	জ্ঞ
		এ	কি	আ	0	কু	ল	তা	0	0	0	0	0	0	0
1															
জ্ঞণ	-	ধ	-	-	-	ন	ন	নর্স	-	-	-	-	-	র্স	র্স
0	0	0	0	0	0	ভূ	ব	নে	0	0	0	0	0	এ	কি

স্বরলিপি সুত্র: শান্তিদেব ঘোষ- রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা - Rabindra Sangeet Miscellany By Śāntideba Ghosha**,**
ভাষান্তর - মোহিত চক্রবর্তী

দীন মহম্মদ

ভারত ভ্রমণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
ঘুরে বেড়ানো এক দেশীয় কর্মচারীর ভ্রমণআলেখ্য

পর্ব-২

অনুবাদ: শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

মিস্টার বেকারের সাথে চলে আসার ছ সাত মাস পর আমার মা ওকে একখানা চিঠি দিলেন। মা মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না এই ভেবে যে তার সন্তান তাকে ছেড়ে একজন ইউরোপিয়ানের তত্ত্বাবধানে থাকবে। সুতরাং তিনি অনুরোধ করে পাঠালেন, তার ছেলেকে যেন পত্রপাঠ ফেরৎ পাঠানো হয়। মায়ের কাতর আবেদন শুনে মিস্টার বেকার আমাকে মায়ের সামনে তলব করলেন। সজ্ঞানে আমাকে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন এমনটা তিনি চাননি আবার এও বিলক্ষন জানতেন যে আমার ঝোঁক কোনদিকে। মায়ের উপস্থিতি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। তবুও বেকারের মতো সহৃদয় বন্ধুর প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা বাপ মায়ের প্রতি কর্তব্যের প্রাধান্যকে ছাপিয়েই গেল। মাকে বললাম বটে, ফিরে যাবো না, ক্যাম্পেই থাকতে চাই কিন্তু মায়ের দুঃখে বুকের ভেতরটা মুচড়েও উঠল। মা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখের জল নিঃশব্দে তাঁর দুগাল বেয়ে পড়ছিল। আমার বুকের ভেতরটা খান খান হয়ে যাচ্ছিল। আমার থেকে যাওয়াটা নিয়তির বিধান মেনে নিয়ে মা ফিরে চললেন। যে ব্যথা নিয়ে মা ঘরে ফিরে গেলেন তা বর্ননা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মিস্টার বেকারও খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি আর তার সঙ্গী অফিসারেরা আমার মন ভালো করার জন্য নানানরকম আনন্দের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। প্রতিদিন সকালে সৈন্যবাহিনির মানুষদের নতুন নতুন কী কী সংযোজন হল ময়দানে নেমে সেইসব দেখতেন তারা। আমার পরনে সেসময় পুরোদস্তুর সৈনিক উর্দি থাকত। ক্যাপ্টেন গ্রেভলি, বিশেষ করে, খুব পছন্দ করতেন আমায়। সবসময় দেখা হলেই আমার কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। এতটা মনোযোগ আমার মনের দুঃখ কষ্ট ক্রমশ ভুলিয়ে দিয়েছিল। বিশেষত মায়ের সঙ্গে দেখা হবার পর। যখন আমার আমার মন খুবই খারাপ। বেচারি মা আমার; মায়ের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যে আমি ফিরে গেলেও যেতে পারি। এই ভেবে দাদাকে একবার পাঠালেন তার হয়ে মিস্টার বেকারের কাছে দরবার করতে। সঙ্গে চারশ টাকাও দিলেন ওকে দেবার জন্য। মা ভেবেছিলেন এভাবে হয়তো আমাকে ফেরাবার একটা উপায় হলেও হতে পারে। এমন ব্যাপারে টাকা নিয়ে কাজটা করা মিস্টার বেকারের মতো মানুষের কাছে স্বপ্নেরও অতীত। তিনি তো সেটা গ্রহণ করলেনই না উলটে সেটা ফেরৎ দিলেন আমার মাকে দেবার জন্য। সেইসাথে তার লোকেদের যথাযথ নির্দেশ দিলেন আমি যাতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি। তার নিজস্ব পালকিবাহকেরা আমাকে তার পালকিতে নিয়ে চলল।

মায়ের কাছে পৌঁছে আমি চারশ টাকা ফেরৎ দিলাম। মা তো কিছুতেই সেটা নেবেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করার পরেও না নেওয়াতে আমি বললাম যে ওই টাকা না নিলে আমি আর কখোনো আসব না। একরকম সেই ভয়েই মা রাজি হলেন। আর আমিও বলে এলাম যে সময় সুযোগ পেলেই আমি দেখা করতে আসব। মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে পালকি চড়েই ক্যাম্পে ফেরৎ এলাম।

বাঁকিপুরে ছ মাস মতো কাটানোর পর কর্নেল লেসলির কাছ থেকে আদেশ পেলাম দেনাপুর যাবার। সেটা ১৭৭০ সাল। দেনাপুরে বাকি ইউরোপিয় সেনা ও দেশী সেপাইদের সঙ্গে দেখা হল। ওরা ওখানে অনেক আগে ঘাঁটি গেড়ে ছিল। এখানে আমাদের ক্যাম্পে আটটা রেজিমেন্ট ছিল। দুটো ইউরোপিয় ও ছটা দেশীয় সেপাই দল। বাঁকিপুর থেকে দেনাপুর আট মাইল দূর। এখানে বলার মতো একটা দুর্গ আছে। মাটি দিয়ে বানানো। দুর্গের ওপর জলের দিকে মুখ করে বেশ কয়েকটা কামান বসানো। দুর্গের ভেতর চমৎকার ব্যারাক, সম্ভবত ভারতে প্রথম। সেখানে পুরো সৈন্যবাহিনীর সকলের জন্য থাকার ব্যবস্থা তৈরিই ছিল। ব্যারাকটা একটা চৌকো পাকা বাড়ি, গঙ্গার পাড়ে রাস্তার দুপাশ জুড়ে বানানো। পূর্বে, নদীর উল্টোদিকে ক্যাপ্টেনের অ্যাপার্টমেন্ট। তার মধ্যে দুটো

শোবার ঘর, একটা খাবার ঘর। তার সাথে ব্যারাকের পেছন দিকটাতে গোছানো অফিসঘর, আস্তাবল আর রান্নাঘর। ওই বরাবর আরও খানিক দূরে সৈন্যাধ্যক্ষের বাসস্থান। সুন্দর অভিজাত বাড়ি একখানা, আশপাশে কয়েক মাইল অবধি পরিষ্কার নজরে আসে। বাড়িটা সবচেয়ে ভালোভাবে তৈরী আর উৎকৃষ্টভাবে সাজানো। ওঠার জন্য সুন্দর কয়েকধাপ মার্বেলের সিঁড়ি। পর্যাপ্ত কাজের লোক। ওই সারিতেই উত্তর দিকে ব্যারাক থেকে মোটামুটি দূরত্বে একটা হাসপাতাল। চৌহদ্দির বাকি কোণগুলোতে কামান বসানো। সকাল ও সন্ধ্যায় ফ্ল্যাগ তোলা ও নামানোর সময় কামান দাগা হত। দুর্গের একপাশে গোলন্দাজদের ব্যারাক, তাদের রসদ। পশ্চিমে পদাতিকদের আর উত্তরে ডাক্তার ও নীচুতলার অফিসারদের থাকার জায়গা। এরও মাইলটাক দূরে দেশীয় সেপাইদের বাসস্থান।খানিকটা জায়গা ছেড়ে ঘোড়াদের আস্তাবল। এই ছিল বাঁকিপুরের ক্যাম্প।

জেনারেল- এর প্রাসাদের চেয়ে ভালো বোধকরি পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না। প্রাসাদের সামনে পেছনে নুড়ি বিছানো পথ। সেখানে সৈনিক আর চাকরেরা ফাঁকা সময়ে ঘুরেটুরে বেড়াত। একটা মাটির বেদি ছিল বসবার। উত্তর দক্ষিণ বরাবর একটা রাস্তা আর পূর্ব পশ্চিম বরাবর আরেকটা। দুটো রাস্তা একটা আরেকটাকে কাটাকাটি করেছে। আশপাশের এলাকা জুড়ে গ্রামের বাড়িঘরদোর ভিটেমাটি ছড়ানো। জমিতে দিব্যি সব গাছ লাগানো আর চমৎকার সব বাগান। ব্যারাকে যাবার ছায়াঢাকা রাস্তার এক প্রান্তে ইউরোপিয়দের জন্য বাজার আর অন্যপ্রান্তে, দেশীয় সেপাইদের থাকার জায়গার কাছাকাছি, দেশীয়দের। কর্নেল মরগ্যান, গডার্ড এবং টটিংহ্যাম এ বছরটা দায়িত্বে ছিলেন। সৈনিকদের মাঠের নানান কাজে কর্মে লাগানো হত। কেননা ওই এলাকায় তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। আর সৈন্যদের নিরুপদ্রবে মাঠের কাজে লাগানো যেত। আমিও মাঝে মাঝেই মাকে দেখতে যাচ্ছি; মা ততদিনে আমার অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; যখন ক্যাম্পে থাকতাম সেসময় মাঝে মধ্যে দাদাও দেখা করে যেত।

।১৩।

পরদিন সকালে গ্রাম ছেড়ে রওনা হবার আগে আমি মোহন লালের সঙ্গে দেখা করতে যেতে সে বলল, "কালকে তাহলে সে ছোকরার থেকে আর কোন কথা বের করতে পারলেন না, তাইতো?"

"নাঃ," মাথা নাড়লাম আমি, "ছেলেটা নিজের লোকজনকে বাঁচাবার জন্য জান দিল, কিন্তু একটা কথা বলল না।"

"পারবেন না। এরা সব জাত অপরাধী। এর আগেও এরকম কয়েকটাকে ধরে আমি ফাঁসীতে চড়িয়েছি, কিন্তু কারো মুখ থেকে একটাও কথা বের করতে পারিনি। আচ্ছা মীর সাহেব, আপনাকে একখানা কথা বলি। হয়তো আপনি আমার একটা সাহায্যে আসতে পারবেন।"

বললাম, "হুকুম করুন।"

"একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে এই এলাকায়। সৈয়দ মুহম্মদ আলি নামে একটা লোক হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে গেছে। হায়দরাবাদের দরবারে লোকটার ভালো যোগাযোগ ছিল। সেখান থেকে বছর দু তিন আগে একে একটা ছোট নায়েবের পদ দেবার আদেশ দিয়ে নিরমূলে পাঠানো হয়। সেইমতো নিরমূলের কর্তা তাকে একটা জেলায় পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে লোকটা ভারী বেগড়বাঁই শুরু করে দেয়। যা খাজনা আদায় করছিলো তার কিছুই সে রাজসরকারে পাঠাচ্ছিল না। তার ওপর লোকটার নামে একের পর এক অভিযোগ আসছিলো চারপাশ থেকে। ব্যাপারটা সরকারের নজরে এসেছে বুঝতে পেরে লোকটা কাল তার সব লোকজন আর জিনিসপত্র কোথায় যে সরিয়ে দিয়েছে কেউ জানে না। আর আজ খবর এসেছে, কাল থেকে সে নিজেও নিরুদ্দেশ।"

"তাজ্জব ব্যাপার," আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লাম, "লোকটার নাম আমি কখনো শুনিনি। তা, এ ব্যাপারে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন তো?"

"সাহায্য, মানে আপনারা তো রাস্তায় ঘাটে ঘোরেন! লোকটাকে কখনো যদি দেখতে পান তো সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করে ক'টা পাহারাদার সঙ্গে দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। ভালো পুরষ্কার মিলবে। আর একটা কথা। লোকটা মাঝেমাঝেই কুমল খান নামে একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করে। পালিয়েছে যখন, তখন সম্ভবত সেই নামটাই ব্যবহার করবে।

"মনে থাকবে," আমি মাথা নাড়লাম, "ধরতে পারলেই গ্রেফতার করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। তবে বলছিলাম কি, এই লোকটার নামে একখানা সরকারী পরওয়ানা কি আমায় লিখে দিতে পারবেন? তাহলে কাজটায় একটু সুবিধে হয়ে যেত আমাদের।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়। খুব ভালো প্রস্তাব মীরসাহেব," এই বলে মোহনলাল তাড়াতাড়ি কুমল খানের সব কীর্তিকলাপ লিখে একখানা পরওয়ানা বানিয়ে তাতে নিজের শিলমোহর লাগিয়ে আমার হাতে দিয়ে দিল।

সেখানা হাতে নিয়ে ভালো করে পড়ে নেবার পর বললাম, "এইবার তবে যাবার হুকুম দিন। বেলা হয়ে এল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি এগোন। যদি কখনো কোন প্রয়োজনে আসতে পারি নিঃসংকোচে আমায় খবর পাঠাবেন।"

"নিশ্চয় পাঠাবো হুজুর। এখন সালাম।" এই বলে আমি পথে বের হয়ে এলাম।

ফিরে এসে সব কথা বলতে বাবা অনেকক্ষণ ধরে হাসল। বলে, "কুমল খানের মুন্ডুটা কেটে এনে মোড়লকে উপহার দিলে কেমন হয়? সব ঝামেলার অন্ত হবে।" বুদ্ধিটা মন্দ নয়। বললাম, "তাহলে দুজন লুগাইকে পাঠিয়ে দিই নদীর চরে পুঁতে রাখা কুমল খানের মাথাটা কেটে আনবার জন্য?"

বাবা বলে, "আরে না না। আমি মজা করছিলাম। সন্ধে হয়ে এসেছে। এখন রাতের বেলা একটা দুটো লোক মিলে এভাবে ওসব করতে না যাওয়াই ভালো। কখন কি ঘটে যায়! "

মতলবটা কিন্তু আমার মাথায় রয়েই গেল। নিজের তাঁবুতে ফিরে আমি তিনটে বাছাই লুগাইকে ডেকে বললাম, "কুমল খানকে কোথায় পুঁতেছিলি মনে আছে? সেখানে গিয়ে রাতের মধ্যে তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে আসতে পারবি? একেকজন পাঁচটাকা করে বখশিস পাবি।"

মতিরাম নামের একজন লুগাই শুনে বলল, "সে আমরা ঠিক পেয়ে যাবো। কবরটা গভীর নয় বেশি। কুমল খানের শরীরটা সবার ওপরেই আছে। কিন্তু মুন্ডু দিয়ে করবেটা কী? "

তখন ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে বলতে তারাও খুব মজা পেল। তারপর মতিরাম বলে, "আমার একটা পরামর্শ আছে। যে গাছটাতে ছেলেটাকে ফাঁসী দেয়া হয়েছে, মুন্ডুটা তার নিচে এনে লটকে রাখা যাক। সবাই ভাববে ওই ছোকরার দলেরই কাজ এটা।"

"ভালো বুদ্ধি, " আমি মোতিরামের পিঠ চাপড়িয়ে বললাম, "মুন্ডু নিয়ে ফিরে যদি দেখো গাছতলার চৌহদ্দিতে কেউ নেই তাহলে ওটা ওখানে লটকে দিয়ে আসবে।"

লোকগুলোকে পাঠিয়ে দিয়ে রাতটা আমার ভারী অস্বস্তিতে কাটল। কখন কী হয়ে যায় সেই ভয়ে বুকের ভেতর একটু দুরদুর করছিল। জোরা অবাক হয়ে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে বললাম, মাথা ধরেছে। সে বলে বিপদ আরো বাড়ল। জোরা আর তার দাই মিলে আমার মাথায় চুণ মাখাতে বসল তখন। বাধ্য হয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম আমি।

মাঝরাতের কিছু পর আমার তাঁবুর বাইরে মোতিরামের গলার শব্দ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাড়াতাড়ি উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "খবর ভালো?" জানা গেল সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে গেলাম আমি।

পরদিন সকালে উঠে আমাদের দলটা রওনা হয়ে গেল। কুমল খানের মুন্ডুটা একবার নিজের চোখে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছিল আমার। চলতে চলতে তাই চুপচাপ দল থেকে বের হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি নিমগাছগুলোর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল তখন। গাছের ডালে ডালে মড়মড় করে শব্দ হচ্ছিল। চারপাশে জনমনুষ্যের চিহ্ন নেই। তার মধ্যে কাটা মুন্ডুটা নিমগাছের একটা বেঁটে ডালের গায়ে দুলছিল। তার চোখদুটো অমানুষিক ভঙ্গীতে কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আমার দিকে দেখছিল। জিভটা বের হয়ে ঝুলছে। চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে আমি বুঝলাম এটা দেখলে যে কেউ ধরে ফেলবে এটা ঠগিদের কাজ। তাড়াতাড়ি নেমে এসে মুন্ডুটাকে নামিয়ে এনে আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে তার চোখদুটোকে ফের কোটরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাতা দুটো বুঁজিয়ে দিলাম। শরীরটা তখন মাটির নিচে থেকে নরম হয়ে এসেছে। তাই বেশি বেগ পেতে হোল না। তারপর মুন্ডুটাকে গাছের নিচের সেই পাথরের মূর্তিটার পাশে রেখে দিয়ে ভালো করে হাতের রক্ত ধুয়ে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দলের নাগাল ধরলাম ।

দেখা গেল, আমার এই সামান্যক্ষণের অনুপস্থিতি দলে কেউ বিশেষ টের পায়নি। সেটা একদিক দিয়ে ভালোই। খানিক চলবার পর গ্রাম থেকে একজন ঘোড়সওয়ার আমাদের নাগাল ধরে মোহনলালের একখানা চিঠি আমার হাতে দিল। তাতে দেখি সে লিখেছে, কুমল খানের মুণ্ডুটা পাওয়া

গেছে। অতএব তার খোঁজ করবার দরকার নেই আর। কিন্তু তার অনুরোধ কুমল খানের মৃত্যুর খবর আমরা যেন কাউকে বিশেষ না বলি। হায়দরাবাদের দরবারে খবরটা পৌঁছোবার আগে মোহনলালের বন্ধু নিরমূলের শাসক কুমল খান রাজসরকারের যে টাকা চুরি করেছিলো সেটা ফিরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে ফেলতে চায়। নাহলে নিরমূলের শাসককেও ষড়যন্ত্রী বলে সন্দেহ করা হতে পারে। কুমল সিং-এর মরার ব্যাপারটা এইভাবে মিটে যাওয়ায় হুন্ডির টাকা নিরাপদে ভাঙাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় আমার মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছে তখন।

এর পাঁচদিনের মাথায় আমরা হায়দরাবাদের সাত ক্রোশ দূরে এসে ঘাঁটি গাড়লাম। পরদিন একটু বেলা হবার পর আমাদের গোটা দলটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে শহরের দিকে চলল। এত বড় একটা দলকে একসঙ্গে দেখলে পাছে কোন সন্দেহ হয় কারো, তাই এই ব্যবস্থা। প্রথম দলটায় চললাম আমি। দ্বিতীয় দলটায় সমস্ত লুটের মাল নিয়ে চলল বাবা নিজে, আর তিন নম্বর দলটার নেতৃত্বে ছিল বাবার বন্ধু সরফরোশ খান। ঠিক হয়েছিল শহরে পৌঁছে ফের একজায়গায় সরাইতে ঘাঁটি গাড়ব আমরা।

আমার সঙ্গে বদ্রীনাথ চলেছিল। তখন সকাল হয়ে গেছে। চারপাশের কুয়াশা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। তার মধ্যে দিয়ে বহুদূর থেকে প্রথমে চোখে পড়ল পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল একটা ঝিল। তার এদিক ওদিক অতিকায় সব পাথরের স্তুপ পড়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে মানুষের হাতে সাজানো হয়েছে সেগুলো। দেখে বদ্রীনাথ বলে, রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় বাঁদরসেনারা হিমালয় থেকে পাথরের স্তুপ ভেঙে ভেঙে দক্ষিণে নিয়ে গিয়েছিলো। পথের মাঝামাঝি এইখানটায় এসে তাদের একটা দল পাথর নামিয়ে অন্য দলের হাতে তুলে দিতো। সেতুবন্ধন শেষ হবার পর যে পাথরগুলো বাকি ছিল সেগুলোই অমন স্তুপাকৃতি হয়ে পড়ে আছে। শুনে আমি বললাম, "আরে, তোমাদের ওই সেতুবন্ধন নিয়ে আমাদেরও একটা গল্প আছে তো। বলে বাবা আদম নাকি থাকতো লংকা নামের স্বর্গদেশে। তখন তার নাম ছিল সেরেনদিব। সেখানে থাকতে থাকতে একবার দূরে ভারতের মাটি দেখে বাবা আদম ভাবল সেখানে ঘুরতে যাবে। বড় বড় পাহাড় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে সেতু বেঁধে নিল বাবা আদম। তারপর তাইতে পা ফেলে ফেলে ভারতে চলে এল। আল্লা তাতে ভারি রেগে গিয়ে বাবা আদমকে অভিশাপ দিল। সেই থেকে মানুষ জন্ম যাযাবর।"

"বটে," বলতে বলতে বদ্রীনাথ পাথরের স্তুপগুলোর দিকে দেখিয়ে বলে, "আমার গল্পটার প্রমান হল এই স্তুপগুলো। তোমার গল্পের প্রমান কই? আমার গল্পটাই ঠিক, কী বলো?"

"সবই খোদার লীলা হে বদ্রীনাথ। বাঁদরগুলো বেজায় শক্তিশালী ছিল বলতে হবে। ভাগ্যিস এখন সেসব নেই। থাকলে আমাদের ছুঁড়ে ফেলত সব টোকা মেরে মেরে," বলতে বলতে পা চালালাম আমি।

।১৪।

উলোয়াল গ্রাম পেরিয়ে হুসেন সাগর নামে হায়দরাবাদের সেই বিখ্যাত ঝিলটা পুরোপুরি নজরে এলো। তার পাড়ে ইংরেজদের সেনাঘাঁটি। জায়গাটাকে সেকেন্দ্রাবাদও বলা হয়। ঝিলের পাশে যখন পৌঁছোলাম তখন তার নীল জলে বাতাসের ধাক্কায় অজস্র ঢেউয়ের খেলা। দেখে মন ভরে গেল। তখনো সমুদ্র দেখিনি আমি। ভাবছিলাম সমুদ্র বুঝি এইরকমই হবে। তার ঢেউয়ের দল গর্জন করে এসে পাথর দিয়ে বাঁধানো পাড়ে, তার পাড়ে দাঁড়ানো পাহাড়দের পাদদেশে আছড়ে পড়ছিলো। ভগবানের কি আশ্চর্য সৃষ্টি!

ঝিলের পাশের একটা টিলার ওপর উঠে দাঁড়াতে পায়ের নিচে চোখ ধাঁধানো হায়দরাবাদ শহরটা চোখে পড়লো। দক্ষিণের প্রথম বড় শহর। পথে আসতে আসতে এর কত গল্পই শুনেছি! বিরাট একটা এলাকা জুড়ে অসংখ্য গাছের সবুজ রঙের সমুদ্রের ভেতর ঝকমকে সাদা ঘরবাড়ির

ভিড়। তাদের মাঝে থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চারমিনার আর মক্কা মসজিদ। এখানে সেখানে সন্তদের সমাধিমন্দিরের সাদা, গোলাকার ছাদ আর তাদের মাথায় সোনালী রঙের চূড়া মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ছোট ছোট মসজিদের সাদা রঙের পিলার চোখে পড়ে।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসে শহরে পৌঁছোলাম আমরা। একটা সরাইখানায় আমাদের দলবল গিয়ে ঘাঁটি গাড়ল। তারপর আমি বের হলাম একটা বাড়ি খুঁজতে। খানিক খোঁজাখুঁজির পর এক স্থানীয় ব্যবসাদারের থেকে একটা তিন ঘরের ছোট্ট বাড়ি পেয়ে সেটা ভাড়া নিয়ে নিলাম। বাবা আর আমার জন্য বাড়িটা একেবারে মাপসই। তিন নম্বর ঘরটাকে আমাদের লুঠ করা জিনিসপত্রের গুদাম বানানো যাবে। বাকি লোকজন থাকবে সরাইখানাতেই।

হায়দরাবাদে পৌঁছে ইস্তক জোরার খুশি আর ধরে না। এই শহরেই তার জন্ম। বারবার শুধু তাকে দেখে তার নিজের লোকজন যে কি খুশি হবে সেই কথা বলে। নবাবের লোক তাকে তুলে নিয়ে যাবার পর তারা তো ধরেই নিয়েছিল, আর তার কোন খোঁজ মিলবে না কোনদিন।

যে ব্যাপারীর বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম তার দেখি আমাদের বিষয়ে খুব কৌতুহল। কোথা থেকে আসছি, কী করি, সেসব বারবার জানতে চায়। তাকে আমরা আমাদের পুরোন গল্পটাই শুনিয়ে দিলামঃ বাবা একজন ব্যবসায়ী। নিজের সওদার জিনিসপত্র নিয়ে রোজগার করতে এসেছেন এই শহরে। আমি তাঁর পাহারাদার সেপাইদের দলের নেতা। শুনে ব্যাপারী বলে বাবার মালপত্র কী কী আছে দেখাতে। সে তাহলে সেসব ভালো লাভে বিক্রির বন্দোবস্ত করে দেবে। এই ব্যাপারটাতে কিন্তু বাবা হ্যাঁ না কিছুই বলল না। পরে আমায় বলে, "বলে বিপদে পরি আর কি! যেসব জিনিস জুটেছে তাদের সব এখনো ভালো করে খুলেই দেখা হয় নি যে! কাল সকালে আগে সব জিনিস খুলে খুঁটিয়ে দেখবো, তারপর বাজারে গিয়ে সাহুকারদের দোকান থেকে সেই জাতের অন্য জিনিসের দামপত্র ভালো করে বুঝে নেবো, তারপর বিক্রিবাটার প্রশ্ন।"

পরদিন সকালে সেইমতো কাজ শুরু করলাম আমরা দুজন। কাপড়ের বড় বড় গাঁটরিগুলো খুলে দেখা গেল তাতে জরি, মসলিন, সোনার সুতোর কাজ করা কাপড়, নাগপুরী শাড়ি এইরকম সব দামি দামি জিনিস আছে প্রচুর। তাছাড়া, সোনাদানা, দামি দামি রত্নটত্ন তো সব ছিলোই। সেইসব ভালোভাবে দেখেশুনে, গুণেগেঁথে নিয়ে পুরো মালপত্রের একটা তালিকা বানিয়ে রেখে, আমি আর বাবা ভালো সাজগোজ করে দলের দুখানা সেরা ঘোড়ায় চেপে বাজারের দিকে চললাম দলের কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে।

কারোয়ান নদীর ওপরের একটা সেতু পেরিয়ে শহরে এসে ঢুকে, লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সটান বাজার এলাকায় চলে এলাম আমরা। বাইরে থেকে যতই ঝকঝকে দেখাক, বাজার এলাকাটা কিন্তু বেশ নোংরা। সরু রাস্তায় হাজারো কিসিমের লোকের ভিড়। তাদের পোশাকআশাক দেখে বোঝা যায় এ শহরে বড়লোকের অভাব নেই। রাস্তায় হাতির পিঠে হাওদা খাটিয়ে দেহরক্ষী নিয়ে রইস লোকজন ঘোরাফেরা করছেন। সে সময়টা মহরম চলছে। চারপাশে তাই হাসান হোসেন দুলা, দীন দীন এইসব চেনা আওয়াজ উঠছিল। আমাদের সঙ্গের লোকজন আগে আগে রাস্তা খালি করতে গিয়ে মধ্যেমধ্যেই অন্য লোকজনের কাছে গালাগাল খাচ্ছিল। সময় সময় তো দু একজন লোক রেগে গিয়ে তলোয়ারেও হাত ঠেকাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি কোন বিশেষ ঝামেলা ছাড়াই আমরা বেশ চওড়া একটা রাস্তায় এসে পড়লাম। দেখি চারমিনারের কাছে এসে পড়েছি।

মক্কা মসজিদ থেকে আজানের শব্দ উঠছিলো। সেইদিকে ইশারা করে বাবা বলল, "প্রথমে ওইখানে গিয়ে নামাজ পড়ব, তারপর কাজকর্ম হবে'খন।"

চারমিনার ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে হাতের ডাইনে একটা রাস্তায় পড়ে আমরা মসজিদের কাছে এসে পৌঁছলাম। দরজায় ঘোড়াগুলো বেঁধে রেখে ভেতরে ঢুকতে মনটা ভালো হয়ে গেল। দুপাশে বহু

বড়মানুষের সুন্দরভাবে সাজানো কবরের সার। মূল প্রার্থনাগৃহটা বিরাট। চারমিনারের মত বালি-সিমেন্টের কাজ নয়। গোটা বাড়িটাই মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরি। তার সুবিশাল ছাদ আর পিলারে অসম্ভব সুন্দর সব খোদাই শিল্পকর্ম। কোমরবন্ধের পটি খুলে মাটিতে তাই বিছিয়ে আমরা অসংখ্য নামাজ রত ভক্তের দলে যোগ দিলেম। সকলের গলার মিলিত শব্দে তখন মসজিদ গমগম করছে। ঠগীর পেশায় এলেও তখনো আমি একেবারে পাষাণহৃদয় হয়ে যাইনি। প্রার্থনা করতে করতে আমার দুচোখ ভরে জল আসছিল।

নামাজ শেষ করবার পর ফিরে এলাম চারমিনার চত্বরে। বাবা আমায় সাবধান করে দিয়ে বলে, "এখানে হাজারো দালাল লোক ঠকাবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। তবে আমরা তো আর জিনিস কিনতে আসিনি, কাজেই কিনে ঠকবার ভয় নেই। ঠিকঠাক দালাল পেলে, তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জিনিস কেনবার জন্য উপযুক্ত ব্যাপারী মিলে যেতে পারে। চোখকান খোলা রাখিস।"

একটা বড়সড়ো বাড়ির ধার ঘেঁষে খাবার আর কাঁচা আনাজের নোংরা একখানা বাজার বসেছিল। সেইখানে গিয়ে বাবা চালাকচতুর দেখতে এক হিন্দু ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করল, "শহরে নতুন এসেছি আমরা। একজন ভালো দালালের খোঁজ করছি। সন্ধানে আছে কেউ?"

"আজ্ঞে জনাব, আমি নিজেই একজন দালাল," সে জবাব দিল, "কী কিনতে চান বলুন। এ শহরের সব ব্যবসায়ীর দোকান আমার চেনা। আর এই মহেন্দ্র দাসকেও সবাই চেনে। যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলবে আমি লোকটা ভালো। ঠকাই না।"

"থাক, আর নিজের প্রশংসা বেশি করতে হবে না। সব দালাল ব্যাটাকেই আমার চেনা হয়ে গেছে। আগে তোমার কাজ দেখি, তারপর বোঝা যাবে," বাবা উত্তর দিল।

"তা একরকম ঠিকই বলেছেন হুজুর। বেশির ভাগ দালালই তো চোর। তবে আমায় কিন্তু সেরকম পাবেন না। লোক ঠকিয়ে আখেরে লাভ যে হয় না সে আমি বুঝে গেছি।"

দেরি হচ্ছে দেখে আমি বললাম, "বেলা পড়ে আসছে। কথা না বলে কোথায় নিয়ে যাবে চলো। অন্ধকার হবার আগে আমাদের বাসায় ফিরতে হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন। কী কিনতে চান বলুন, কাশ্মিরী শাল, বেনারসের জরি--"

"বেনারসী কাপড় চাই হে," আমি বললাম, "কয়েকটা ভালো দেখে রুমাল আর দোপাট্টা, গুটিকয় পাগড়ি, এইসব আর কি! উজিরের দরবারে যেতে হবে কিনা!"

"আসুন আমার সঙ্গে। সাবধানে, খেয়াল করে আসবেন," এই বলে মহেন্দ্র দাস আমাদের নিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা প্রায় অদৃশ্য সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে বাড়ির বাইরে থেকে দেখে আন্দাজই করা যাবে না তার ভেতরে কী আছে।

"দালাল নিয়ে ভালোই করেছি, বুঝলি," বাবা আস্তে আস্তে আমায় বলল, "নইলে গলিঘুঁজির মধ্যে ঠিকঠাক দোকান খুঁজে বের করবার সাধ্য আমাদের হত না। এখানকার বড় ব্যবসাদাররা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এইরকমভাবে গলিঘুঁজির মধ্যে দোকান বানিয়ে বসে।"

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে মোটাসোটা চেহারার এক ভদ্রলোক আমাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চেহারায়, যে সাহুকারটাকে আমি মেরেছিলাম একেবারে তার দোসর। একে একে বড় বড় গাঁটরি থেকে অসংখ্য দামি দামি কাপড় বের করে আমাদের দেখানো হল। তার থেকে কিছু বেছে আলাদা করে বাবা সাহুকারকে বলল সেগুলো রেখে দিতে। পরের দিন টাকাপয়সা নিয়ে এসে কিনে নিয়ে যাবে। সাহুকার হাঁ হাঁ করে উঠে বলে, "আরে তা কেন হুজুর? নিয়ে যান, কাল দাম দেবেন'খন।" মহেন্দ্র দাসও একই কথা বলল। বলে "আমি জামিন থাকছি, আপনারা জিনিস নিয়ে যান। কাল দাম দেবেন।"

আমাদের আসল উদ্দেশ্য ততক্ষণে সারা হয়ে গেছে। আমি কাগজে দরকারী কাপড়ের একটা তালিকা করে তার বাজারদর টুকেও নিয়েছি। সেসব আবার কিনবে কে এখন! কাজেই আমরা তার কথায় রাজি না হয়ে পরদিন টাকা দিয়ে জিনিস নিয়ে যাব বলে উঠে পড়লাম।

চারমিনারের কাছে এসে বাবা মহেন্দ্র দাসকে তার পাওনা বখশিস দিয়ে বলে দিলেন পরদিন কারবান এলাকায় এসে আমাদের খোঁজ করতে। ওখানে রঘুনাথ দাস সাহুকারের বাড়িতে আমরা উঠেছি।

মহেন্দ্র দাস চলে গেলে বাবা বলে, "যা দেখলাম তাতে আমাদের জিনিসপত্রের দাম ভালোই পাওয়া যাবে, কী বলিস?"

পরদিন সকালে মহেন্দ্র দাস এল। বাবা তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এসে দুটো টাকা হাতে দিয়ে বলল, "শোন হে। আমরা জিনিস কিনতে আসিনি। আমি দিল্লিতে থাকি। ব্যবসা করে খাই। শুনেছিলাম হায়দরাবাদে জিনিসপত্তরের দাম ভালো পাওয়া যায়। তাই কিছু দামি কাপড়চোপড় নিয়ে এসেছি ব্যবসা করতে। কাল তোমায় দিয়ে বাজারের দামটাম যাচাই করেছিলাম। তা আমার জিনিসপত্তর বেচবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে নাকি বল।"

"তাতে আর সমস্যা কী? তা আমি কত করে পাব?"

"শতকরা পাঁচ ভাগ দালালি পাবে। চলবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। চলবে না মানে? তা জিনিসপত্তরগুলো একবার দেখতে পারি কি?"

"সে তো দেখাতেই হবে হে। এই যে এসো," এই বলে বাবা তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কাপড়ের গাঁটরিগুলো খুলে দেখাল।

সব দেখেশুনে মহেন্দ্র বলে, "জিনিসপত্তর তো ভালোই। দামও ভালো পাবেন। কিন্তু গোটাটা বিক্রি করতে হলে এখানে কিন্তু বেশ ক'দিন থেকে যেতে হবে হুজুর। তাড়াতাড়িতে হবে না।"

"সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে'খন," বাবা বলল, "হায়দরাবাদে সব বিক্রি না হলে বাকি জিনিসপত্র নিয়ে পুনা চলে যাবো।"

"ঠিক আছে। জিনিসপত্তরের একটা তালিকা বানিয়ে নিচ্ছি প্রথমে। সেটা বাজারে ঘুরে দেখি। সব পাইকারের গদিতেই ঘুরতে হবে। সময় লাগবে। কালকের আগে খবর দিতে পারবো না কিছু।"

বাবা তার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল, "এই যে তোমার অগ্রিম। এবারে যা দরকার করে নিয়ে বিদেয় হও। কাল এসে দেখা কোরো।"

মহেন্দ্রদাস চলে যেতে আমি বাবাকে বললাম, "শতকরা পাঁচ ভাগ দালালি তুমি লোকটাকে দিয়ে দেবে?"

বাবা হাসল, "তাই আবার হয় নাকি? কী করতে হবে বুঝিস নি?"

"বুঝেছি," আমি মাথা নাড়লাম, "একে আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

ব্যবসাপত্রের কাজ মিটিয়ে আমি জোরার কাছে এলাম। সে তখন নিজের বাড়িতে যাবার জন্য উত্তেজনায় ফুটছে। তাকে আমি কেমন করে বোঝাই, একবার নিজের লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়লে আর আমার সঙ্গে তার দেখা কোনদিন না-ও হতে পারে। একবার মনে হল জোরাকে নিয়ে সব ছেড়েছুড়ে পালাই। আমি নিশ্চিত তাকে সে কথা বললে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যেত। কিন্তু তারপর সে বুদ্ধি ছাড়লাম। এতকিছু মজা ছেড়ে কোথায় যাব আমি? আজ মনে হয় সেদিন যদি সত্যি সত্যি জোরাকে নিয়ে সব ছেড়েছুড়ে দুনিয়ার পথে বের হয়ে পড়তাম তাহলে হয়তো আজকে যে অবস্থায় আছি তার থেকে অনেক ভালো থাকতাম আমি। আমার যা চেহারা, বুদ্ধিশুদ্ধি, অস্ত্রশস্ত্র চালাবার ক্ষমতা ছিল তাতে ভাল কাজ কিছু না কিছু আমি পেয়ে যেতামই। হয়ত বা কোথাও কোন সৈন্যদলের নেতা হয়ে বসতাম, হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রের বীরের মৃত্যু বরণ করে নিতাম—কিন্তু সাহেব, সেসব পথ আমার

কপালে লেখা ছিল না। পাপে ডুবছিলাম আমি। তা থেকে পালাবার চেষ্টা না করে আরো বেশি করে পাপেই ডুবে যেতে তখন আমি ব্যস্ত।

আমায় দেখতে পেয়ে জোরা এসে ফের তার অনুনয় বিনয় শুরু করে দিল। আমি তাকে একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, "তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে ফের ফিরে পেয়ে তোমার মা বোনেরা আর তোমায় আমার কাছে ফিরে আসতে দেবে না দেখো।"

শুনে সে বলে, "না না আমি কালকের মধ্যে ঠিক ফিরে আসবো দেখে নিও।"

এর পরে আর কোন কথা চলে না। একটা মেয়েদের গাড়ি ভাড়া করে তার দাই আর আমার দুজন লোককে সঙ্গে দিয়ে তাকে রওনা করিয়ে দিলাম। ভয় হচ্ছিল, আর বোধ হয় তার সাথে আমার দেখা হবে না।

খানিক বাদে আমার লোকদুজন ফিরে এসে খবর দিলো, জোরা তার বড়িতে ঠিকঠাক পৌঁছে গেছে। বাড়িতে তাকে নিয়ে খুশির জোয়ার বইছে। সন্ধের মুখমুখ আর থাকতে না পেরে তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘোড়ায় চেপে চললাম জোরার বাড়ির খোঁজে।

চারমিনার ছাড়িয়ে পরের রাস্তাটার মাঝখানে একটা ফোয়ারা আছে। তার কাছ দিয়ে একটা গলি বের হয়ে গেছে। তার ভেতরে জোরার বাড়ি। জায়গাটা দিয়ে আমি আগের দিনও গিয়েছি। তার বাড়িতে গিয়ে ঢুকতেই জোরা হই হই করে ছুটে এলো আমার কাছে। তারপর তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "মীর সাহেব এসে গেছেন। দেখো মা, যা বলেছিলাম, ঠিক তেমন না? রাজপুত্রের মত দেখতে, আর তেমনি সাহস- - "

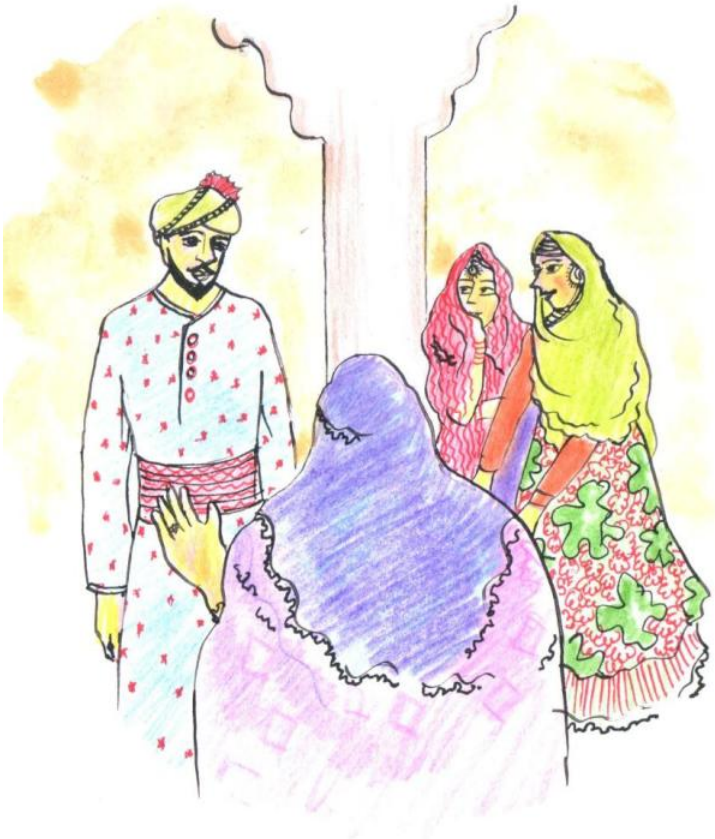

জোরার মা আমার কাছে এগিয়ে এসে মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে পটপট করে আঙুল ফাটিয়ে আমায় আশীর্বাদ করলেন। তাঁর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছিল। কাঁদতে কাঁদতেই আমায় জড়িয়ে ধরে বারবার আশীর্বাদ করছিলেন তিনি। জোরার বোনের অবশ্য মুখটা একটু গম্ভীর দেখলাম। বোনের উদ্ধারকর্তা এত সুপুরুষ না হলেই বোধ হয় সে একটু বেশি খুশি হত।

খানিক কান্নাকাটির পর জোরার মা বলেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা। আমার দুঃখের ঘরে তুমি আবার সুখের রোশনাই জ্বালিয়ে দিলে। সকালে যখন আমার দরজায় গাড়িটা এসে দাঁড়াল, ভেবেছিলাম, নচ্ছার সাকিনাটা বুঝি আবার এসেছে মেকি দুঃখ দেখিয়ে মনে মনে হাসতে। জোরা না থাকায় সে তো একেবারে এলাকার একচ্ছত্র মক্ষীরানি হয়ে বসেছিলো। তারপর দেখি, কোথায় সাকিনা? এ তো আমার লক্ষ্মী, আমার মানিক জোরা এসেছে। সে যে কি সুখ মীর সাহেব সে আমি কেমন করে

বোঝাব! আমি কাল সকালেই সব মসজিদে পাঁচটাকা করে নজর চড়াবো। পঞ্চাশটা ভিখিরিকে মিষ্টিমুখ করাবো, আর একটা তাজিয়া বের করবো। আমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। মেয়েকে হারিয়ে কীভাবে যে আমার দিনগুলো কেটেছে মীরসাহেব সে যদি আপনি দেখতেন--" বলতে বলতে তিনি আবার নতুন করে কান্না শুরু করে দিলেন।

ভদ্রমহিলা আগে কেমন দেখতে ছিলেন জানিনা, পরে জোরার মুখে শুনেছিলাম, নাকি খুব সুন্দরীই ছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর চেহারাটি বেশ ভয়ংকর। এমন মোটা মানুষ আমি আগে আর দেখিনি। হাতির মত পা ফেলে থপথপ করে চলেন, এক পা নাড়ালে মেদমজ্জার একটা পাহাড় যেন নড়ে ওঠে। কথাবার্তা বলতে বলতে সন্ধে হয়ে এলো। আমি আসন বিছিয়ে নামাজে বসে গেলাম। দেখে জোরার মা বড় খুশি। বলেন, "বাঃ বাঃ ভারী ধার্মিক ছেলে। অবশ্য হিন্দুস্তানের রইস বাড়ির ছেলেরা এমনই হয়।"

নমাজ সেরে ফিরে যাবার কথা বলতেই জোরারা তিনজন মিলে একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলো। খাওয়াদাওয়া না করিয়ে কিছুতেই তারা ছাড়বে না আমাকে। বলে, খাবার দাবার সব তৈরি। তার ওপর সেটা মহরমের নবম দিন। মদিনায় যাবার পথে মহম্মদ যে ঘোড়ায় চড়েছিলেন তার একটা নাল নিয়ে সেদিন নাল সাহিব-এর মিছিল বের হবে। সেটা না দেখে আমার যাওয়া হতেই পারে না। চাপাচাপিতে পড়ে জোরার মুখ চেয়ে রয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। সঙ্গের লোকটাকে দিয়ে ঘোড়া ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে খবর দিয়ে দিলাম রাতটা আমি এখানেই থেকে যাচ্ছি।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া খুব জমেছিলো। নানান স্বাদের অজস্র পদ তরিবত করে রেঁধেছিলেন জোরার মা। তাঁর রান্নার হাতটা খুব ভালো। সেইসঙ্গে নানান জাতের সুগন্ধী পুলাও। তার প্রত্যেকটাই সরেস। সঙ্গে নানারকমের মিঠাইও ছিল। আর ছিল ফরাসি কাফেরদের দেশের সুরা। জোরার মা অবশ্য তাকে সুরা বলতে নারাজ। বলেন ও হল গিয়ে শরবত। খেলে দোষ নেই। সিকন্দর জা নিজে খায়। খাওয়ার শেষে ভুরভুরে গন্ধওয়ালা তামাক দিয়ে সাজানো হুঁকো এলো আমার জন্য। তার সুগন্ধের কাছে কস্তুরির গন্ধও হার মানবে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে জোরা বলে, আমি যখন বন্দি ছিলাম তখন তো আমার গান শুনেছো। এবারে আমি যখন মুক্তি পেয়ে নিজের মনের আনন্দে গান গাইবো সে গান কেমন লাগে আমায় বলো। মহরমের মধ্যে গাইব। মহম্মদ আমায় মার্জনা করুন। প্রথমে আমি গাইবো আর আমার বোন আমার সঙ্গে বাজাবে, তারপর বোন এই জিনাত গাইবে।"

একটা সারেঙ্গি বের করে এনে জিনাত তাতে সুর বেঁধে ছড় টানতে একেবারে স্বর্গীয় সুর বের হয়ে এলো তার থেকে। তারপর জোরা তার সঙ্গে গান ধরতে স্বর্গ নেমে এল যেন সেই ঘরে।

অবশ্য খানিক বাদেই বাইরে মিছিলের হল্লাচিল্লা এমন বেড়ে উঠলো যে বিরক্ত হয়ে গানবাজনা বন্ধ করে দিতে হল দুই বোনকে। বিরক্ত গলায় জোরা বলল, "মর মর সব। চিৎকার করবার আর জায়গা পেল না। আজ আমি সারারাত এভাবে গেয়ে যেতে পারতাম," তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "গান কেমন লাগলো, মীর সাহেব?"

বললাম, "অপূর্ব, কিন্তু উমেরখের-এ সেই যে প্রথম তোমার গান শুনেছিলাম তার মত আমার কানে আর কোন গানই কোনদিন লাগবে না।"

জিনাত এর মধ্যে একফাঁকে কখন উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মহরমের মিছিল দেখছিল। সেখান থেকেই সে হঠাৎ চিৎকার করে বলে, "ইয়া আল্লা। দেখে যাও দেখে যাও। এমন দৃশ্য আর কখনো দেখতে পাবে না--"

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

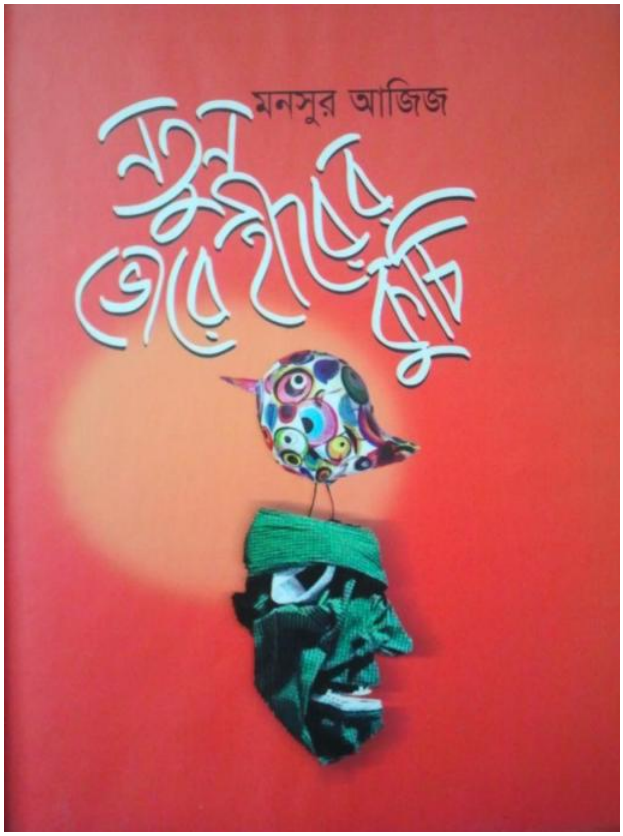

এটা একটা কবিতার বই। দু'ধরণের কবিতা আছে- কিছু আদর্শবাদী কবিতা আর কিছু বন- পাহাড়- মাঠ- ঘাট- গ্রাম- শহর- ছোটবেলা- নিঝুম দুপুরের কবিতা।

এই দ্বিতীয় ধরণের কবিতাগুলোই আমার নিজের বেশি ভাল লেগেছে। কবিতাগুলোর মধ্যে এক বিশেষ উষ্ণতা রয়েছে, কবির সঙ্গে বিষয়বস্তুর ঘনিষ্ঠতাও টের পাওয়া যায়। মনে হয় কবি নিজের গল্প বলছেন। আর তাই হয়তো কবিতাগুলোও বেশি কাছের মনে হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকল্পও ভাল লেগেছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় একটি কবিতা থেকে কিছুটা এখানে তুলে
দিই। কবিতাটির নাম 'বৃষ্টিরঙিন দিন'-

'টুপটাপ টুপটাপ টুপটাপ টুপ
বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বিলে ঝিলে দেয় শুধু ডুব
ডুব দেয় চুপচুপ শাপলারা চেয়ে থাকে খুব
ফিক করে হেসে ওঠে রোদ্দুর
রাঙাবউ লাল টুকটুক।'

এই বসন্তে তোমাদের তাই খবর দিলাম এই সুন্দর কবিতার বইটার। জোগাড় করে নিয়ে পোড়ো কিন্তু!

<u>তথ্যঃ</u>
নাম- নতুন ভোরে হীরের কুচি
লেখক- মনসুর আজীজ
প্রকাশনী- মুক্তদেশ প্রকাশন, বাংলাদেশ
দাম- ১০০ টাকা
ওয়েবস্টোর থেকে কিনতে পাবে
www.rokomari.com থেকে

লোককথা

গাঁয়ের থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে থাকত এক দাদা আর তার বোন। বাপ মা তাদের অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। তারপর থেকে একটা ছোট্ট ঘাস- পাতার বাড়িতে তারা নিজেদের মত করে আনন্দে থাকত।

এক পুর্ণিমার রাতে তারা ঠিক করল জঙ্গলের মধ্যে ক্যাঙারু শিকারে বেরোবে। দাদা তার তীর ধনুক নিল আর বোন রাস্তায় খাওয়ার জন্য গুছিয়ে নিল অনেকগুলো মিষ্টি আলু। ক্ষিদে পেলে সেগুলোকে সেদ্ধ করে খেয়ে নেবে। তারপর বেরিয়ে পড়ল তারা আলোআঁধারি অন্ধকারের জঙ্গলে। বেশ অনেকক্ষণ হাঁটবার পর তারা একটা গুহার কাছে পৌঁছল। সেখানে আবার ক্যাঙারুদের বিশাল আড্ডা। চাঁদের আলোতে তারা বড় মজা পেয়েছে। সব হুটোপাটি করে বেরোচ্ছে গুহার সামনের খালি জায়গাটায়। তাই দেখে বোনের একটু দুঃখই হল। সারা জীবন ওই একমাত্র দাদাকে ছাড়া কারুর মুখ দেখেনি সে। দাদা যখন শিকার করে খাবার আনতে বেরোয় তখন একা একা ঘরে বসে থেকে তার বড় ভয় লাগে, আর একাও লাগে। মনে হয় কিছু খেলার সাথী থাকত যদি! এই চাঁদের আলোয় খেলতে থাকা ক্যাঙারুদের হিংসা হয় তার। ইস! কি আনন্দেই না আছে!

কিছু দূরে দাদা আর বোন বসে পড়ল। দাদা বোনকে আগুন জ্বালিয়ে নিতে সাহায্য করল, তারপর বোন মিষ্টি আলুগুলোকে তাতে রান্না করতে লেগে গেল। ভালভাবে রান্না হওয়ার পর দাদা বোনকে আলুগুলোকে ভালো করে টুকরো করে কেটে রাখতে বলে ক্যাঙারু মারতে বেরিয়ে

পড়ল। বোন তার থলে থেকে একটা পাথরের হাতে তৈরি ছুরি বের করে আলু কাটতে লাগল। কিন্তু অন্ধকারে একা বসে তার গা ছম ছম করতে লাগল। একবার ভাবল দাদাকে ডাকে। দাদা, দাদা করে দু- একবার চিৎকার করা সত্ত্বেও কেউ এল না। এদিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরসর করে হাওয়া বইতে লাগল, আলো আঁধারিতে চারিদিকে ছায়ামূর্তি দেখতে লাগল বোন। আর অন্যমনস্কভাবে আলু কাটতে গিয়ে হঠাৎ করেই তার আঙুল খুব জোরে কেটে গেল। সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, আর সেই রক্ত জঙ্গলের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে বোন তো ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। দূর থেকে তার দাদা সেই আওয়াজ শুনে ছুটে এল তার কাছে।

এসে চারিদিকে এত রক্ত দেখে সে তো হতভম্ব! কোনরকমে বোনের হাত ধরে টেনে নিল নিজের কাছে। তারপর হাঁটা লাগাল বাড়ির দিকে। বোনের তো হাত থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়েই যাচ্ছে। দাদার মনে দুশ্চিন্তা, এই রাত্রিবেলা এই জঙ্গলের মধ্যে বোনকে কীভাবে ভাল করব? এখানে ডাক্তারও কোথায়, বদ্যিও বা কোথায়? এদিকে বোন আস্তে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়তে লাগল। দাদা বুঝতে পারল এই বোধহয় শেষ। বোন বোধহয় আর বাঁচবে না। এমন সময় পাশে তার চোখে পড়ল একটা বিশাল গাছ। তার গুঁড়ির ঠিক মধ্যিখানে একটা বিশাল কোটর। এমন সময় বোনের কী যেন একটা হয়ে গেল। সে যন্ত্রচালিতের মত গাছটার দিকে চলে গিয়ে সিধে কোটরের ভেতরে ঢুকে গেল।

দাদা তো "বোন, বোন" বলে হাজার ডেকেও সাড়া পেল না। কোটরে উঁকি মেরে দেখল কেউ কোথাও নেই। তাই দেখে তো তার মাথায় হাত। এমন সময় কোটর থেকে বেরিয়ে এল একটা ক্যাঙারু। দাদা তো অবাক! এই কিছুক্ষণ আগেই বোন গটমট করে ঢুকে গিয়েছিল সেখানে, আর সে উঁকি মেরেও তো আর কিছু দেখতে পায়নি ভেতরে, তাহলে ক্যাঙারুটা এল কোত্থেকে? এরকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই ক্যাঙারুটা বলে উঠল, "দাদা, তোমারই দোষ! আমাকে একলা রেখে কেন গেছিলে শিকার করতে? আমার কত ভয় লাগছিল জানো? তাইতেই তো হাত কেটে গেল। যাই হোক। আমি অনেক দিন ধরে খেলার সাথী চেয়েছিলাম, আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল। আমি চললাম। তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না।"

দাদা বুঝতে পারল তার মৃতপ্রায় বোনকে জঙ্গলের দেবতা ওই গাছের মধ্যে দিয়ে রক্ষা করেছে, আর তার মনের ইচ্ছাও পুর্ণ করেছে। সে তবুও বোনকে অনেক কাকুতি মিনতি করল তার সাথে বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু বোন আর তার কোন কথা শুনল না। পেছন ফিরে লাফাতে লাফাতে ক্যাঙারুদের আড্ডার দিকে চলে গেল। দাদা চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে এল।

আর কখনও সে তার বোনকে দেখতে পায়নি।

পাপুয়া নিউগিনির লোককথা

ছবিঃ মৌসুমী

বিশ্বের জানালা

টুমরো আর ইয়েসটারডে দ্বীপের কাহিনী

উমা ভট্টাচার্য

নাম শুনে অবাক হবারই কথা। এরা আবার কোথায় আর এমন নামই বা কেন এদের? কিন্ত মজা করে এমন নামেই ডাকে দ্বীপের মূলনিবাসীরা অর্থাৎ আদি ইনুইট বাসিন্দারা। এরা আসলে এস্কিমো, আদি থেকেই ছিল মৃগয়াজীবি, শিকারনির্ভর যাযাবর মানুষ। প্রায় তিনহাজার বছরেরও আগে থেকে এরা এখানে বাস করত আর তুষারজমাট ‘বেরিঙ্গীয়া’ পেরিয়ে উত্তর আমেরিকা,বিশেষত আলাস্কা অঞ্চল থেকে এশিয়া ও পশ্চিম সাইবেরিয়া অঞ্চলে অনায়াসে যাতায়াত করত শিকারকে তাড়া করতে করতে। খানিকটা বোঝা যাচ্ছে দ্বীপ দুটি কোথায় হতে পারে! রাশিয়া আর আলাস্কার কাছাকাছিই হবে নিশ্চয়।

এই দ্বীপ দুটির অবস্থান বেরিং প্রণালীর ঠিক মাঝখানে, যাদের একদিকে আলাস্কা আর একদিকে সাইবেরিয়া । পোশাকী নাম ‘ডাইমোডে’ দ্বীপ। আসলে একটি ছোট আর একটি একটু বড়,দুটি দ্বীপ নিয়ে এই ডাইমোডে গঠিত। আর্কটিক মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে বেরিং প্রণালী। আর্কটিক বৃত্তের ৫২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপ দুটির মধ্যে বড়টির নাম ‘বিগ ডাইমোডে’- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার পশ্চিমে রাশিয়ার

দিকে অবস্থিত। আর ছোট দ্বীপটি 'লিটল ডাইমোডে' উত্তর- পূর্ব আমেরিকার আলাস্কার পূর্ব দিকে অবস্থিত।বিগ ডাইমোডে আর লিটল ডাইমোডে দ্বীপদুটির মধ্যে তিন দশমিক আট কিলোমিটারের দূরত্ব।আর আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা থেকে বিগ ডাইমোডে দ্বীপটি দুই দশমিক চার মাইল দূরে, আর লিটল ডাইমোডে দ্বীপটি মাত্র দশমিক ছয় মাইল দূরে।

হিমযুগে এই পুরো অঞ্চলটি জমাট বরফে ঢাকা থাকতো। শীতের সময় এই বরফজমাট ব্রিজ 'বেরিঙ্গীয়ার' ওপর দিয়ে আদিম মানুষেরা অনাদিকাল থেকে সহজেই রাশিয়ার সাইবেরিয়া আর উত্তর- পূর্ব আমেরিকার মধ্যে চলাচল করত। তারা বিনা বাধায় ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যে শিকারে যেত। মেরু ভালুকের দল শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত, শিকারী আদিম জনজাতি ইনুইটরা কিং ক্র্যাব, মাছ ধরতো, পরিযায়ী শিকারের পিছু ধাওয়া করে চলে আসতো এক দ্বীপ থেকে অন্যটিতে। এছাড়া আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করতে যেত, বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সকলেই অংশ নিতে আসতো, বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা মেটাতে কিছু ব্যবসাও হতো। তবে বসবাসের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় বিগ ডাইমোডেতে বেশি মানুষজন থাকত না। মানুষের বসতি ছিল প্রধানত লিটল ডাইমোডে দ্বীপের পশ্চিম দিকের ঢালে। তাদের ঘরগুলি ছিল পাথরের দেওয়ালের মাথায় শিকার করা পশুর চামড়া দিয়ে করা ছাউনি। তিমির শক্ত দন্তহাড়কেও ব্যবহার করত ঘরের ছাউনিকে চাপা দেবার কাঠামোটি বানাতে। সাদা বরফের বুকে এলোমেলোভাবে স্তূপ করা পাথরের ডাঁই মনে হত ঘরগুলিকে দেখে। আর্কিওলজিস্টদের মতে ইগ্নালুক নামে যে এস্কিমো গ্রামটিতে প্রধানত জনবসতি গড়ে উঠেছে, প্রায় তিনহাজার বছর আগে সেই এলাকাটি ছিল এস্কিমোদের বসন্তকালীন মৃগয়াক্ষেত্র। পশ্চিমী নাবিকেরা দেখেছিলেন সেখানে এস্কিমোদের এক উন্নত সংস্কৃতি ছিল, আর ছিল তিমিশিকারের বিরাট উৎসব। মিলেমশে বেশ চলছিল প্রত্যন্ত বরফ রাজ্যের বাসিন্দাদের। বাদ সাধলো সাহেবদের ভৌগলিক আবিষ্কার।

১৬৬৮ সালে এই দ্বীপ প্রথমে নজরে আসে একজন রাশিয়ান সমুদ্র অভিযানকারীর । দ্বীপটি এর পরে নজরে আসে ১৭২৮ সালের আগস্ট মাসের ১৬ তারিখে, একজন ডেনিশ নাবিক 'ভাইটাস বেরিং'এর । ঐ দিনটি ছিল রাশিয়ান চার্চের শহিদ সাধু ডাইমোডের মৃত্যুদিবস। বেরিং তাঁর নামেই দ্বীপটির নাম রাখেন - ডাইমোডে আইল্যান্ডস।

১৮৬৭ সালে আমেরিকা আলাস্কা অঞ্চলটি কিনে নেয় রাশিয়ার কাছ থেকে, আর লিটল ডাইমোডে চলে যায় আমেরিকার দখলে। অধিকারের এক নতুন সীমারেখা টানা হল দুই মহাদেশের মাঝে। বিগ ডাইমোডের জনতাকে রাশিয়া সরিয়ে নিয়ে গেল মূল ভূখন্ডে। আর আলাদা হয়ে গেল এতদিনের একাকার দ্বীপদুটির মানুষেরা, একদিক থেকে অন্যদিকে অনায়াস চলাফেরায় বাধানিষেধ আরোপিত হল।

রাজনীতি তাদের পৃথক করে দিলেও আত্মীয়ের বন্ধন শেষ করা যায়নি। মানুষ লুকিয়েচুরিয়ে, ঘন কুয়াশার আড়ালকে কাজে লাগিয়ে দুপাশেই যাতায়াত করতে থাকলো। কখনো ধরা পড়ে গেলে অনধিকার প্রবেশের জন্য দন্ড দিতে হয়। এরপর ১৮৮০ সালে টানা হল আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। দ্বীপদুটিকে দুপাশে রেখে টানা এই রেখা দুটি দ্বীপকে নতুন নামে চিহ্নিত করলো। সারা পৃথিবিতে সময়ের হিসাবকে ঠিক রাখতে 'টুডে' থেকে 'টুমরো'কে আলাদা করার সাথে সাথে দ্বীপদুটিও হয়ে গেল "টুমরো আইল্যান্ড",(বিগ ডাইমোডে দ্বীপ) আর "ইয়েসটারডে আইল্যান্ড",(লিটল ডাইমোডে দ্বীপ)। দুদিকের দুরত্ব

সামান্য হলেও সময়ের পার্থক্য হয়ে গেল ২৩ ঘন্টার। তারিখ রেখার পশ্চিমদিকে থাকায় বিগ ডাইমোডে সময়ের দিক থেকে ২৩ ঘন্টা পিছিয়ে গেল লিটল ডাইমোডের থেকে।

যে এস্কিমোরা গাছপালাবিহীন তুষার মরুর শীতল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঊষর প্রান্তরে এসে বসতি গড়েছিল হাজার বছর আগে, সেই লিটল ডাইমোডের বাসিন্দারা এই কৃত্রিম সীমারেখা মন থেকে মানেনি। তারা আজও তেমনিভাবেই যাতায়াত করে দুই দ্বীপের মধ্যে, শিকারের পিছু ধাওয়া করে ঢুকে পড়ে 'টুমরো আইল্যান্ড' বিগ ডাইমোডেতে, আবার শিকার করে ফিরে আসে নিজেদের দ্বীপে। আর মজা করে বলে, "উই গো হান্টিং টুডে", "উই কিল ইট টুমরো", "অ্যান্ড উই বুচার অ্যান্ড ইট ইট ইয়েসটারডে"।

কিছু তথ্যঃ–

- ডাইমোডে আইল্যান্ডসে এখন আর আগের মত অবস্থা নেই।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাশিয়ার বিগ ডাইমোডে দ্বীপটিতে মানুষের বসতি বিশেষ নেই, সেখানে একটি রাশিয়ান সেনাছাউনি আছে।
- লিটল ডাইমোডেতে ১৭০ জন ইনুপিয়াট ইনুইট এস্কিমোদের বাস।দ্বীপের পশ্চিমের ঢালে সুবিধাজনক জায়গায় ইগ্লালুক গ্রামে তাদের বাড়িঘর। এখন পাকাবাড়িও হয়েছে। এখন কিছু ইনুইট বাসিন্দারা চাষবাসও করে। তাছাড়া আইভরি কার্ভিং বা হাতির দাঁতের সুক্ষ কাজ করে। গ্রামে একটি স্কুল আছে।আর একটি মুদিখানা আছে।
- ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যক্রম ও পাঠদানের দিন ও সময় নির্ধারিত হয়েছে বাসিন্দাদের সুবিধার দিকে নজর রেখে। জীবিকার জন্য বসন্তকালেই শুরু হয় বাৎসরিক শিকারের পর্ব। এই শিকারের আয় থেকেই তাদের সারা বছরের খরচ চলে। তাই পরিবারের বড়দের সঙ্গে স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েদেরও শিকারে যেতে হয় সাহায্য করার জন্য। কাজেই স্কুলের ১৮০ দিনের ক্লাসটাইম বজায় রাখার জন্য সাধারণত সপ্তাহান্তের দিনগুলিতে আর ছুটির দিনগুলিতেও ক্লাস চালু থাকে অন্যান্য সময়ে।

- আগে ইনুপিয়াট ভাষাই ছিল প্রধান ভাষা। তবে এখন সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার তাগিদে ইংরাজি ভাষাও শেখানো হচ্ছে স্কুলে। একটিই স্কুল আছে, যেখানে প্রি- কেজি থেকে বারো ক্লাস অবধি পড়ানো হয়। পাঁচজন শিক্ষক আর ৪০ জনের মত শিক্ষার্থী আছে স্কুলে।
- ২০০০ সালের জনগণনা অনুযায়ী এখানের জনসংখ্যা ছিল ১৪৬ জন, বাড়ি ছিল ৪৩ টি,আর ৩১ টি পরিবারের বাস ছিল দ্বীপে।শতকরা পঁয়ত্রিশ দশমিক চার জন মানুষই ছিল দরিদ্র্যসীমার নিচে।
- এখন এখানে পাকা বাড়ি হয়েছে ৩০টির মত। একটি ধোবিখানা হয়েছে, আর সাধারণ অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্যশিবির খোলা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকুল থাকলে গুরুতর অসুস্থদের নোমশহরের মেইনল্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
- পশু শিকার আর মাছ ধরাই এখনো এখানের মানুষদের মূল জীবিকা। মূল খাদ্য বলতে বেরি, গাছের শেকড় আর কান্ড, বিশেষত যে ঋতুতে সেগুলি মেলে। আর এক জীবিকার উপায় আইভরি কার্ভিং।
- ডিজেল জেনারেটরের সাহায্যে দ্বীপের বসতি অঞ্চলে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়। এজন্য ৮০ হাজার গ্যালন জ্বালানি তেল রাখার মত মাটির নিচে একটি তৈলাধার আছে ,তবে সেটি জনবসতি এলাকার থেকে অনেক দূরে। খাবার জলের পরিষেবা নিয়মিত রাখার জন্য ৪৩৪ হাজার গ্যালন পরিশুদ্ধ জল রাখার মত একটি জলাধার তৈরি করা আছে।
- ভালো রাস্তাঘাট নেই,যানবাহনের ব্যবস্থা নেই,রেললাইন নেই। আছে শুধু পাহাড়ের গা বেয়ে পায়ে চলা পথ, স্কি, আর স্লেজগাড়ি।

এত অসুবিধা সত্বেও অনাদিকাল থেকে মানুষ এখানে আনন্দেই বাস করছে। দুই দ্বীপের বিভাজিকা সীমরেখা গোপনে পার হয়ে ‘ইয়েসটারডে’ আর ‘টুমরো’ দ্বীপের মধ্যে অবাধেই যাতায়াত করে মানুষ, আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে দেখাশোনা করার আর ভালোবাসার টানে। রাজনীতির সীমারেখা বা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা সেই যাতায়াত বন্ধ করতে পারেনি।

সেই মেয়েরা

সন্তোষকুমারী গুপ্তা

উমা ভট্টাচার্য

সন্তোষকুমারী গুপ্তার নাম শুনেছ কী কেউ? এই বাংলার কলকাতার কাছেই উনিশ শতকের অখ্যাত এক আধাশহর গরিফার এক স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী কন্যা। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন।প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশেও ইংরেজ শাসন চলছে। ১৯২৪ সালের ভারতে স্বদেশী আন্দোলন চলছে পূর্ণোদ্যমে। এই অবস্থায় মধ্যেই মাত্র একটাকা দামের 'শ্রমিক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হল কলকাতায়। সম্পাদিকা সন্তোষকুমারী গুপ্তা। অভিনব এই পত্রিকা ছিল সমাজে.র অবহেলিত খেটে খাওয়া শ্রমিকদের বিনোদনের জন্য এক সাহিত্য পত্রিকা, যাতে সারা দেশের শ্রমিকদের খবরের সঙ্গে থাকত তাদের নিয়ে লেখা,আর তাদের লেখা গল্প, কবিতা। থাকতো তাদের আশা- আকাংক্ষার কথা, বঞ্চনার কথা, তাদের নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা।

এই পত্রিকার ২৮ শে নভেম্বরের পূজা সংখ্যাতে 'শ্রমিক' শব্দটির মানে খুব সুন্দর ভাবে লিখলেন তিনি একটি কবিতায়---

"বাহুর শকতি, চরণের বল,বুকের শোণিত, মাথার ঘর্মে,
ভূমি লক্ষ্মীরে উর্বর করি পল্লী- নগর সাজায় হর্ম্যে ।
অশনে বসনে ভূষিয়া সমাজে পর্ণকুটিরে পাতে যে শয্যা,
বাসুকির সম মানবজগৎ মস্তকে ধরি মুছায় লজ্জা।
ধনীর ভ্রুকুটি অঙ্গভূষণ, লাঞ্ছনা যার পারিশ্রমিক ;
ভোগ- সমুদ্র মন্থর বিষ যাহার ভাগ্যে- সেই না শ্রমিক"।

পত্রিকার সম্পাদিকা আর কবিতাটির রচয়িত্রীকে নিয়েই এবারের স্মৃতিচারণ। শ্রমিক পত্রিকার পরবর্তী প্রতিটি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত থাকত এই অপূর্ব কবিতাটি।

তখন ১৯০৯ সাল। দক্ষিণ ব্রহ্মের মৌলমিন শহরের একটি আমেরিকান মিশনারি স্কুল। স্কুল বসবে, তার আগে সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে হবে পড়ুয়াদের। ক্লাসে ঢুকলেন শিক্ষিকা । সবাই উঠে দাঁড়ালো । প্রতিদিন স্কুলে পিয়ানোর সঙ্গে ছাত্রীদের গাইতে হত একটি গান, 'রুল

ব্রিটানিয়া রুলস দ্য ওয়েভস' –ব্রিটেনের রানির প্রশস্তি বন্দনাগীত। একদিন সেই ক্লাসের বারো বছরের কিশোরী মেয়েটি ক্লাসের শিক্ষিকাকে জানালো সে এই গান গাইবেনা। মেধাবী ছাত্রীটি প্রিন্সিপালের খুবই প্রিয়। তাঁর কাছেও নালিশ গেল। তিনি প্রিয় ছাত্রীটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন তুমি এ গান গাইবেনা?'' মেয়েটি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিল, "আমি একজন ভারতীয়, আমি দাস হতে চাইনা, তবে কেন আমি এ গান গাইবো? আমাদের দেশ ইংরেজের অধীন বলে বিদেশীরা সবাই আমাদের নেটিভ বলে, হেয় করে। আমি কেন সেই দেশের রানির বন্দনাগীত গাইব স্কুলে?" এই স্বাধীন মনোভাব আর সত্য বলার সাহস দেখে প্রিন্সিপাল তাকেই সমর্থন করলেন।

ছোট্ট মেয়েটির চেহারা খুব সুন্দর ছিলনা ঠিকই, কিন্তু তার বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, আত্মপ্রত্যয়ী চেহারা সকলকেই আকৃষ্ট করত। বাবা প্রসন্নকুমার রায় ছিলেন মৌলমিনে একজন নামকরা ব্যারিস্টার। তাঁর চাকরির কারণে ইংরেজের প্রতি তাঁর আস্থা আর ভক্তি দুইই ছিল। তাঁর মা ছিলেন কলকাতার নামকরা বিচারক ও স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিত্ব অক্ষয় সেনের মেয়ে- নগেন্দ্রবালা দেবী। তিনিও পিতার মতই ছিলেন স্বদেশপ্রেমী আর জনদরদি মহিলা। স্বাধীন মতপ্রকাশে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিলনা। আর এইরকম দাদামশাই আর মায়ের কাছেই হয়েছিল মেয়েটির স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা। সুদূর রেঙ্গুনে বাস করলেও বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসায় ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মন ভরে উঠেছিল।

তাঁর স্কুলের অনেক শিক্ষিকাও ভারতীয়দের নিয়ে নীচু ধারণা পোষণ করতেন আর সুযোগ পেলেই অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে সে কথা গল্প করতেন। শিক্ষিকাদের এই ভারতবিরোধী মনোভাব ছোট্ট মেয়েটিকে ক্ষুব্ধ আর বিদ্রোহী করে তোলে। আর তাই একদিন সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানায়।

স্কুলের এই খবর বাড়িতে খবর পৌঁছুলে বাবার কাছে যথারীতি ধমক খেলো মেয়েটি , কিন্তু তাঁকে সমর্থন করলেন তাঁর তেজস্বিনী মা। যে সময়ের কথা সে সময়ের চার বছর আগেই ইংরেজ 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষণা করেছে ।(১৯০৫ খৃস্টাব্দে)। সারা ভারত তথা বাংলাদেশে চলছে বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রবল আন্দোলন। বিদেশে থাকলেও নিয়মিত মায়ের কাছে দেশের খবর শোনে মেয়েটি, আর মনে মনে হয়ে ওঠে প্রবল ইংরেজ বিদ্বেষী। স্কুলে ভারতবিরোধী কথা শুনলেই প্রকাশ হয়ে যেত তার রাগ। এই কারণেই ইংলণ্ডে গিয়ে পড়াশোনার জন্য মেয়েটি যে বৃত্তি পেয়েছিল, স্কুল কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে সে সুযোগ তাকে দেওয়া হলনা। তাতে কোনও ক্ষোভ নেই তার। বরঞ্চ একটু একটু করে রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়লো মেয়েটি।

রেঙ্গুনে থাকতেই একটি স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি পেয়ে গেল মেয়েটি, আর সেখানেই 'সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি'র ব্রহ্মদেশ শাখার সদস্য হল মেয়েটি। পুলিশের নজর পড়লো তাঁর ওপর। বাবার কাছে নালিশ আর নির্দেশ এল মেয়েকে গৃহবন্দি করে রাখার। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। সময়টা ১৯১৮ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক কাজকর্ম করার কারণে ব্রহ্মদেশ থেকে পুলিশ প্রহরায় তাঁকে পাঠানো হল কলকাতায় । তাঁকে অন্তরীণ রাখা হল তাঁদের নৈহাটি- গরিফার বাড়িতে, স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় যে বাড়ির পরিচিতি ছিল "চরকা- বাড়ি" বলে। 'দেশবন্ধুর' মন্ত্রশিষ্যা হলেন তিনি। সরাসরি ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ডাকে।। এই মেয়েটিই হলেন মফঃস্বল শহর নৈহাটির স্বল্পখ্যাত গ্রাম গরিফার মেয়ে, দেশের প্রথম মহিলা শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্তা। স্বাধীনতার

আন্দোলনের চারের দশক পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিতে যিনি ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয় ,আজ তাঁর কথা অনেকেই জানেনা। প্রায় সবাই তাঁকে ভুলে গেছে।

স্বদেশে এসেই বিদ্রোহিনী গান্ধিজির ডাকে সারা দিলেন ,কাজ করে চললেন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে। সারা দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নানা মিটিং আর কংগ্রেসের নানা বাৎসরিক অধিবেশনে অংশ নিতে। ভালো বক্তা হয়ে উঠলেন। কাজ করতে শুরু করলেন লালা লাজপত রায়,মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, সরলা দেবী চৌধুরানী, সরোজিনী নাইডু অ্যানি বেশান্ত প্রমুখের সঙ্গে। কিন্তু তিনি যে বিশেষ কাজটির জন্য সকল শ্রমিকের 'মাইজি' বা 'মাইরাম' হয়ে উঠলেন সেটি হল বাংলার মিল শ্রমিকদের জন্য কাজ। তখনও সারা দেশে চটকল মজদুরদের নিয়ে কোনও মহিলা নেত্রী কাজ শুরু করেন নি। দেশে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে , বাংলার অত্যাচারিত তাঁতীদের মধ্যে, নীলচাষে বাধ্য হওয়া খাদ্যফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের মধ্যে, ইংরেজবিরোধী মনোভাব যেমনভাবে বাড়ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হল চটকল শ্রমিকদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। বাংলার মিল শ্রমিকদের দুর্দশার দিকে নজর দেবার মত সংগঠন তখনও গড়ে ওঠেনি মফঃস্বলে। এ কাজে এগিয়ে এলেন সন্তোষকুমারী দেবী। ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'গৌরীপুর ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন''। পরে ১৯২৪ সালে আরও অনেকের সঙ্গে মিলে গড়ে তোলেন "বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন''।

শ্রমিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষকুমারী শ্রমজীবী মহিলাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। দেশবন্ধু লিখলেন, "শ্রমিক স্বরাজকামী—তাই 'শ্রমিক'(পত্রিকা) এই দরিদ্র উৎপীড়িত ও বহুভারাক্রান্ত নারায়ণের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ------ ------ ------ 'শ্রমিক' এর এই নারায়ণ (দরিদ্র শ্রমজীবী) সেবা সফল হউক।"

গরীব শ্রমিকদের জন্য এক পয়সা মূল্যের এই রকম একটি অভিনব কাগজ প্রকাশ করার জন্য সুদূর জাপান থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

সন্তোষকুমারীর মনে মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করার প্রেরণা ছিলেন তাঁর মা। ছোটবেলায় দেশের বাড়িতে এলে দাদুর কাছে(মাতামহ অক্ষয় কুমার সেন),মায়ের কাছে শুনতেন দেশের গরীব মানুষদের দুঃখ দুর্দশার কথা, দেখতেন তাঁর মা সামান্য সামর্থ্যের মধ্যেই কিভাবে নিজেদের গরিফা গ্রামের গরিব মানুষদের সাহায্য করতেন, দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্য করতেন। কালীঘাটে বেড়াতে গেলে দেখতেন জগজ্জননীর মন্দিরের কাছেই ভিক্ষা করছে কত দুঃখী মানুষ, রোগে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া অশক্ত ভিখারীরা। কেউ তাদের সাহায্য করছে ,কেউ আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। মায়ের মত তাঁরও চোখে জল আসতো এদের জন্য। ছোট্ট থেকেই তাঁর মনে সঙ্কল্প তৈরি হয়েছিল যে, বড় হয়ে অসহায়দের জন্য কিছু করবেন।

তাঁদের নৈহাটির বাড়ির কাছেই ছিল গৌরীপুর জুটমিল। সেখানে তখন মিলমালিক আর মালিকের বিশ্বাসভাজন কিছু সর্দারদের অত্যাচারে শ্রমিকরা ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। আট ঘন্টা কাজ আর আর্থিক সুবিধার দাবিতে তারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে মিলে, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেবার কেউ নেই। মালিকও অনড়। ধর্মঘট চলছে, আর সঙ্গে বাড়ছে শ্রমিকদের পরিবারে অনটন, তাদের ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় কাঁদছে।

বাড়িতে থেকেই সন্তোষকুমারী শুনেছিলেন এসব কথা। ১৯২২ সালের কথা। একদিন সকালে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন বাড়ির কাছেই জুটমিলের কুলিলাইনে।

সেখানে এসে কুলি লাইনের শ্রমিক পরিবারের মানুষদের দুরবস্থা। দেখলেন ছেঁড়া কাপড় পরা, অভুক্ত, রোগাভোগা কিছু মানুষ জটলা করছে নিজেদের অবস্থা নিয়ে। এগিয়ে এলেন তিনি এদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে। তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগের কথা তিনি ধারালো ইংরেজিতে লিখে পাঠাতে লাগলেন মালিকের কাছে, আর শ্রমিকদের উৎসাহ দিলেন দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যেতে। তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা আর জোরালো চিঠিতে কাজ হল। মিলমালিকরা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেনে নিলেন, কেউই ছাঁটাই হলনা। শ্রমিকরা ফের কাজে যোগ দিল। এইভাবে শ্রমিক আন্দোলনের এক আদর্শ নেত্রী হয়ে উঠলেন তিনি।

এছাড়া গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে, খিলাফৎ আন্দোলনে, মেয়েদের শিক্ষা আর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ নেত্রীর ভুমিকায় দেখা দিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনকারী মুসলিম সম্প্রদায় তাঁকে ‘খিলাফৎ মেমসাব’ বলে সম্বোধন করত। অবাংলাভাষী শ্রমিকরা তাঁকে ডাকত ‘মাইরাম’ বলে।

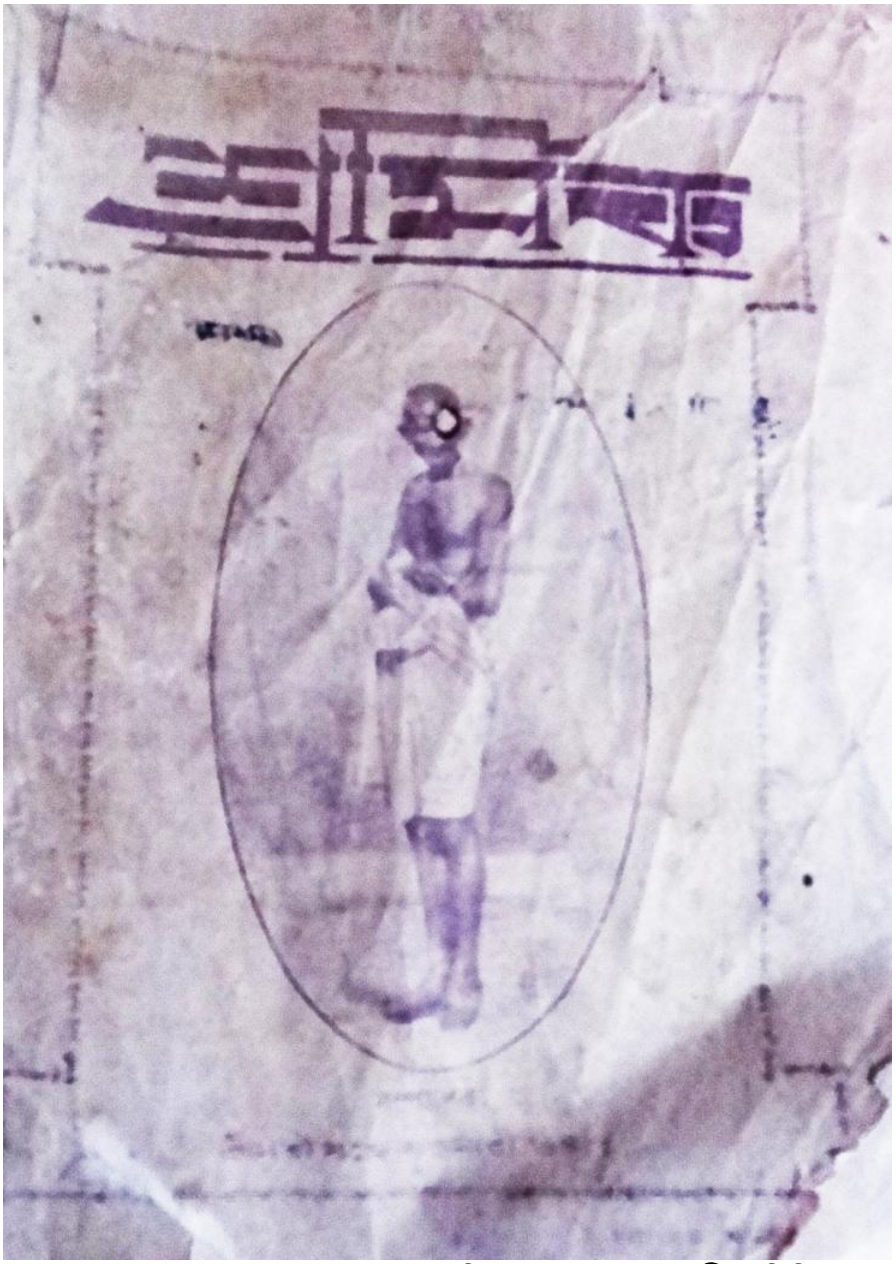

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন কমিটি গড়ে ওঠে। দেশবন্ধুর আমন্ত্রণে এডুকেশন কমিটির সদস্যাও হয়েছিলেন তিনি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সাথে সাথে তাদের হাতের কাজ ও সেলাই শেখানো, স্বাস্থ্যবিধি শেখানো, ঘরবাড়ি ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষাও দিতেন। নারী জাগরণ ও নারীর অধিকারের সপক্ষে কাজ করতে করতে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে মিলে ‘নারী’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। শ্রমিকদের জন্য নিজ গ্রামে নাইট স্কুল খুললেন, সেখানে তাদের খবরের কাগজ থেকে পড়ে শোনানো হত দেশের অন্যান্য অংশের নানা খবর আর শ্রমিকদের খবর। স্থানীয় চিকিৎসকদের সহায়তায় বিনা পয়সায়

শ্রমিক পরিবারের অসুস্থদের চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা করতেন।

শ্রমিক পত্রিকা পড়েই শ্রমিকরা নিজেদের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন হতে থাকেন। এই পত্রিকার প্রতিবাদী লেখার কারণে একবার তিনি ও পত্রিকার সহ সম্পাদক গ্রেপ্তার হন ও সাতদিন গৃহবন্দি থাকতে হয় তাঁকে। সব ভাষাভাষী শ্রমিকের পাঠের সুবিধার জন্য এই পত্রিকা বাংলা ,হিন্দি আর উর্দু এই তিন ভাষাতেই প্রকাশিত হতে শুরু করে কিছুদিনের মধ্যে । ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি সন্তোষকুমারী দেবীর হাত এই তিন ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাটির তিন হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল, যে অর্থের সবটাই তিনি খরচ করেছিলেন তাঁর শ্রমিককল্যাণের কাজে। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা চলেছিল। ১৯২৮ সাল থেকে রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। পত্রিকা প্রকাশও নানা কারণে আর চালু রাখা যায়নি ।

সমাজকল্যানমূলক কাজ তিনি কোনোদিনই বন্ধ করেন নি। মায়াপুর, বজবজ অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নানা সমাজসেবামূলক সংস্থাগুলো অবিস্মরণীয় কাজ করেছে। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘সন্তোষকুমারী শিক্ষা নিকেতন’ আছে দুর্গাপুরে। মায়াপুরেও রয়েছ এই বিদ্যালয়।

ব্রহ্মদেশের পতনের পরই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন গরিফা গ্রামে। গান্ধীজীর ভাবশিষ্যা তাঁর মা ১৯২৪ সালের পর থেকেই গ্রামের বাড়িতে চরকা বসিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গ্রামের দুঃস্থ মহিলাদের দিয়ে সুতো কাটাতেন। আর সেইসঙ্গে গ্রামের অভাবী মহিলারা আয় করার সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভর হতেও শিখছিল। তাদের কাটা সেই সুতো কলকাতায় আনিয়ে সন্তোষকুমারী দেবী তাঁতে কাপড় বোনাতেন। ‘কলকাতার ডক্টরস লেনে’ নিজের বাসগৃহে তিনি তাঁত বসিয়েছিলেন। চরকায় কাটা দেশীয় সুতো দিয়ে দেশীয় তাঁতীদের দিয়ে তিনি বোনাতেন দেশীয় কাপড়। স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার বাড়াতে আর বিলিতি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনের দিক থেকে তাঁর এই কাজ ছিল পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। এই সন্তোষকুমারীই ছিলেন মৌলমিন এর স্কুলের সেই ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনচেতা ছোট্ট মেয়েটি। ১৯৮৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর এই মহিয়সী নেত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁর নিজের জায়গা নৈহাটিরও অনেকেই হয়তো এখনো জানেনা তাঁর কথা। এই লেখার মাধ্যমে জয়ঢাকের তরফে সেই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হল।

ফটোগ্রাফঃ লেখক

ফেলে আসা কলকাতা

সুজয় রায়

ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূত শোনা যায় আজও আছে আলিপুরে হেস্টিংস হাউসে। জনশ্রুতি এই যে দুপুরবেলা বাড়ির বনপথ আলোড়িত করে একখানা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে থামে হেস্টিংস হাউসের গাড়ি- বারান্দাতে। সজোরে দরজা খুলে লাফিয়ে নামেন ওয়ারেন হেস্টিংস. অর্থাৎ তাঁর ভূত। তারপর ছুটে বেড়ান এই ঘর সেই ঘর। হেস্টিংস হাতড়ে বেড়ান এক বাক্সের সন্ধানে। একটা কালো কাঠের বাক্স। তার ভেতর এক দলিল ছিল। আর ছিল দুটো ছবি। ১৭৮৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর হেস্টিংস ক্যালকাটা গেজেট- এ এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন হারানো কাঠের বাক্স উল্লেখ করে।

তবে এসব কথা কতদুর তথ্য- নির্ভর তা বলা যায়না। সম্ভব- অসম্ভবের দোলাচলে রাখে আমাদের। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ডুয়েল লড়েছিলেন আলিপুরের ডুয়েল অ্যাভেন্যু রাস্তায়, প্রতিপক্ষ ছিলেন গভর্নর জেনারেল- এর কাউন্সিল- এর সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস। এর ফলে ফ্রান্সিস গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন।

সমসাময়িক একজনের কথা অবশ্যই বলতে হয়। নাম তাঁর জেমস হিকি। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার অগ্রদূত। তাঁর কাগজ বেঙ্গল গেজেট সেই সেইসময়কার কলকাতায় ছিল একমাত্র সংবাদপত্র। ছাপা পত্রিকা। হাতে লেখা কাগজ নয়। হিকি একাই ছিলেন তার সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর। হিকির কাগজ প্রথম বের হল ২৯ জানুয়ারি ১৭৮০ তারিখে। এই কাগজ ছিল রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সাপ্তাহিক।

হিকি জাতিতে আইরিশ। এ দেশের মাটিতে নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে প্রথ্যম গৌরব তাঁর প্রাপ্য। তখনকার দিনে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং বিচারপতি এলিজা ইমপের জীবনে কেলেংকারির অভাব ছিল না। হিকির কাগজ এদের সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করে এদের কাঠগড়ায় দাঁড় করালো। বৃটিশ তাকে জেলখানাতে কয়েদ করে দিল। হিকি জেলখানাতে থাকাকালিনও কাগজ চালিয়ে গেলেন। অবশেষে গভর্নর

জেনারেল আইন করে হিকির প্রেস তুলে দিলেন। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। হিকি দেউলিয়া হয়ে গেলেন। রাজশক্তিকে আপোসহীন সমালোচনা করবার দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তিনি।

পরবর্তীকালে **১৮১১** সালে দা ইংলিশম্যান নামে একটা সংবাদপত্র প্রকাশ হয় কলকাতা থেকে। পরে সে পত্রিকার দা স্টেটসম্যান নাম হয়। প্রথম বাংলা সপ্তাহিক পত্রিকা (বেঙ্গল গেজেটি) প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। **১৮১৮** সালে বাংলা মাসিক পত্রিকা সে সময় ছিল দিগদর্শন। এরপর **১৮১৮** সালেই ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি, শ্রীরামপুর থেকে মার্শম্যান প্রকাশ করলেন বাংলা সাপ্তাহিক সমাচার দর্পন।

গেরাসিম লেবেদফ কলকাতায় প্রথম রাশিয়ান নাগরিক। তাঁর বয়স তখন ৩৫ বছর। গোলকনাথ দাস নামে তাঁর এক সঙ্গীর সাহায্যে সংগ্রহ করলেন **২৫** নম্বর ডোমতলা রোডের (এখনকার এজরা স্ট্রিট) এক বাড়ি। উদ্দেশ্য এক নাট্যশালা তৈরি করা। **১৭৯৫** সালের **২৭** নভেম্বর বাঙালি অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হল। পরিচালনা করলেন লেবেদফ। মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল দেশী ঢং-এ। তবে দু দিনের বেশি সে নাটক চলে নি। তার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইংরেজ নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ নানা ষড়যন্ত্র শুরু করলেন তার বিরুদ্ধে। এ কথা শোনা যায় যে ডোমতলা রোডের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। মাত্র দশ বছর কলকাতায় থেকে হিন্দি, সংস্কৃত আর বাঙলা শিখেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন একটি ছোট বাংলা অভিধান, বাংলায় একটা ছোট অংকের বই আর করে ফেলেছিলেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রাশিয়ান তর্জমা। ভারত ছেড়ে লন্ডনে গিয়ে তিনি লিখলেন পুব ভারতের ভাষা নিয়ে ব্যকরণের বই “আ গ্রামার অব দ্য পিওর অ্যান্ড মিক্সড ইস্ট ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস।” তারপর

গবনর জানেরেল অনুমতি প্রযান-
লেবেতেব মহাসএর

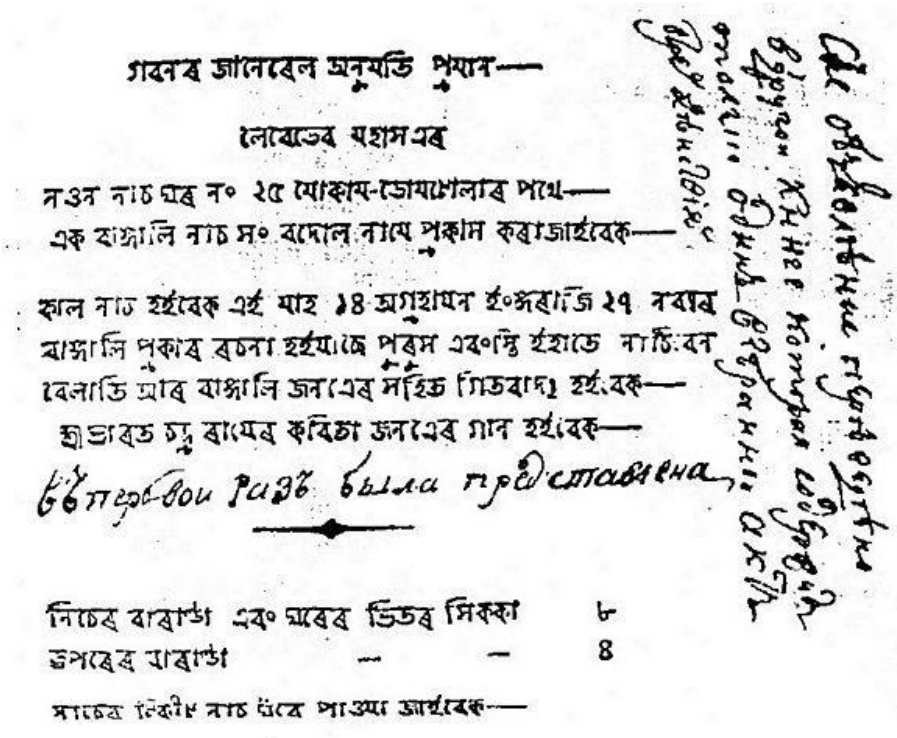

নতুন নাচঘর নং ২৫ মোকাম-ডোমটোলার পথে—

এক বাঙালি নাচ সংবদোল নামে প্রকাস করা জাইবেক—

কাল নাচ হইবেক এই মাহ ১৪ অগ্রহায়ন ইঙ্গরাজি ২৭ নবাম্বর বাঙ্গালী প্রকার রচনা হইয়াছে পুরুস এবং স্তি ইহাতে নাচিবেন
বেলাতি আর বাঙালি জনএর সহিত গিতবাদ্য হইবেক—
শ্রী ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা জনএর গান হইবেক—

নিচের বারান্ডা এবং ঘরের ভিতর সিক্কা ৮
উপরের বারান্ডা -- -- -- -- ৪
নাচের টিকিট নাচ ঘরে পাওয়া জাইবেক--

রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে তিনি একটা ছাপাখানা তৈরি করেছিলেন। সেখানে ছিল বাংলা আর দেবনাগরির টাইপফেস। ইউরোপে সেই প্রথম। এই ছাপাখানাতেই ১৮১৭ সালে তাঁর দেহান্ত হয়। আজকের কলকাতায় তাঁর সম্মানে আছে গেরাসিম লেবেদফ রোড।

লেবেদফের পরবর্তী সময়ে এলিজাবেথীয় আঙ্গিকে ইংরিজি ভাষাতে নাটক রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কলকাতায় সেটা অভিনীত হয়েছিল ১৮৫৮ সালে। এরপর ১৮৭২ সালে গিরীশ ঘোষের মত নাট্যব্যক্তিত্ব চালু করেন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ।

শিমুলিয়ার সুকিয়া স্ট্রিটের বারো নম্বর বাড়ি বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬ সালে এক দশ বছরের বিধবা মেয়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তার বিয়ে দিলেন দিলেন এইখানে।তার পূর্বে ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা আমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছিল সংস্কৃত কবিতায়। বর্তমানে ১২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের অংশটার নতুন পরিচয় কৈলাশ বসু স্ট্রিট। বিদ্যাসাগর নিজের অর্থে নিযে দেখেশুনে পছন্দ করেছিলেন পাত্রীর বস্ত্রালংকার। এ ঘটনার ছ মাস আগে দেশে বিধবা বিবাহের আইন পাশ হয়েছিল।

ক্রমশ

জয়ঢাকের কিচেন

বিতানের প্যানকেক

ইন্দ্রশেখর

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে টিফিনের কৌটোটা খুলেই বিতানের মন খারাপ হয়ে গেল। বেগুনীমাসী আজকেও ফের সেই ছটা বিস্কুট আর একটা সন্দেশ ঢুকিয়ে রেখেছে। বলতে যেতে ঠোঁট উলটে বলল, "ওর বেশি হবে না।"

"আমি তাহলে আজ টিফিনই খাবো না।"

"উঃ। বাবুর রাগ দেখো। এক গেলাস জলও তো গড়িয়ে খেতে জানো না। পারলে নিজে টিফিন বানিয়ে নিয়ে যাও না!"

বিতানের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। দিদিভাইয়ের কলেজ নেই আজ। বসে বসে ফিকফিক করে হাসছিল ওর দশাটা দেখে। সেইদিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচালো বিতান আর তারপর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। তার বেজায় দুঃখ হয়েছে।

তাই দেখে দিদিভাই তাড়াতাড়ি উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে, "চল আজ তোকে আমি একটা টিফিন বানাতে শিখিয়ে দিই। তারপর ইচ্ছে হলে নিজেই বানিয়ে নিতে পারবি যখন খুশি।"

ইশকুলের বাস আসতে তখনো এক ঘন্টা দেরি। বিতানবাবু অতএব দিদিভাইয়ের সঙ্গে রান্নাঘরে চললেন টিফিন বানাতে।

"আয় প্যানকেক বানাই আজ," বলল দিদিভাই, "আমি নাম বলছি, তুই জিনিসগুলো জোগাড় কর।"

অতএব বিতান চলল, ভাঁড়ার ঘরে। সেখান থেকে নিয়ে এলো, খানিক ময়দা, ওট, একটু বেকিং পাউডার, একটু সাদা তিল, কোয়ার্টারচামচ দারচিনির গুঁড়ো, আধ চা চামচ নুন, দু কাপ দুধ, এক কাপ টক দই, তিন টেবিলচামচ মাখন, খানিক মধু, গোটা দুতিন কলা (বেগুণীমাসী সেগুলোকে মিহি করে চটকে দিয়েছিল), দুখানা ডিম।

মিক্সিতে ওট আর তিল ভালো করে গুঁড়ো করে নিয়ে তার সঙ্গে ময়দা, নুন, বেকিং পাউডার, দারচিনির গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে একটা গামলার মধ্যে রাখল বিতান। দিদিভাই বলে বলে দিচ্ছিল আর সে কাজগুলো করছিল। আজ বেগুনীমাসীকে দেখিয়ে দিতেই হবে সে কেমন রান্না করতে পারে।

এইবার আরেকটা বড় বাটিতে দুধ, দই, মাখন, চটকানো কলা,মধু আর ডিম মিশিয়ে চামচ দিয়ে খুব ভালো করে ঘুঁটে নিল।

এইবার গামলায় রাখা ময়দাটয়দার পাহাড়টার মাঝখানে একটা গর্ত করে তার মধ্যে বাটির মিশ্রণটা ঢেলে দিয়ে আস্তে আস্তে দুটোকে মেশাতে বেশ একটা দারুণ দেখতে নরমসরম মন্ড তৈরি হয়ে গেল।

“খেয়াল রাখিস যেন খুব নরম হয় আর যেন ভালো করে মেশে, নইলে খেতে ভালো হবে না কিন্তু,” দিদিভাই সাবধান করে দিচ্ছিল বারবার।

মন্ডটা তৈরি হয়ে যেতে, হটপ্লেটের সুইচ অন করে তাতে একটা নন স্টিকি প্যান বসানো হল। সেটা গরম হতে তাতে সামান্য তেল ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর অ্যাত্তোটা অ্যাত্তোটা করে মন্ড ছড়িয়ে দিচ্ছিল বিতান রুটির মতন করে। খানিক বাদেই সেটা শক্ত হয়ে গিয়ে তার ওপরের দিকটাতে বুজকুড়ি কাটা শুরু হতেই সেটাকে উলটে দেয়া হল। তলার দিকটা তখন সোনালী রঙ ধরেছে। আর কী সুন্দর গন্ধ তার! খানিক বাদে উল্টোদিকটাও সোনালি হয়ে উঠতে প্যানকেকটা নামিয়ে এনে সটান টিফিন বক্সে চালান করল সে। এমনি করে গোটাতিনেক প্যানকেক টিফিন বাক্সে রাখবার পর আরো একখানা তৈরি করে দিদিভাইয়ের দিকে এগিয়ে ধরল সে। বলল, “এটা তোমার টিউশন ফি।”

“আমায় একটা দিবি না?” বেগুনীমাসী এসে হাত পেতে দাঁড়িয়ে ছিল।

“নিজে বানিয়ে খাও না? আমার এখন অনেক কাজ। ইশকুল যেতে হবে,” বিতান গম্ভীর গলায় উত্তর দিল।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

তাঁতীয়া মামার কাহিনি

উমা ভট্টাচার্য

দেশপ্রেমিক হিসাবে ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ,নানাসাহেব আর তাঁতীয়া টোপীর কথা দেশের প্রায় সব মানুষই জানে। কিন্তু তাঁতীয়া মামা,ওরফে তাঁতীয়া ভীলের কথা প্রায় কেউই জানেনা, যেমন জানেনা ঝলকারী কোরিনের কথা। এঁদের মতই তাঁতীয়াও বুন্দেলখন্ডের মানুষ। শুধুমাত্র জনশ্রুতি আর লোকের মুখে মুখে বলা গল্পের মধ্যে বেঁচে আছে তাঁর নাম।

ঝাঁসির মতই মহারাষ্ট্রের একটি বিস্তৃত রুক্ষ অঞ্চল,খান্ডোয়া। সেখানেই বাড়ি ঠাকুর বিশ্বেশ্বর সিং- এর। বিশ্বেশ্বর সিং ছিলেন একজন সেনাকর্মী,অবসর নেবার পরে এখন পালা করে থাকেন দুই ছেলের কাছে। বড় ছেলে হোসিয়ার সিং খান্ডোয়া জেলায় পুলিশের একজন নামকরা সার্কেল ইন্সপেক্টর,আর ছোট ছেলে গাবরু সিং খাণ্ডোয়া জেলারই অন্য এক পুলিশ স্টেশনের একজন সার্জেন্ট। দুজনেই সেদিন বাড়ি এসেছেন, ছুটিতে নয়,এলাকার ধনী আর প্রতাপশালী লোকদের ত্রাস এক দুর্ধর্ষ ডাকাতকে ধরার কাজে।পুলিশের খাতায় ডাকাত বলেই চিহ্নিত তাঁতীয়া। সেদিন রাতে দুইভাই খাওয়া দাওয়ার পরে শুয়েছেন একই ঘরে। দুজনেই জানেন যে তাঁরা যাকে ধরতে এসেছেন তার কাছে কোনও খবরই গোপন থাকেনা, তাদের গ্রামে আসার খবরও গোপন নেই। ভীষণ চতুর আর কৌশলী ডাকাত সে।

তাই মনে একটা ভয় নিয়েই শুয়েছেন দুই ভাই। অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে আলোচনা করেছেন নিজেদের কাজের কৌশল নিয়ে।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘরের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ঘুষোঘুষি, মারামারি। ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ আর 'তন্দ্রা', 'তন্দ্রা' বলে চিৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে। ছুটে এলেন বাবা বিশ্বেশ্বর সিং।দরজা খুলে টর্চের আলোয় দেখেন দুই ছেলেই একে অন্যকে ঘুষি,চড়,মারছে। বিশ্বেশ্বর চিৎকার করে থামালেন দুজনকে। বাবার প্রশ্নের উত্তরে দু ভাই জানালেন রাতে ঘুমের মধ্যে কোন শব্দ শুনে দুই ভাইই উঠে পড়েন। তারপর একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পরস্পরকে তাঁতিয়া ভেবে জাপটে ধরে মারতে শুরু করেছিলেন তাঁরা। তন্দ্রা ওরফে তাঁতীয়া ভীলকে নিয়ে এমনই আতঙ্ক ছিল পুলিশের মনেও।

ডাকাত হতো কারা? চিরকালই গ্রামের নিপীড়িত, অত্যাচারিত, না খেতে পাওয়া সাধারণ কিছু মানুষ অবস্থা বিপাকে বাঁচার জন্য কোনও জীবিকা না পেয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার জীবিকা অবলম্বন করতো। আমাদের বাংলায় যেমন ছিল বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাত, গৌর বেদে ডাকাত তেমনই মধ্যভারতে খান্ডোয়া অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল তন্দ্রা বা তাঁতীয়া ডাকাত। গরীব মানুষের কাছে সে ছিল তাঁতীয়া মামা, ঠিক রবিনসন ক্রুশোর মত দয়ালু। খান্ডোয়া তখন ইংরেজের অধীন। গ্রামে সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশা। একদিকে কোম্পানির সাহেব আর টমিদের অত্যাচার,অন্যদিকে গ্রামের মুখিয়া আর খাজনা আদায়কারী জমিদারদের অত্যাচার। সেই সময়ই তৈরি হয়েছিল এমন কিছু 'ডাকাতদল'। তবে তাঁতীয়া মামার দল ছিল গরিবের সহায়। তারা সেসময় পুলিশ, জমিদার, আর বড়লোকদের মনে খুবই আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।বুদ্ধি আর কৌশলে সে ও তাঁর সঙ্গীরা ছিল পুলিশের থেকেও দক্ষ। এদের জন্য ঘুমিয়েও শান্তি ছিলোনা অত্যাচারীর আর তাদের রক্ষাকারী পুলিশের। এইভাবেই খান্ডোয়া অঞ্চলের এক সাধারণ ভীল যুবক তাঁতীয়া ক্রমশ সেখানকার গরিব মানুষদের নির্ভর হয়ে

ওঠে। ‘তাঁতীয়া মামা’ নামে তাঁকে ডাকতে শুরু করে সবাই। পাড়ার লোকে তাকে ডাকত ‘তন্দ্রা’বলে।

নিমারের ‘ভিদ্রা’ গ্রামে ১৮৪২ সালে জন্মের কিছুদিন পরই তাঁতীয়া মাকে হারায়। মা- হারা শিশুর ঘরে আদর- যত্ন নেই। গরীব চাষী বাবা ভান সিং ভীল কাছেই ‘পোখার’ গ্রামে নিজের কিছু জমিজমাতে আবাদ করে কষ্টেসৃষ্টে দিন গুজরান করতেন। ছেলের দিকে সেভাবে নজর দেবার সময় কোথায় তাঁর? দুঃখকষ্ট, অভাব অনটন ছিল এই গরীব মানুষদের বংশপরম্পরায় একমাত্র নিত্যসঙ্গী।

বাড়িতে ভালো লাগেনা ছোট্ট তাঁতীয়ার। সারাদিন মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়,খেলে, পাখি শিকার করে। তাঁতীয়ার সঙ্গে ছিল তাঁর আরও দুই সাকরেদ, ডোপিয়া আর বিশালদেহী বিজনিয়া। এছাড়া সঙ্গে ছিল আরও কিছু সাহসী আর গরিবদরদি ভীল যুবক। ক্রমে তাদের সর্দার হয়ে ওঠে তাঁতীয়া।

আমাদের বাংলার নিমাইয়ের (শ্রী চৈতন্যদেবের) মত দুর্দান্ত ছিল বালক তাঁতীয়া। ভয়ডর বলে কিছু ছিলনা তার, মজার খেলা ছিল লুকিয়ে গ্রামের কাছকাছি মানুষদের বাড়ির গাছের ফলমূল পেড়ে মজা করে খাওয়া। কখনও কখনও খিদের জ্বালায় অন্যের খেতের ছোলামটরের মত ফসল লুট করে দল বেধে খেত গাছের ছায়ায় বসে। বড়লোকেদের ক্ষতি হলে তারা মাঝে মাঝে ধরে তাকে মারধরও করত। ফলে ছোট ছেলেটি আরও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে লাগল। সে ক্রমে লক্ষ্য করলো বড়লোকরা তাঁর বাবার মত অনেক গরিব মানুষদের উপর অত্যাচার করে, ফসল উঠলে মিথ্যা ঋণের দায়ে চাষীদের ফসল কেড়ে নেয়, না দিলে মারধর করে, ঘরবাড়ি লুট করে সব কেড়ে নিয়ে যায়। কেউ এদের বিচার করেনা। পুলিশও এদেরই রক্ষা করে। তাই এবার সে দলবল নিয়ে শুরু করলো অত্যাচারী বড়লোকদের জমির ফসল কেটে নেওয়া, ফসলের গোলা লুট করা, আর সেই শস্য গরিব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার কাজ ।ফলে শুরু হল তার আর তার দলবলের উপর আক্রমণ, মারধর।

এইভাবে চলতে চলতে তাঁতীয়া যত বড় হতে লাগলো তত কঠোর হতে লাগলো। একবার তাকে ধরতে না পেয়ে গ্রামের মোড়ল তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেলে কিশোর তাঁতীয়া ক্ষমা চেয়ে বাবাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল,আর তারপর থেকে কিছুদিন শান্ত হয়ে বাবার সঙ্গে ক্ষেতের কাজ করতে যেতে লাগলো। সেইসঙ্গে সাধ্যমত গরিবদের সাহায্য করা চালাতে থাকলো সে।

তার যখন ত্রিশ বছর বয়স, তখন বাবা মারা গেলেন। জমির সব দায়িত্ব পড়লো তার উপর।এইবার বাধল গোল। একেই শুখার দেশ খান্ডোয়া, চাষের ভরসা একমাত্র আকাশের জল। সে বছর খরা হল, একফোঁটা বৃষ্টি নেই,ফসল শুকিয়ে গেল মাঠেই। কিন্তু জমিদারের আর মহাজনের তাতে কী? তারা জোর করে খাজনা আদায় শুরু করলো। না দিতে পারলে শুরু হল লুটপাট। কিন্তু যেসব লোক খাজনা আদায়কারী অফিসারকে লুকিয়ে কিছু কিছু ঘুষ দিতে পারলো তাদের খাজনা মকুব করে দিতে লাগলো। তাঁতীয়া সব দেখেশুনে প্রতিবাদ করলো,আর তার সঙ্গে অনেক গরিব মানুষ সামিল হল। সে নিজের জমির খাজনা তো দিলই না, অন্যদেরও দিতে বারণ করলো। পেয়াদা এসে তার জমির দখল নিল। কিন্তু তাঁতীয়া তার সাতপুরুষের জমি ছাড়বেনা, জোর করে জমিতে চাষ করতে শুরু করলো। তার নামে নালিশ গেল আদালতে, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল, একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল তার।

জেলের অত্যাচারে আরও কঠিন, আরও প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ হয়ে উঠলেন তিনি। জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে রুজির জন্য অন্যের জমিতে দিনমজুর খাটতে শুরু করলেন। এদিকে মজবুত চেহারার, সাহসী, দুর্দম তাঁতীয়ার উপরে নজর পড়লো গ্রামপ্রধান প্যাটেলের। প্যাটেল চাইল তাঁতীয়া তাঁর বাড়িতে চাকর হিসেবে থাকুক, আর তাঁর হয়ে কাজ করুক। কিন্তু স্বাধীনচেতা তাঁতীয়া কারও চাকর হতে রাজী হলেন না।ফলে প্যাটেল রেগে গিয়ে তাঁতীয়াকে যে কোনও উপায়ে ফাঁদে ফেলার জন্য ফন্দি আঁটতে লাগলো, তাঁর বিরুদ্ধে গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে দল ভারী করলো।

কদিন বাদে একটা সুযোগও হাতে এসে গেল প্যাটেলের। গ্রামের এক বাড়িতে চুরি হল।সেই চুরির মাল পাওয়া গেল চোরের বাড়িতে। কিন্তু প্যাটেল চোরকে দিয়ে স্বীকার করালো যে তাঁতীয়াই তাকে চুরি করতে পাঠিয়েছিল। পুলিশ এল তাঁতীয়ার বাড়িতে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে। তাঁতীয়া পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। পুলিশের সঙ্গে মারপিট বেধে গেল তাঁর। তাঁর বাড়িতে চুরির জিনিস পাওয়া যায়নি, তাই চুরির জন্য তাঁকে ধরা গেলনা, কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত তোলার অপরাধে তাঁর আবার একবছরের কঠিন হাজতবাস হল।প্যাটেলের মিত্র পুলিশ জেলে তাঁর উপর এত অত্যাচার করলো যে জেল থেকে বের হয়ে এল অন্য এক তাঁতীয়া, আরো কঠোর, কৌশলী,আর প্রতিহিংসাপ্রবণ। গরীবের বন্ধু আর দুষ্টের শত্রু। পুলিশও হয়ে গেল তাঁর আক্রমণের লক্ষ।

সমাজের মাথা জমিদার আর মাতব্বরদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তাঁতিয়া এবার দল তৈরি শুরু করলেন। একাজ তো একা করা সম্ভব না! জুটে গেল খাজুরি গ্রামের আর এক দামাল ভীল যুবক, বিশালদেহী 'বিজানিয়া'। আর জুটে গেল 'ডোপিয়া'নামে আর এক সঙ্গী,যে ছিল ভীষণ নিষ্ঠুর আর চতুর। এরকম আরও দশজন ভীল যুবক যোগ দিল তাঁর দলে। এরা সকলেই গরিব আর অত্যাচারিত ভীল পরিবারের সন্তান, তাই কষ্টে থাকতে থাকতে হয়ে উঠেছিল কঠোর আর তাঁতীয়ার প্রতি ছিল তাদের অটুট আস্থা, আর গরিবদের প্রতি দয়ালু মনোভাব।এই দল নিয়ে তাঁতীয়া হয়ে উঠেছিলেন পুলিশেরও ত্রাস।

শুরু হল ইংরেজ পুলিশের ভাষায় ডাকাত তাঁতীয়ার অভিযান। বড়লোক,মোড়ল,আর তাদের সাহায্যকারী পুলিশ হল তাঁর মূল শত্রু। জঙ্গলে ডেরা বেঁধে সেখান থেকে তাঁরা বের হতেন শুধু ডাকাতি করার জন্য, আর প্যাটেল গ্রামের কারও উপর অত্যাচার করেছে শুনলে তার প্রতিশোধ নিতে। তাঁর ছিল বিশ্বস্ত খবর সংগ্রহকারী দল।পথেঘাটে প্যাটেলের বিশ্বস্ত লোকজন পেলেই তাকে অপহরণ করতো, আর একমাত্র মোটা মুক্তিপনের বিনিময়েই ছাড়তো। আর সেই টাকা দিয়েই হত গরিব মানুষদের সাহায্যদান, কারও মেয়ের বিয়ের টাকা দেওয়া, অন্নহীন মানুষদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া, রোগীর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

প্যাটেল আর ধনী মানুষেরাও চুপ করে বসে থাকতোনা। তারাও সবসময় ব্যস্ত থাকতো তাঁতীয়াকে কীভাবে জেলে পাঠানো যায় সেই সুযোগের খোঁজে। প্যাটেল একবার লোক মারফৎ তাঁতীয়ার সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য বলে পাঠালো। অনেক দিন ধরে খোশামোদ করার পর সরল বিশ্বাসী ভীল তাঁতীয়া ভাবলেন যে, বয়স তো হয়েছে প্যাটেলের, তাই হয়ত কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ হয়েছে। এই সুযোগে যদি গ্রামের গরিবদের জন্য কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করানো যায় তবে ভালোই হয়। তাই তিনি প্যাটেলের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন তার

বাড়িতে। প্রতারক প্যাটেল তখন তাঁকে পুলিশের হাতে সদলে ধরিয়ে দিল। তাঁদের রাখা হল কড়া প্রহরায় খান্ডোয়া জেলে।

তাঁতীয়ার স্বভাবের বিশেষত্বই ছিল যদে সে শত্রুকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পালাতো।এবারও তার ব্যত্যয় হলনা। ভাগ্যক্রমে সেবার জেলে তিনজনই ছিল এক কুঠুরিতে।জে.লে তাদের কুঠুরির সামনে একদিন একটা লোহার রড পরে থাকতে দেখতে পেয়েই ডোপিয়া সবার অলক্ষে সেটা তুলে নিল, আর লুকিয়ে রাখল নিজেদের কুঠুরিতে। তারপর প্রতি রাতে একটু একটু করে দেয়ালে একটা গর্ত করলো তারা, আর এক অন্ধকার রাতে একজন একজন করে সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেল কুঠুরি থেকে, সঙ্গে নিল পাতলা কালো কম্বলগুলো। বেরিয়ে দেখে সামনে উঁচু পাঁচিল। তাতে কী? ইচ্ছা থাকলেই উপায় হতে বাধ্য। ভীমাকার বিজানিয়া ডোপিয়াকে কাঁধে তুলে নিয়ে দাঁড়ালো পাঁচিল ঘেঁষে।তাঁতীয়া কম্বলগুলোকে জোড়া দিয়ে তার মাথায় একটা ভারী পাথরের চাঁই বেঁধে ডোপিয়ার হাতে দিয়ে পাঁচিলের বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন আর সেটা বেয়ে দুজন পাঁচিল পার হয়ে গেল। শেষে তাঁতীয়া পাঁচিলের মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ জানালেন প্রহরীদের, "আমি তাঁতীয়া। জেল থেকে পালাচ্ছি,ক্ষমতা থাকে তো ধরো আমাকে।" নিশুতি রাতের নীরবতা খানখান হয়ে ভেঙে শোনা গেল তাঁর কথা। যতক্ষণে সবাই তাদের ধরবার চেষ্টা শুরু করলো, ততক্ষণে তাঁতীয়ার দল বহুদূরে। রাতের অন্ধকারে ৬০ মাইল রাস্তা পেরিয়ে তারা পালিয়ে গেল।

এবার তাঁতীয়া শুরু করলেন বাংলার স্বদেশী ডাকাতদের মত কাজকর্ম। ততদিনে তাঁরা তাঁদের রাজ্যের ঝাঁসীর রানির বীরত্বের কথা শুনেছেন ,শুনেছেন দেশজুড়ে সিপাহী বিদ্রোহের কথা, ইংরেজ যে দেশের প্রধান শত্রু সে সত্যটা বুঝতে শিখেছেন। শুরু হল তাঁতীয়ার হাতে ইংরেজের হয়রানি। তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন সরকারী খাজনা লুট করা অন্যায় নয়,কারণ সেই খাজনা সংগ্রহ করা হয় দেশের মানুষের কষ্টের উপার্জন কেড়ে নিয়ে।

জেল থেকে বেড়িয়ে প্রথমেই পোখার গ্রামের প্যাটেলকে তিনি শাস্তি দিলেন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তাকে বাড়ির বাইরে বার করে শেষ করে দেয়া হল। কিন্তু বাড়ির মেয়েদের, শিশুদের আর বৃদ্ধদের কোনো ক্ষতি করা হল না, বাড়ি লুটপাটও হল না। নির্দোষ মানুষদের কোন ক্ষতি করা ছিল তাঁর নীতিবিরুদ্ধ।

১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তাঁতীয়া ৪০০টিরও বেশি গভর্নমেণ্টের খাজনা লুট করে, সেগুলি গরিবদের মধ্যে বিতরন করে তাদের দুঃখ লাঘব করে গিয়েছেন। বারবার নানা বেশে- কখনও নাপিত সেজে ইংরেজ সাহেদের দাড়ি কামিয়ে দিয়ে গেছেন , কখনও কুলি সেজে পুলিশের মোট বয়ে নিয়ে গেছেন। কখনও ধরা পড়েননি। ব্রিটিশের শাসন এলাকার মধ্যেই এই দল ইংরেজ সেনা আর পুলিশ অফিসারদের এত নাকাল করেছিল যে, ব্রিটিশ সরকার তাঁতীয়ার ডাকনামে 'তন্দ্রা পুলিশ' নামে একটি স্পেশাল পুলিশ বাহিনি তৈরি করেছিল।

শেষমেষ ডোপিয়া আর বিজানীয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও তাঁতীয়াকে পুলিশ ধরতে পারেনি। বিজানীয়াকে ফাঁসি দিল ইংরেজ সরকার আর প্রতিবাদের কন্ঠ রোধ করতে দুদিন বিজানীয়ার মৃতদেহটি রাস্তার পাশে গাছে ঝুলিয়ে রাখল প্রকাশ্যে। ডোপিয়া ধরা পড়ে জেলে গেল, কিন্তু আবার জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

বিজানীয়ার মত শক্তিশালী সঙ্গীর পরিণতিতে সাময়িক ভেঙে পড়েছিলেন তাঁতীয়া, কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকার পর আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন তিনি।বারবার এনকাউন্টারেও পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। এভাবে ১১ বছর কেটে গেল। ক্ষুধার্ত,হীনবল,হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত, অবসন্ন,হৃতমনোবল হয়ে, প্রায় ৪৫ বছরের তাঁতীয়া পুলিশের সঙ্গে সমঝোতার চিন্তা করলেন।

বিজানীয়ার পরিণতি দেখে কেউ আর তাদের আদরের তাঁতীয়া মামাকে আশ্রয় দিতে

সাহস করতোনা। কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান তাঁকে নিজে থেকে পুলিশের হাতে ধরা দিতে দিলনা। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পনের জন্য একজন মধ্যস্ততাকারীর খোঁজ করতে লাগলেন বীর তাঁতীয়া। গণপৎ নামে এক লোভি মোড়ল তাঁকে পুলিশের সঙ্গে সম্মানজনক সমঝোতা করিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দিয়ে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলো। ১৮৮৬ সালে রাখীবন্ধন উৎসবের দিন গ্রামের মোড়লের বাড়িতে খেতে বসা অবস্থায় অভুক্ত, নিরস্ত্র তাঁতীয়াকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। ১৮৮৬ র ২৬শে সেপ্টেম্বর জব্বলপুরে ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে বিচার হল তাঁর, আর নভেম্বরে এই মানবদরদী, গরিবের বন্ধু ‘তাঁতীয়া মামার’ ফাঁসি হয়ে গেল।

আজ এসো সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি বিস্মৃত দেশপ্রেমী, জনদরদি মানুষটিকে, মাথা নত করি তাঁর উদ্দেশ্যে। দেশকে ভালবেসেছিলেন, তাই দেশের মানুষের ভালো করার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন তিনি নির্দ্বিধায়। এখনও হয়ত এমন মানুষটির অনেক কথাই অজানা থেকে গেল।।

- বিশেষ দ্রষ্টব্য—পরের সংখ্যায় তাঁতীয়া মামার দুএকটি কান্ডকারখানার কথা থাকবে আশা রাখছি।

সিনেমা হল

আ সিরিজ অফ আনফর্চুনেট ইভেন্টস

মহাশ্বেতা

তিন ভাই বোন। বড় দিদি ভায়োলেট যন্ত্রী, সাধারণ আটপৌরে জিনিস দিয়ে তৈরি করে ফেলে অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র। মেজ ভাই ক্লস বড় মাপের পড়িয়ে, বাবা মায়ের বিশাল লাইব্রেরির প্রায় সমস্ত বইই তার পড়া, জাহাজ বানানো থেকে দর্শন, সবেতেই তার অগাধ জ্ঞান। সবার চেয়ে ছোট বোন সানির অবশ্য অন্য একটা গুণ আছে। সে কামড়াতে ওস্তাদ। তার দাঁতগুলো যেমন শক্ত, তেমন ছুঁচোল। তাই দিয়ে কখনো কখনো সে টেবিল কামড়ে ধরে ঝুলে থাকে। তিন ভাই বোন সুখে শান্তিতেই থাকত নিজেদের শখ- শৌখিনতা নিয়ে, কিন্তু একটা ঘটনা তাদের আরামের জীবন একেবারেই বদলে দিল। একটা রহস্যময় অগ্নিকান্ডে জ্বলে গেল তাদের অত প্রিয় বাড়ি। মারা গেলেন বাবা ও মা। বাবা মায়ের উইল অনুসারে তাদের নতুন অভিভাবক হল কাউন্ট ওলাফ, কিন্তু সেই লোকটাকে তারা জীবনে চোখেও দেখেনি। কিছুদিন তার সঙ্গে থাকার পরই বুঝতে

পারল যে লোকটা এক নম্বরের শয়তান। সকাল হতেই ভাই বোনের হাতে একটা বিশাল বাড়ির কাজের ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে যায়, মাঝে মাঝে তার নাটকের দলকে সঙ্গে নিয়ে এসে উদ্ভট রিহার্সাল দেয় বসবার ঘরে আর যখন পারে ভায়োলেট, ক্লস আর সানিকে অপমান করে। শুধু তাই নয়, তারা এও টের পেল যে ওলাফের ঝোঁক শুধু তাদের বাবা মায়ের রেখে যাওয়া বিশাল সম্পত্তির দিকেই, তাদের প্রতিপালন করার ব্যাপারটা আসলে শুধু লোক দেখানোর জন্য। সম্পত্তির কাগজ হাতে পাওয়া মাত্রই ওলাফ যে তাদের সরানোর চেষ্টা করবে এও বুঝতে পারল তারা। আর হলও ঠিক তাই। সাজানো দুর্ঘটনায় একবার মরতে মরতে বাঁচল, শুধু তাদের উপস্থিত বুদ্ধির কল্যানে। তারপর ওলাফকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকের বাড়িতে গেল বটে, কিন্তু ওলাফ তাদের পিছু ছাড়ে না। রহস্যময়ভাবে, উদ্ভট সব ছদ্মবেশে, নাটকের দলের সাহায্যে তাদের পিছু করতেই লাগল বিভিন্ন ভাবে। আর ভাইবোনের অ্যাডভেঞ্চারের সাথে সাথে ক্রমশ ঘন হতে থাকে রহস্য ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জাল। বাকিটা জানতে দেখে নাও ‘লেমনি স্নিকেটসঃ আ সিরিজ অফ আনফর্চুনেট ইভেন্টস’। অবশ্য একটা কথা বলে রাখি- রহস্য, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, ইটালিয়ান খাবার, ছদ্মবেশ অথবা ষড়যন্ত্র যদি তোমাদের ভাল না লাগে, তাহলে এই ছবিটা না দেখে বরং অন্য কিছু দেখ। কিন্তু, যদি এর মধ্যে একটাও তোমার পছন্দের জিনিস হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু ভুলেও ছবিটা দেখতে ভুলো না। ভাল লাগবে।

তথ্য
নামঃ লেমনি স্নিকেটসঃ আ সিরিজ অফ আনফর্চুনেট ইভেন্টস
ভাষাঃ ইংরিজি
বছরঃ ২০০৪
রেটিং- বাবা মায়ের সাথে দেখা উচিৎ

নিরাশ অভিলাষ

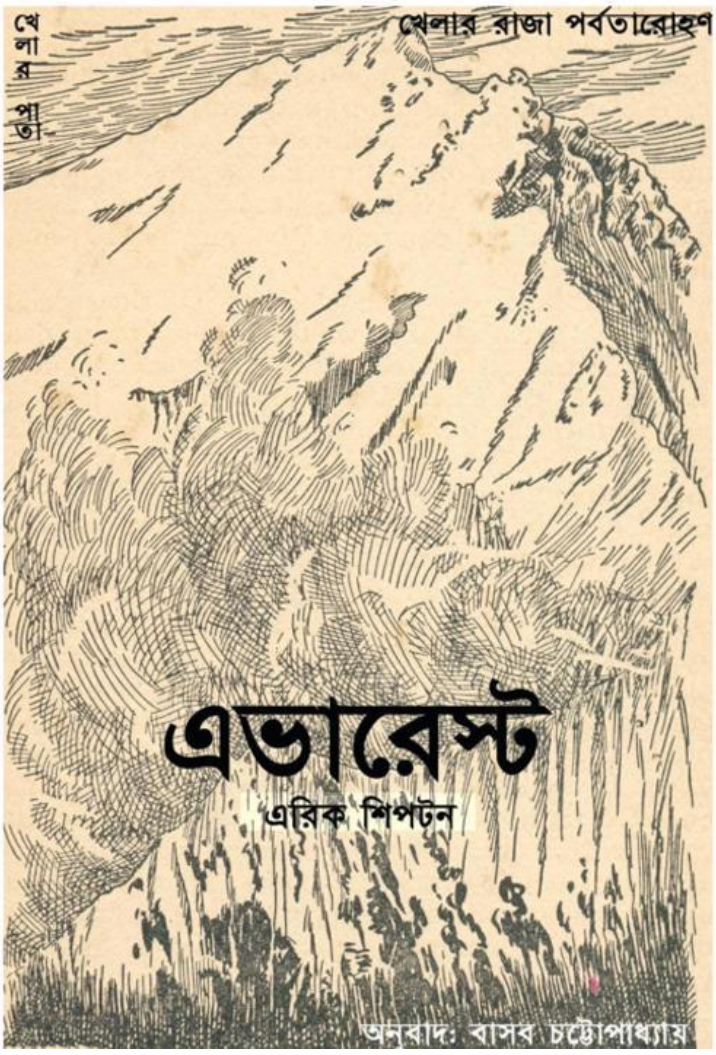

পরবর্তী এভারেস্ট অভিযানের প্রস্তুতি নিতে ন'বছর কেটে গেল। এমন নয় যে অভিযাত্রীদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল। বিলম্বের প্রধান কারণ তিব্বত সরকারের কাছ থেকে ফের এভারেস্ট অভিযানের অনুমতি না পাওয়া। অবশেষে ১৯৩২ সালে অভিযানের অনুমতি মিলল। এভারেস্ট কমিটি ১৯৩৩-এ হিউজ রাটলজ-এর নেতৃত্বে এভারেস্ট অভিযানের সিদ্ধান্ত নিল।

এভারেস্ট অভিযাত্রী দল নিবার্চিত হল। পূর্বের অভিযাত্রী দল থেকে ই. ও. সেবার (ট্রান্সপোর্ট অফিসার) সি. জি. ক্রফোর্ড ছাড়া ১৯৩১ সালের কামেট অভিযানের শৃঙ্গারোহীদের মধ্যে থেকে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ, রেমন্ড গ্রিন, জে বার্নি এবং আমি নিবার্চিত হলাম। এছাড়াও বাউস্টন, জি. উড. জনসন, এল আর ওয়াগার, পি ওয়ান হ্যারিস, জে লঙল্যান্ট, টি এ ব্রোকলব্যাঙ্ক এবং ডব্লুউ ম্যাকলিন-এর মতো অভিজ্ঞ পবর্তারোহীদের দ্বারা প্রস্তুত হল ১৯৩৩-এর এভারেস্ট অভিযাত্রী দল। ১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ড থেকে দ্রুত আমাদের সাতজন অভিযাত্রীকে নিয়ে আসা হল। যাত্রা শুরু থেকেই আমরা অধিকাংশ সময় অভিযানের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই আলোচনায় ব্যস্ত রইলাম। দলের আত্মবিশ্বাস এতই অটুট ছিল যে এবারের অভিযানের সাফল্য নিয়ে অভিযাত্রীদের আর কোন সংশয় রইল না। অধিকাংশ অভিযাত্রী একমত হলেন যে উচ্চতর শিবির স্থাপন করা হবে নর্থ কলের থেকে আরো উচ্চতায়।

ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। অভিযাত্রীরা নিশ্চিত ছিলেন শৃঙ্গ আরোহণের জন্য যে চূড়ান্ত শিবির স্থাপন করা হবে তা যেন অবশ্যই ১৯২৪ সালের মত ষষ্ঠ শিবিরের

থেকেও আরো উচ্চতর স্থানে স্থাপন করা হয়। সেক্ষেত্রে নর্থ কলের ওপর আরো দুটি শিবির স্থাপন করে এই অভিযানের সফলতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ শেরপাদের পক্ষে ২৩০০০- ২৮০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত মাত্র দুটি পর্যায়ে ঐ বিপুল পরিমাণ অভিযানের সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ফলে খাদ্য ও তাঁবু বহন করার জন্যে প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত মালবাহকের আবার অতিরিক্ত মালবাহকের জন্য অধিক খাদ্যসামগ্রী ও আশ্রয়ের ব্যবস্থার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন-- অভিযাত্রীরা কোন পথে যাত্রা শুরু করবেন? প্রথম এভারেস্ট অভিযাত্রী দল লক্ষ করেছিলেন –উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আরোহণ সহজতর হয়ে ওঠে কিন্তু অভিযানের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় তীব্র শীতল হাওয়ার প্রকোপ। পাথুরে খাড়াই পথে আরোহণ যত না কঠিন, তার চেয়ে বেশি কঠিন এই ভয়ানক হাওয়াকে প্রতিহত করা। নর্থ কলের উচ্চতর স্থান থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর- পূর্ব শৈলশিরা ধরে যে পথ অগ্রসর হয়েছে, সেই পথ ধরে অভিযান খুবই বিপজ্জনক। শৃঙ্গের শেষ ২০০০ ফুট তিনটি পাথুরে স্তর দ্বারা গঠিত। প্রথম স্তরটি ৮০০ ফুট পুরু হালকা রঙিন প্রায় ২৭০০০- ২৮০০০ ফুট পর্যন্ত প্রসারিত। অভিযাত্রীদের কাছে ইয়োলো ব্যান্ড নামে যা পরিচিত। এর উপরের ধূসর পাথুরে স্তরের নাম ব্ল্যাক ব্যান্ড। আরও উচ্চতায় শৃঙ্গ পর্যন্ত স্তরকে বলা হয় ফাইনাল পিরামিড। একটার পর একটা শিলাস্তর দিয়ে গঠিত খাড়াই পাথুরে গাত্রই ইয়োলো ব্যান্ড। ব্ল্যাক ব্যান্ড ইয়োলো ব্যান্ডের তুলনায় অধিকতর খাড়াই এবং উত্তরদিকে অসংখ্য ঝুলে থাকা পাথুরে অংশে বিস্তৃত। কিন্তু ফাইনাল পিরামিড যদিও খাড়াই এবং ভঙ্গুর তবুও শৃঙ্গ আরোহণের অনেকগুলি সহজ রাস্তার সন্ধান মেলে।

পর্বতারোহীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্ল্যাক ব্যান্ড স্তর অতিক্রম করা সর্বাপেক্ষা কঠিন। প্রথম দর্শনে মনে হয় উত্তর- পূর্ব গাত্রের শৈলশিরা অনুসরণ করেই উত্তর- পূর্ব শীর্ষে পৌঁছনো সম্ভব। বেস ক্যাম্প থেকে দেখলেও মনে হয় এই পথ অতক্রম করা সহজ। কিন্তু হিমালয়ের শৈলশিরা প্রতি মূহুর্তে এতই বিভ্রান্তিকর যে সহজ পথের পাশেই অপেক্ষা করছে ছুরির মতো ধারালো কৌণিক কঠিন পথ। এই ছুরির মতো ধারালো পর্বতগাত্রের চূড়া আরোহণ শ্রমসাধ্য এবং সম্মুখে নিত্যনতুন বাধা আরোহীদের গতিকে করে মন্থর। এছাড়াও উত্তর- পূর্ব গাত্র এবং ব্ল্যাক ব্যান্ডের অন্তর্বর্তী দুটি পদক্ষেপের প্রথমটি তেমন ভয়ঙ্কর না হলেও দ্বিতীয় পদক্ষেপে একটি ২০০ ফুটের খাড়াই দেওয়ালের সম্মুখীন হতে হয়। তৃতীয় পদক্ষেপে এমনই ঝোড়ো হাওয়ার সম্মুখীন হতে হয় যে পর্বতগাত্র থেকে পর্বতারোহীরা যেকোন মূহুর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারেন।